

আজব বই



সম্পাদক

শ্রীপুণ্যবিনয় রায় চৌধুরী



দেব সাহিত্য কুটীর

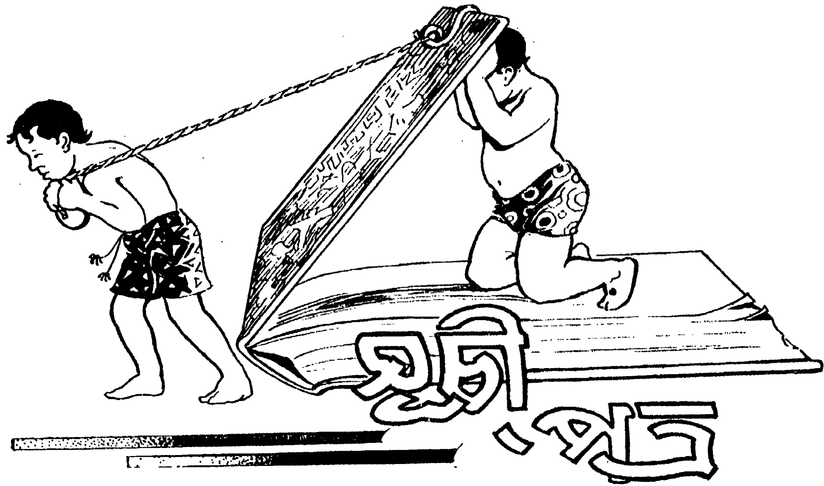
দেব সাহিত্য-কুটীর
৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
[illegible]বোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত



দ্বিতীয় সংস্করণ
১৩৪৬

দাম দেড় টাকা]

মাসপয়লা প্রেস
৯০।৩ কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত


সূচীপত্র



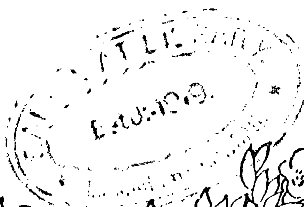
TO

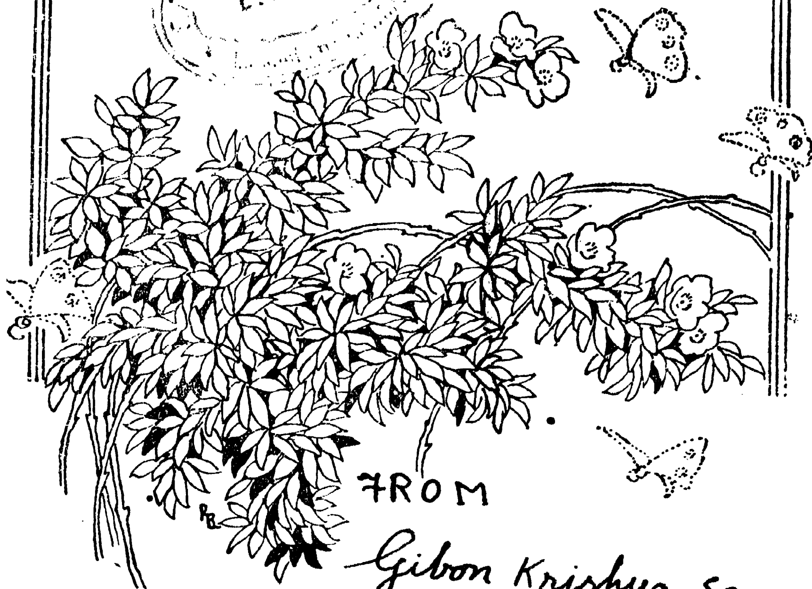
SARASWAT LIBRARY

MAKARDHA

HOWRAH

16. 8. 39





FROM

Gibon Krishna Samanto

32 Sharmahatta St.

ছবি তোলা

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী



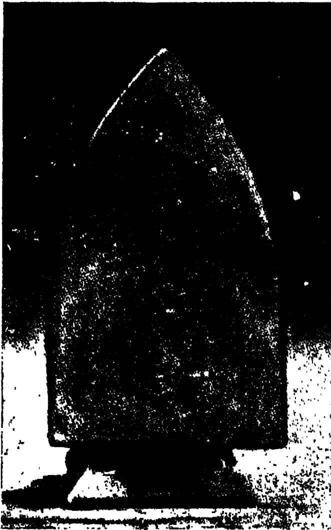
সম্পূর্ণ অন্ধকারে তোলা ছবি

এসে, সেখান থেকে এভারেষ্ট চূড়ার উপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিলেন। সে সময়ে তাঁ'রা এই নূতন প্লেটের সাহায্যে এভারেষ্ট চূড়ার আর তা'র কাছের পর্ব্বতমালার যে সব ছবি তুলেছিলেন সে রকম ছবি এর আগে আর কেউ তুল্‌তে পারে নি। কুয়াসা সে দেশে বারোমাসই লেগে থাকে। হাল্কা কুয়াসা থাক্‌লেও তা'র ভিতর দিয়ে সাধারণ প্লেটে ছবি উঠ্‌বে না। কিন্তু এই আশ্চর্য্য প্লেটে হাল্কা কুয়াসা ভেদ ক'রে ছবি তোলা যায়। এই প্লেটের নাম 'ইন্‌ফ্রা-রেড প্লেট' (Infra-Red Plate)।

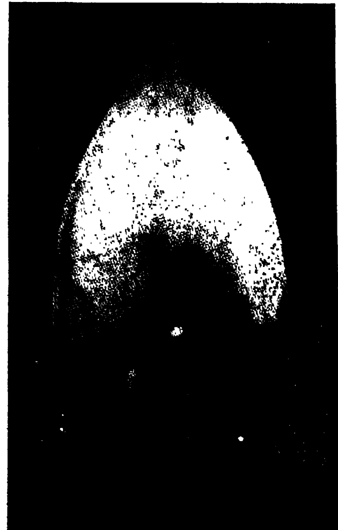
এই প্লেটের আর একটি আশ্চর্য্য গুণ আছে। আমরা সাধারণতঃ যা'কে 'অন্ধকার' বলি, সেই অন্ধকারেও এই প্লেটের সাহায্যে ছবি তোলা যায়। খুব টিম্‌টিমে লাল আলোর সাহায্যে সাধারণ ফটোগ্রাফিক প্লেট তৈরীর ঘরটিকে আলোকিত করা হয়। তা'তে, চোখে দেখা মাত্র চলে। কিন্তু, এই



এভারেষ্ট চূড়ার ছবি—'ইন্‌ফ্রা-রেড' প্লেটের সাহায্যে তোলা



সাধারণ প্লেটে তোলা ইস্তিরির ছবি
(আলোর সাহায্যে তোলা)



অন্ধকারে গরম ইস্তিরির ছবি—'ইন্‌ফ্রা-রেড'
প্লেটে তোলা

অন্ধকার ঘরে ঐ প্লেটের সাহায্যে ছবি তুলে দেখা হয়েছে, স্পষ্ট ছবি ওঠে।

আরেকটি আশ্চর্য্য ব্যাপার এই প্লেটের সাহায্যে দেখা গেছে। পণ্ডিতেরা বলেন; তাপ আর আলো মূলে একই জিনিষ—ইথারের ঢেউ। ইথার কি জিনিষ আর তা'র ঢেউই বা কি রকম সে কথা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার দরকার নেই। শুধু এইটুকুই জেনে রাখ, ইথার দেখা যায় না, ধরা-ছোঁয়া যায় না, সমস্ত জগৎ জুড়ে এই 'ইথার' বর্ত্তমান; আর, তা'র 'ঢেউ'গুলি অতি সূক্ষ্ম—'সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম', শুধু ইথারের কাঁপুনি-বিশেষ। আচ্ছা এবার শোন। পণ্ডিতেরা বলেন, লাল আলোর ঢেউ আমরা চোখে দেখ্‌তে পাই। তা'র পর যে 'অতি-লাল' (Infra-Red) ঢেউ আছে, সেগুলি আমরা চোখে দেখ্‌তে পাই না, কিন্তু, সেগুলি তাপের ঢেউ। আচ্ছা, তা'ই যদি হয়, তবে, এই 'অতি-লাল' বা 'Infra-Red' প্লেটে গরম জিনিষের ছবি তুল্‌লে কি হবে? তুলেই দেখা যাক্‌। একটা ইস্তিরির ছবি আগে সাধারণ প্লেটে তোলা হ'লো। তা'র পর অন্ধকার ঘরে সেই ইস্তিরিটিকে গরম ক'রে 'অতি-লাল' প্লেটের সাহায্যে ছবি তোলা হ'লো। ছবি ডেভেলাপ ক'রে দেখা গেল ইস্তিরির ছবি উঠেছে! ইস্তিরির গায়ে তিনটি ফুট্‌কি ছিল; গরম করার সময় সে জায়গাগুলি বেশী গরম হয়। সাধারণ প্লেটে ফুট্‌কি দেখা গেল কালো; 'অতি-লাল' ছবিতে ফুট্‌কি সাদা উঠ্‌ল।

এখন আর ভাবনা কি? অন্ধকারেও ছবি তোলা চল্‌বে।

এই প্লেটে ছবি তোলার একটা মজার কথা বলি। একটা ছবিতে দেখলাম, একটি মিশ্‌-কালো আফ্রিকার ভদ্রলোকের 'অতি-লাল' প্লেটে তোলা ছবি দিব্য ফর্সা উঠেছে! কেন জান? কালো চেহারা নাকি তাপ বেশী টানে; কাজেই সেই 'তাপ' ঐ 'অতি-লাল' প্লেটে ধরা প'ড়ে মুখের মিশ্‌কালো ফর্সায় দাঁড়িয়েছে।

ছবি তোলা
শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

পুরানো পুঁথি-পত্রের ছবি তুল্‌বার সময় এই প্লেটে খুব সাহায্য হয়। অনেক লেখা হয়তো চোখে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু এই প্লেটে ছবি তুল্‌লে স্পষ্ট উঠ্‌ছে। লাল রং হয়তো বহুকালের পরে দেখ্‌তে কালো হয়ে গেছে এবং পাশের কালোর সঙ্গে মিশে আর দেখাই যাচ্ছে না। 'অতি-লাল' প্লেটে ছবি তুল্‌লে লাল আর কালোর প্রভেদ বেশ বোঝা যাবে।

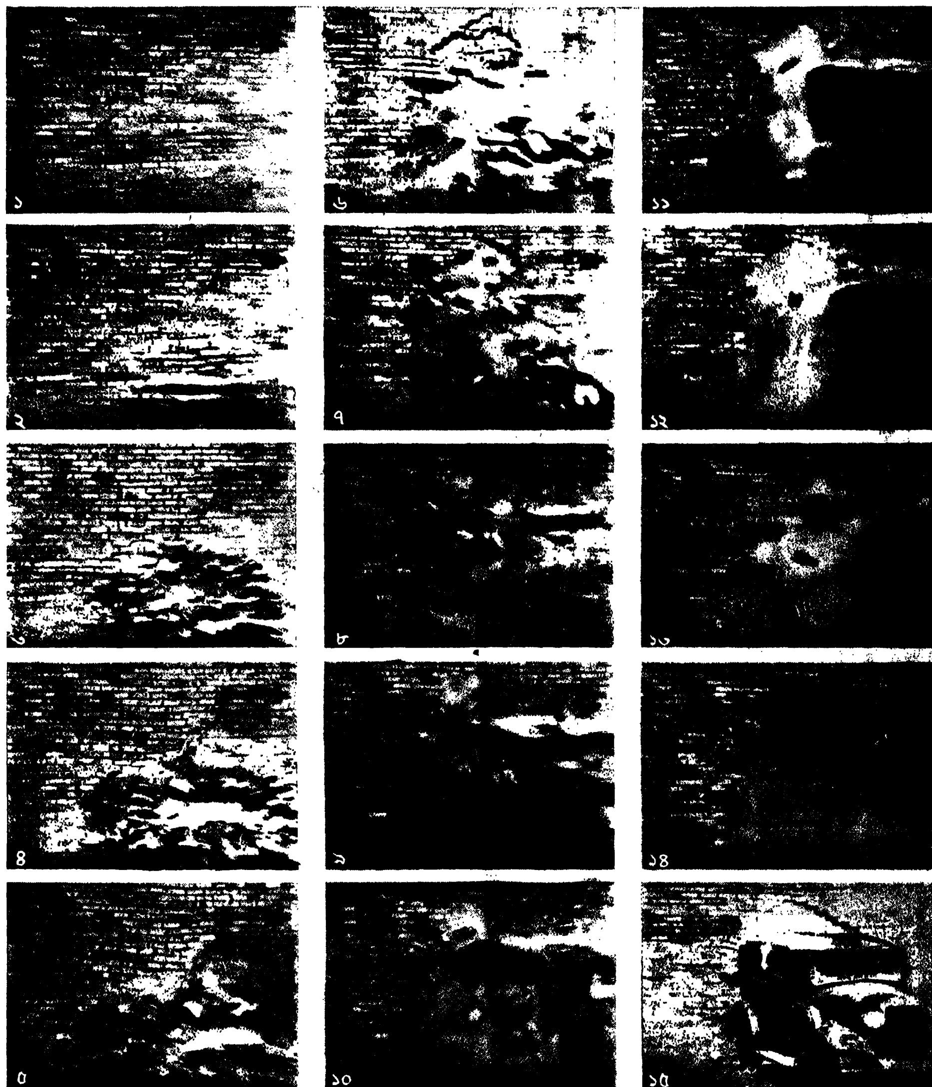


সাধারণ প্লেটে তোলা ছবি



ইন্‌ফ্রা রেড প্লেটে তোলা ছবি

তাড়াতাড়ি ছবি তুল্‌বার জন্য ক্যামেরার 'শাটার' (Shutter) যন্ত্র তো অনেককাল আগেই বেরিয়েছে। চলন্ত ট্রেন, ঘোড়-দৌড়, ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার ছবি আমরা অনেককাল দেখে আস্‌ছি। কিন্তু, আজকালের মানুষ এতে সন্তুষ্ট নয়। আগেকার দিনের চেয়ে যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম প্রভৃতির যখন অনেক উন্নতি হয়েছে, তখন আরো অল্পক্ষণের মধ্যে (অর্থাৎ, আরো অনেক কম 'এক্স্‌পোজার' দিয়ে) ছবি তোলারই বা চেষ্টা হবে না কেন? তা'র যন্ত্রও



তাড়াতাড়ি তোলা ছবি

মোটর ধাক্কা মেরে দেয়াল ভেঙ্গে বেরিয়ে আস্‌ছে। তা'রই ছবি পর পর তোলা হয়েছে।

ছবি তোলা

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

চাই সে রকম, ব্যবস্থাও চাই তা'র অনুরূপ। চট্ ক'রে একটা ছবি তোলা সহজ; কিন্তু এক সেকেণ্ডে যে ঘটনা ঘটে, তার ৪০।৫০টা ছবি তুলে ফেলা বড় সহজ নয়। আধুনিক ক্যামেরা আর যন্ত্রপাতি তা'ও করেছে। হাত থেকে একটা পেয়ালা প'ড়ে গেল। ঠিক যে মুহূর্ত্তে পেয়ালা মাটিতে ঠেকে চূরমার হ'লো, সেই 'মুহূর্ত্তে' একটা ছবি তোলা হয়েছে। এই ছবির এক্স্‌পোজার নাকি এক সেকেণ্ডের ৭০,০০০ ভাগের এক ভাগ! ভীষণ উজ্জ্বল আলো, প্রকাণ্ড লেন্স্ আর খুব তাড়াতাড়ি ছবি ওঠে এমন ফিল্ম্—এই তিনটি মিলে এই ছবি তোলা সম্ভব করেছে। চোখের পলকের ছবি পর-পর ২০।২৫টা তুলে দেখা হয়েছে পলক কি ভাবে পড়ে। একটা মোটর পাতলা দেয়ালে ধাক্কা মেরে দেয়ালটি ভেদ ক'রে বেরিয়ে আস্‌ছে; পর-পর ১৫টি ছবি তোলে সেই ঘটনাটি দেখান হয়েছে। একবার ভেবে দেখ—২।১ সেকেণ্ডের মধ্যে যে ঘটনা ঘটে গেল, তা'র ১৫টি ছবি তুলে নেওয়া কি ব্যাপার!

খেলাধূলার ছবি সিনেমা-ক্যামেরায় তাড়াতাড়ি তুলে, আস্তে দেখিয়ে, খেলা সম্বন্ধে অনেক নূতন জ্ঞানলাভ করা হচ্ছে। বক্সিং খেলায় ওমুক ওমুককে 'ফাউল' করে বা 'বে-আইনী' ঘুঁসি' লাগিয়ে হারিয়েছে শোনা গেল। এর দল বলে 'আলবাৎ ফাউল' ওর দল বলে 'কখনই না'। সেই ঘটনার সিনেমা ছবি হয়তো তোলা হয়েছিল; সেই ছবি আস্তে আস্তে চালিয়ে প্রমাণ হয়ে গেল—'ফাউল'! ইংলণ্ডের বোলার লার্‌উড্ ক্রিকেট ম্যাচে 'বডি-লাইন' অর্থাৎ 'গা-বরাবর' বল্ দিচ্ছেন শোনা গেল। অষ্ট্রেলিয়ানরা গেল ভীষণ ক্ষেপে। ইংরেজরা সিনেমা-ফটো তুলে দেখাল, 'বডি-লাইন' ঠিক নয়—সব বল গা-বরাবর আসে না; অষ্ট্রেলিয়ানরা আরেকটা সিনেমা-ফটো থেকে দেখাল, 'হাঁ, গা-বরাবরই আসে' এতো গেল তর্কাতর্কির ব্যাপার। শিক্ষার্থীরা বড় বড় খেলোয়াড়দের সিনেমা-ছবির ধীরে-চালান ছবি দেখে খেলার কায়দার অনেক নতুন জিনিষ শেখেন।



হাত থেকে প'ড়ে পেয়ালা ভাঙ্গছে



মাছের এক্স্‌-রে ছবি

ছবি তোলা

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

এই সম্পর্কে একটি কথা ব'লে নিই। তোমরা হয়তো জান, সিনেমার ছবি ফটোগ্রাফ ভিন্ন আর কিছুই নয়। চলন্ত ব্যাপারের পর পর এবং খুব তাড়াতাড়ি অনেকগুলি ছবি তুলে, সেগুলিকে ঐ ভাবে পর পর দেখা'লেই চলন্ত ছবি হয়। অবিশ্যি, দেখাবার এবং তুলবার বিশেষ কায়দা আছে। কাজেই, সিনেমা আর ফটোগ্রাফি একই ব্যাপার—অথবা বলা যেতে পারে, সিনেমা ফটোগ্রাফ ছাড়া আর কিছুই নয়; দেখাবার কায়দার ফলে, অনেকগুলি ফটো পর পর এসে আমাদের চোখে চলন্ত জিনিষের ধারণা জন্মায়।

'এক্স্-রে'র (X-Ray) নাম তোমরা শুনে থাক্বে। এই এক্স্-রে আলো এক অদ্ভুত জিনিষ। শরীরের মাংস ভেদ ক'রে এই আলো চ'লে যেতে পারে। যদি 'এক্স্-রে' আলোর সাহায্যে হাতের একটি ছবি তোল, শুধু হাড় ক'খানা কালো উঠ্বে, আর বাকি সব কাঁচের মত স্বচ্ছ উঠ্বে। এই ছবি তোলার জন্য আলাদা প্লেট আছে। সাধারণ ক্যামেরার সাহায্যে এ ছবি তোলা হয় না। জিনিষের পিছনে প্লেটটি রেখে এক্স্-রে আলো অন্য দিক থেকে হাতের উপর ফেল্‌লে কিছুক্ষণ বাদে জিনিষের স্বাভাবিক আকারের ছবি উঠ্বে। এক্স্-রে ফটোগ্রাফ আজকাল অনেক কাজে ব্যবহার করা হয়। ডাক্তারদের তো রাতদিন এক্স্-রে ফটোর দরকার লাগেই; তা' ছাড়া বৈজ্ঞানিক অনেক কাজে এক্স্-রে ফটো লাগে। এমন কি কলের অংশের এক্স্-রে ছবি তুলে কলের নানারকম গলদ আবিষ্কার করা হয় আজকাল।

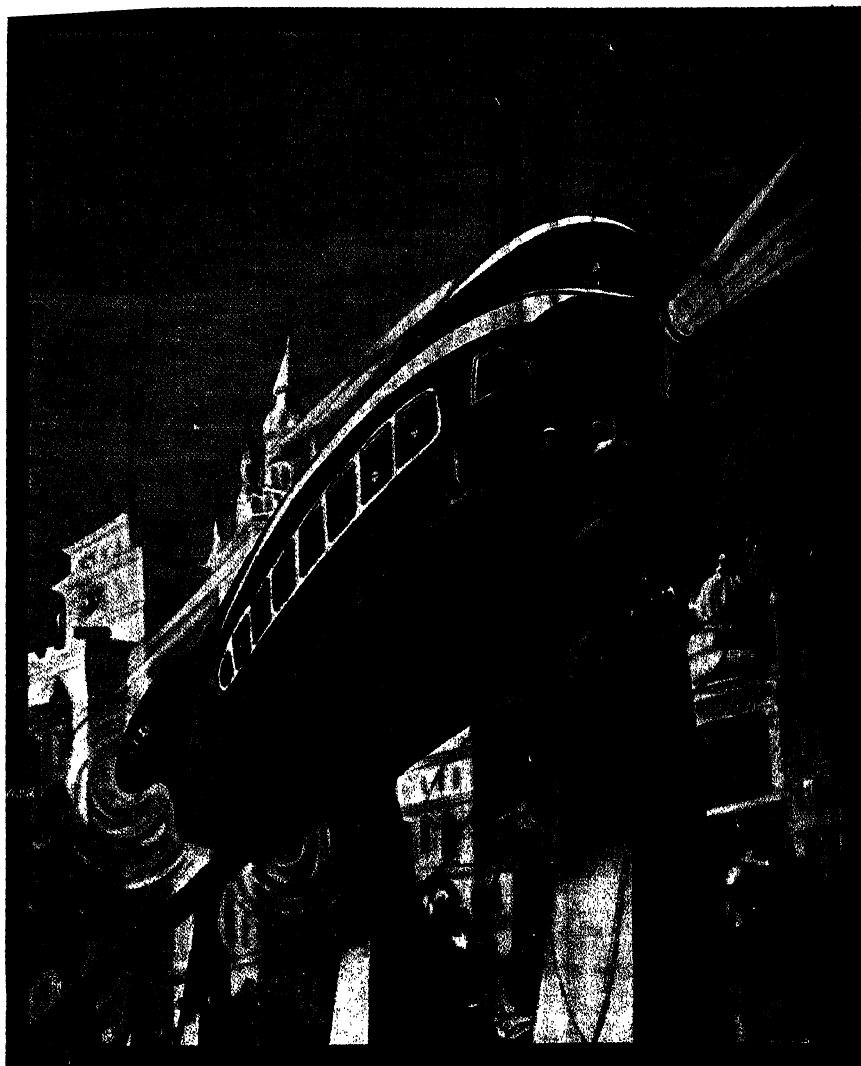
তাড়াতাড়ি কাজ করার যুগে ছবি তো খুবই তাড়াতাড়ি উঠ্ছে! এখন, তাড়াতাড়ি সে ছবি দেশ-বিদেশে পাঠা'তে পারলে তো হয়! তা'রও ব্যবস্থা হয়ে গেছে। টেলিগ্রাফে ছবি পাঠান কিছু নূতন ব্যাপার নয়; কয়েক বৎসর আগেই ফটো-টেলিগ্রাফের যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই যন্ত্রের আধুনিক সংস্করণের সাহায্যে খুব স্পষ্ট ছবি পাঠান যায়। একটি ছবি পাঠাতে দু'তিন মিনিট সময়

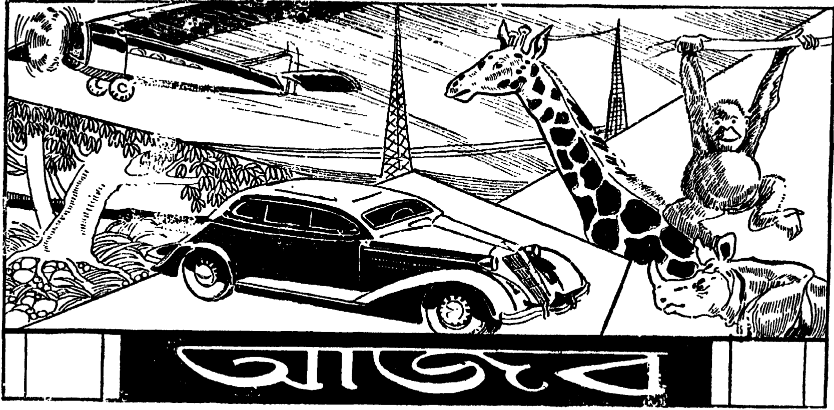
লাগে। রেডিওর সাহায্যেও ছবি পাঠান যায়;—ব্যবস্থা দু'য়েরই প্রায় এক রকম।

তোমরা হয়তো ভাববে, "টেলিগ্রাফে ছবি পাঠান কি ক'রে সম্ভব? লেখার ব্যাপারে না হয় টরে-টক্কা দিয়ে অক্ষর বুঝিয়ে দেওয়া যায়; ছবির বেলা তো আর তা' করা চলে না!" বাস্তবিকই, এর ব্যবস্থা একেবারে অন্য রকম। পাঠাবার যন্ত্রে একটা ছোট রোলারের মত গোল জিনিষ থাকে, তা'র উপর একটা ছবি লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই ছবির উপর আলো ফেল্‌লে, যখন ছবির কালো জায়গায় আলো পড়্‌বে তখন একটি বৈদ্যুতিক প্রবাহের জোর একেবারে ক'মে যাবে। ছবির যে জায়গায় সাদা, সেখানে আলো পড়্‌লে বৈদ্যুতিক প্রবাহের জোর খুব বেশী হবে। দূরে, যে যন্ত্রে ফটো উঠ্‌বে সেখানে এমন ব্যবস্থা আছে যে, পাঠাবার যন্ত্রের বৈদ্যুতিক প্রবাহের জোর হ'লে সেই যন্ত্রের একটি ছোট্ট আলোরও জোর হবে। এই আলো আবার একটা ফটো তোলার কাগজের বা ফিল্মের উপর গিয়ে পড়ছে। আস্তে আস্তে পাঠাবার যন্ত্রের



মূর্ত্তি-ফটোর যন্ত্র ও তা'র আবিষ্কারক





শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

আজবের সুরু নাই, নাই তা'র শেষ,
মানে নি আজব কভু পাত্র, কাল, দেশ।
আদিকাল হ'তে এই জগতের মাঝে,
প্রকৃতি আজব খেলা খেলে নানা সাজে।
আদিতে ধরায় ছিল অজ্ঞান আঁধার,
ছিল না মানব জাতি, জ্ঞানের আধার।
বহু যুগ পরে দেখ কালের লীলায়,
মানব জনম লাভ করিল ধরায়।
সুদিন আসিল তবে এই পৃথিবীর,
আসিল জ্ঞানের আলো নাশিয়া তিমির।
বিস্ময়ে অবাক মানি' দেখিল মানব,
জ্ঞানের অঞ্জনে চোখে সকলি আজব।

আজব

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

অচল, অতল, ঘন, অনল, অনিল,
রবি, শশী, গ্রহ, তারা, উল্কা গতিশীল ;
ধূমকেতু, নীহারিকা, চঞ্চলা চপলা,
মেঘ পরে ইন্দ্রধনু, উচ্চ গিরিমালা ;
প্রস্রবণ, নদীনদ, জলের প্রপাত,
বরষার মেঘমালা ঘোর বজ্রপাত :
বিরাট অরণ্যরাজি, বিস্তীর্ণ প্রান্তর,
ফল, ফুল, পাতা, মূল, লতা, তরুবর ;
বিচিত্র রঙের খেলা বিহগের গায়,
প্রজাপতি, ফুলে, ফলে, লতায় পাতায় ;
জ্ঞান-আঁখি উন্মেষের সাথে সাথে সব,
জগতের লীলাখেলা হয়েছে আজব।
কত শত শতাব্দীর পরে আজ দেখি,
মানবের মায়া বলে হইয়াছে একি !
বিজলী, অনল আজ মানবের দাস,
দুর্দ্দান্ত পশুর পায়ে দাসত্বের পাশ।
জলে, স্থলে, শূন্যে নর অবহেলে চলে,
বিমান মুখর আজ বেতারের কলে।
বায়ু, জল, ধাতুকুল মানবেরে সেবে,
আজবের বাকি আর আছে কিবা এবে ?
তবু নব ইন্দ্রজাল প্রতিদিন ভাই,
প্রমাণিছে, আজবের কভু শেষ নাই।



লক্ষ্মণ-ঝোরা



শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু

মধ্য-ভারতের গভীর জঙ্গলের সে ভয়ঙ্কর রাত জীবনে কখনও ভুলব না ; এখনও সে রাতের কথা ভাবলে গা শিউরে উঠে।

তখন আমার বয়স চোদ্দ হবে, স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছি, নিজেকে ভাবি, খুব লায়েক হয়ে উঠেছি। পূজার ছুটিতে আবদার করলুম, মেজমামার কাছে জঙ্গলে গিয়ে থাকব। আমার মেজমামা তখন গভর্ণমেণ্টের কি কাজে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন, জঙ্গলের ভেতরই কোন গ্রামের কাছে তাঁবু খাটিয়ে তাঁকে থাকতে হত। তাঁর মুখে ভারতের নানা জঙ্গলের গল্প শুনে গভীর বন দেখবার বাসনা আমার বহুদিন ধরে। মেজমামার কাছে যাবার কথা শুনে মা আপত্তি করলেন, কিন্তু বাবা রাজী হলেন, তারপর মেজমামার কাছ থেকে লম্বা নিমন্ত্রণের চিঠি আসাতে মা'র আপত্তি টিকল না। ঠিক হল, আমি একাই যাব, বাবা হাওড়া ষ্টেশনে আমায় ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবেন আর মেজমামা আমাকে রায়গড় ষ্টেশন থেকে নামিয়ে নিয়ে যাবেন। রায়গড় ষ্টেশন হতে একদিন মোটরগাড়ীতে যেতে হবে তারপর ঘোড়ায়, তবে তিনি

যে জঙ্গলে কাজ করছেন সেখানে পৌঁছান যাবে। একা অতদূর যাব, তারপর জঙ্গলে তাঁবুতে গিয়ে থাকব, ভাবতে মন আনন্দে ফুলে উঠল।

মধ্যভারতের সে জঙ্গলে গিয়ে অবাক হয়ে গেলুম। কলিকাতা হতে গিয়ে মনে হল এ কোন রহস্যময় অপূর্ব্ব দেশে এসে পড়লুম। গভীর বনের শেষে এক ছোট গ্রামের ধারে উচ্চ সমতল তৃণভূমিতে আমাদের কয়েকটি তাঁবু, তার চারদিকে শালবন, শিরীষ, অর্জ্জুন কতরকম গাছ। কত সহস্র বৎসর আগে রামায়ণের যুগে শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে যাবার পথে সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে এই বনে নাকি বহুদিন ছিলেন। তখন এ অরণ্যে কত মুনিঋষির তপোবন ছিল, কত যাগ যজ্ঞ হত; হয়ত কত রাক্ষসও নিকটে বাস করত। এখন সে বনভূমি হিংস্রজন্তুদের আবাস স্থান।

একদিন মেজমামা বল্লেন, "মনু লক্ষ্মণ-ঝোরা দেখতে যাবি? কিন্তু সে অনেকদূর, পারবি কি অতদূর হাঁটতে?"

"নিশ্চয় পারব মামা, কতদূর হবে এখান থেকে?"

"তা প্রায় ছ'সাত মাইল হবে, আর পাহাড়ে পথ, ঘোড়া নিয়ে যাবারও উপায় নেই।"

"খুব পারব; আমি ত' রোজ বাহাদুরের সঙ্গে চার পাঁচ মাইল বেড়িয়ে আসি, সেদিন যে রামগিরি গেলুম তা এখান থেকে ত চার মাইল।"

লক্ষ্মণ-ঝোরা খুব বিখ্যাত ঝর্ণা, তবে বড় দুর্গম স্থান। ঠিক হল আগামী রবিবার লক্ষ্মণ-ঝোরাতে গিয়ে পিক্‌নিক হবে; সঙ্গে নেপালী চাকর বাহাদুর যাবে, সে সব খাবার জিনিষ নিয়ে যাবে।

কিন্তু যাবার দিন সকালে বাহাদুরের জ্বর হল। আমরা তাকে কিন্তু দমলুম না। আমরা সকাল সকাল খেয়ে সঙ্গে রুটি মাখন বিস্কুট কলা ইত্যাদি নানা শুকনো খাবার নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম লক্ষ্মণ-ঝোরার পথে। মেজমামা

লক্ষ্মণ-ঝোরা

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু

ও আমি, পরণে খাকী হাপ্-প্যান্ট, গলাখোলা খাকী সার্ট, পিঠে চামড়ার ব্যাগে খাবার, জলের বোতল; পায়ে মোটা বুটজুতো, হাতে শক্ত লাঠি; মামার পিঠে আবার বন্দুক। কলিকাতা হতে বুট-জুতো এনেছিলুম পাহাড়-পথে পরবার জন্য, এতদিন সেটা পরিনি; সেদিন লক্ষ্মণ-ঝোরার সম্মানে নতুন বুট-জুতো পরে চল্লুম।

চমৎকার বন-পথ; পথ কোথাও শালবনের ভেতর দিয়ে কোথাও পাহাড়ের গা দিয়ে কোথাও গিরিনদীর ধার দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে, পায়ে-চলা রাস্তা। কখনও শাল-কুসুমের সুবাস, কখনও শেফালি পলাশ গাছে অজস্র ফুলের রংএর হোলিখেলা, কখনও গিরি-ঝর্ণার কলক ধ্বনি, কখনও গভীর অরণ্যের নিস্তব্ধতা—বিমুগ্ধ হয়ে পথের শোভা দেখতে দেখতে চল্লুম। লক্ষ্মণ-ঝোরার সৌন্দর্য্য আরও চমৎকার। প্রায় দেড়শ ফিট উঁচু হতে কালো পাথরের ওপর নাচতে নাচতে ঝর্ণাটি কলহাস্যে নেমে এসেছে, দু'ধারে ফার্ণের ঝোপ, বন্য করবীর গাছ; ঝর্ণাটি দেখে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "ঝর্ণা" কবিতাটি মনে পড়ল—

"ঝর্ণা! ঝর্ণা! সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা! চন্দন-বর্ণা!

ঝরণার পাশে এক শ্যাওলা-ঢাকা পাথরে আমাকে বসিয়ে মেজমামা ঝর্ণার এক ফটো তুল্লেন; আমিও মেজমামার ক্যামেরা নিয়ে মেজমামা ও ঝর্ণার ফটো তুললাম। তারপর খাওয়া হল। লক্ষ্মণ-ঝোরা দেখতে আমরা এত বিমুগ্ধ হয়ে গেছলুম যে সময়ের হিসাব ছিল না। সহসা মেজমামা চমকে বলে উঠলেন, "মনু চারটে বেজে গেছে যে, উঠ, শীগগীর যেতে হবে, বনের মধ্যে ছ'টার মধ্যেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে।"

বুটটা ভাল করে পরে পিঠে ব্যাগ বেঁধে যাত্রার জন্য তৈরী হলুম।

লক্ষ্মণ-ঝোরা

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু

কিছুদূর গিয়ে মেজমামা বল্লেন, "পিছিয়ে পড়ছিস্ কেন? আসবার সময়ত খুব এগিয়ে এগিয়ে আসছিলি ; চল্ শীগগীর যেতে হবে, ওকি খোঁড়াচ্ছিস কেন?"

"মেজমামা, ডান পায় বড় ফোস্কা হয়েছে, মস্তবড় ফোস্কা, জুতোটা খুলে চলব?"



"ফোস্কা? নতুন বুট দেখছি যে, নতুন জুতো পরে আজ আসে! না, না, জুতো খোলা চলবে না, চল আস্তে আস্তে ; পথে কাঁকর, কাঁটা কত কি রয়েছে, জুতো খোলা চলবে না।"

চল্লুম খোঁড়াতে খোঁড়াতে। মেজমামা নানা গল্প করতে করতে চল্লেন, আমি পায়ের ব্যথা ভুলে যা'তে জোরে জোরে যেতে পারি।

খরস্রোতা এক পার্ব্বত্য-নদী পেরিয়ে আমরা এক ছোট পাহাড়ের সামনে এসে পৌঁছালুম। চারদিকে আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে, সিঁদুরে মেঘে পূব-পশ্চিম ছেয়ে গেছে। বল্লুম "মামা, পাহাড়টায় ওঠা যাক চল, সুন্দর সূর্য্যাস্ত দেখতে পাব।"

লক্ষ্মণ-ঝোরা

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু

মেজমামা কি যেন ভাবছিলেন, চমকে উঠলেন তারপর চারিদিক অতি ভীত ভাবে চাইলেন. কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য, তারপর হাসিমুখে বলে উঠলেন. "অচ্ছা চল, পাহাড়ের মাথা থেকে সূর্য্যাস্ত দেখা যাক।"

সোনার বড় থালার মত সূর্য্য শালবনের পেছনে অস্ত গেল, চারিদিক রঙীন, সুন্দর। মেজমামা গম্ভীরস্বরে বল্লেন, "মনু স্থির হয়ে দাঁড়া, আজ আমাদের এই পাহাড়ের মাথায় রাত কাটাতে হবে।"

"এই পাহাড়ের মাথায়? কি বলছো তুমি!"

"হ্যাঁ, আজ আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য দেখছি। সকালে বাহাদুরের জ্বর হল; তারপর আসবার সময় তোর পায়ে ফোস্কা হল; আর এখন লক্ষ্মণ-ঝোরা হতে ফিরতে তোর সঙ্গে গল্প করতে করতে আমি পথ ভুল করেছি! আমরা আমাদের তাঁবুর দিকে না গিয়ে ঠিক তার উল্টো দিকে এসেছি, এখান থেকে আমাদের গ্রাম দশ মাইল হবে, এখন সেখানে যাওয়া অসম্ভব। পাহাড়ের মাথায় কিছুক্ষণ আলো থাকবে বটে কিন্তু বনের পথ আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভয়ানক অন্ধকার হয়ে যাবে। এ জায়গাটার কাছে একটা গ্রাম আছে মনে পড়ছে. কিন্তু সে-ও চার মাইল দূরে, পথ অতি দুর্গম।"

আমি ভীত ভাবে মামার মুখের দিকে চাইলুম।

মামা হেসে বলে উঠলেন, "ভয় কি? সঙ্গে বন্দুক রয়েছে। তবে রাতে ঘুমানো চলবে না। আর খাবার ত কিছু আমার ব্যাগে আছে, তাই দিয়ে আজ রাতটা চালিয়ে দিতে হবে। পা জ্বালা করছে বুঝি? আচ্ছা এবার জুতোটা খোল।"

জুতো খুলে চামড়ার ব্যাগ পেতে বসলুম। মামা কিন্তু বসলেন না, বন্দুকটা হাতে করে চারিদিকে ভাল করে দেখতে লাগলেন। বল্লেন, "এ জায়গায় নিরাপদে রাত কাটান যাবে, এ গ্রাণাইটের পাহাড় চাবিদিকে গাছপালা

কিছু নেই; আমরা যে দিক দিয়ে উঠে এলুম, এই উত্তর দিকটা কিছু ঢালু, অন্য দু'দিকে নদী, নদী থেকে পাহাড় একেবারে খাড়া উঠেছে, সুতরাং ওদিক দিয়ে কোন জন্তু উঠে আসতে পারবে না, আমাদের শুধু উত্তরে বনের দিকে চোখ রাখতে হবে। আমরা যেন বনের মধ্যে একটি ছোট দুর্গের মাথায় আছি। মনু, ভয় করছে নাত ?"

"না, মামা, বেশ ভাল লাগছে, সত্যিকার এ্যাড্ভেঞ্চার !"

আমাদের পাহাড়ের মাথায় ধূসর আলো, কিন্তু নীচে বনভূমি অন্ধকার। মামাকে কি বলতে যাচ্ছিলুম, সহসা লাফিয়ে উঠে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে অন্ধকার বিশাল অরণ্যে কা'রা গর্জ্জন করে উঠল !

"আরে মনু, ও ত' শেয়ালগুলো ডাকছে। ভয় কি ?"

"না, মামা, ভয় নয়, দেখতে এলুম, নদীটা কেমন দেখাচ্ছে। আচ্ছা কত শেয়াল ওই বনে, মনে হচ্ছে যেন হাজার হাজার শেয়াল আছে।"

"চুপ করে বোস, এখুনি চাঁদ উঠবে, তখন নদীটা ভাল করে দেখতে পাবি, হরিণেরা জল খেতে আসবে দেখবি।"

পশ্চিমাকাশের সোনার আভা মিলিয়ে গেল, হীরার টিপের মত এক একটি তারা নীলাকাশে ফুটে উঠতে লাগল; নীচে জনমানবহীন গভীর বন, সীমাহীন, ভয়ঙ্কর অন্ধকার! মেজমামা আমার পাশে এসে বসলেন উত্তরে বনের দিকে চেয়ে।

শেয়ালদের ডাক থাম্‌ল, চারিদিক গভীর নীরব। এক ঝাঁক পাখী আলোছায়ার মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে উড়ে চলে গেল। যেন এক গাছি সাদা মালা।

পাখীগুলির দিকে চেয়ে মেজমামা বল্লেন, "ওরা উড়ে কোথায় চলেছে, কতদূর যাবে কে জানে? ওদের মধ্যে এমন পাখী থাকতে পারে যারা সাইবেরিয়া থেকে আসছে।"



• তাড়াতাড়ি চলাফিরার যুগে—আজকাল
এরোপ্লেন — ট্রেন — ট্রাম — মোটর ও মোটর-বাস্
(উপর থেকে নীচে)

লক্ষ্মণ ঝোরা
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু

"সাইবেরিয়া থেকে ? গোবি মরুভূমি, হিমালয় পর্ব্বত এ সব পার হয়ে আসে ?"

"হাঁ, উইলো ওয়ার্ব্লার বলে এক পাখী এখানে ডিসেম্বর মাসে দেখতে পাওয়া যায়, তারা গ্রীষ্মকালে থাকে সাইবিরিয়ার কোন হ্রদের ধারে আর শীতকাল কাটাতে আসে এই মধ্য ভারতে বিন্ধ্যপর্ব্বতের কোন বনে, নদীর তীরে। সীমাহীন অনন্ত আকাশ দিয়ে কি করে যে তারা প্রতিবছর হাজার হাজার মাইল উড়ে আসে, আবার ফিরে যায়, এ প্রকৃতির মহারহস্য।"

"আমার মন ভুলিয়ে রাখতে মেজমামা পাখীদের নানা গল্প বলতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু সে সব অদ্ভুত কথা বেশীক্ষণ শুনতে হল না। কি একটা উদ্ভট ছোট জন্তু আমার ব্যাগ ফুঁড়ে আমার পাশে লাফিয়ে উঠল। আমিও লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালুম।"

"এই দেখ মামা, এটা কি ?"

"সরে দাঁড়া, কৈ ?. ও, সরে আয়, ও ভয় পাবার কিছু নেই, ভাল করে দেখ জন্তুটাকে, ওর নাম হচ্ছে প্যাঙ্গোলিন, বজ্রকীট বলে, অনেকটা বড় ইঁদুরের মত কিন্তু গায়ে কিরকম মাছের আঁশের মত বড় বড় আঁশ দেখেছিস, যেন লোহার বর্ম্ম পরে কোন সৈনিক যুদ্ধে চলেছে। ওই চলে গেল। ওরা থাকে মাটির ভেতর গর্ত্ত করে, রাতের বেলা খাবারের সন্ধানে বাহির হয়, পোকামাকড়, ফলমূল, আর পিঁপড়ে হচ্ছে ওদের আহার। বিশেষতঃ পিঁপড়ে খুব খায়। ওরা এই পাহাড়ে আছে বলে এখানে কোন পিঁপড়ে নেই। কিন্তু ওখানে বসা চলবে না, আরও বোধ হয় দু' চারটে প্যাঙ্গোলিন বাহির হবে, মাটিতে বসা যাবে না এই বড় পাথরটার ওপর বসা যাক্।"

আমরা দুটো বড় বড় কালো পাথরের ওপর বসলুম। সেখান থেকে

তলায় নদীটি সুন্দর দেখা যায়। সে পাথরগুলি কতকালের কে জানে! বোধ হয় পৃথিবীর প্রথম তুষার-যুগের।

ধীরে শালবন মহুয়াবনের পাশ দিয়ে চাঁদ উঠল। চারিদিক থমথম করতে লাগল। কি অপূর্ব্ব নিস্তব্ধতা!

বনে কিন্তু একটু চুপচাপ থাকবার জো নেই। সহসা আমাদের দক্ষিণ দিকে নীচের বনে 'কিচির মিচির, কিচির মিচির' ভয়ানক শব্দ হতে লাগল, গাছের ডালপালা দুলতে লাগল, যেন সেখানে ডাকাত পড়েছে। মামা লাফিয়ে উঠলেন, বন্দুকের নলটা বনের দিকে ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, মুখে কোন কথা নেই। আমিও তার পাশে লাঠি তুলে দাঁড়ালুম।

কিচির মিচির শব্দটা দূরে, আরও দূরে চলে গেল, ধীরে মিলিয়ে গেল, আবার চারিদিক চুপ্‌চাপ।

"কি মামা? কি শব্দ?"

"ও বাঁদরগুলো হঠাৎ জেগে শব্দ করছে, আবার সব ঘুমিয়ে পড়ল। ও কিছু নয়।"

তখন মামা বলেছিলেন বটে, ও কিছু নয়, পরে বাড়ীতে এসে সত্যি ব্যাপারটা বলেছিলেন। ব্যাপারটা হচ্ছে, ওইখান দিয়ে তখন কোন চিতাবাঘ যাচ্ছিল, গাছের বাঁদররা পরস্পরকে সতর্ক করে দেবার জন্য ওই রকম চেঁচামেচি আরম্ভ করেছিল।

বনভূমিতে আবার গভীর নিস্তব্ধতা।

মামা বল্লেন "মনু ক্ষিদে পেয়েছে?"

"না, মামা, বেশ লাগছে নদীটি দেখতে, জ্যোৎস্না কেমন ঝিকমিক করছে। হরিণেরা কখন জল খেতে আসবে?"

"আর একটু রাত হলে আসবে। কিন্তু তখন হয়ত দেখবি একটা হরিণকে বাঘে মেরে নিয়ে চলে গেল।"

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু

"সে ভাল লাগবে না।"

"তাতে দুঃখ পাবার কিছু নেই। প্রকৃতির নিয়ম আশ্চর্য্যকর, ভেবে দেখলে বোঝা যায়, প্রকৃতির প্রতি নিয়ম মঙ্গলের জন্য। কিছু অর্থহীন নয়। ধরো এই জঙ্গলটা তিনশ বর্গ মাইল; এতে বোধ হয় পঞ্চাশটা বড় বাঘ ও পঞ্চাশটা চিতেবাঘ আছে, আচ্ছা প্রতি বাঘ যদি সপ্তাহে একটা করে হরিণ মেরে খায়, তাহলে একশ' বাঘ প্রতি সপ্তাহে একশ হরিণ মারবে, প্রতিবছরে তাহলে এ বনের বাঘেরা কত হরিণ মারবে?"

"পাঁচহাজার দু'শো।"

"এ বনে যদি কোন বাঘ না থাকত তাহলে পাঁচবছরে ছাব্বিশ হাজার হরিণ বেশী হত, সেই সব বুনো হরিণ পাশের গ্রামে আহারের সন্ধানে প্রবেশ করত; তারপর বুনো শুয়োর আছে; শুয়োরের দল, হরিণের দল সব গ্রামের ক্ষেতে গিয়ে শস্য নষ্ট করে দিত। বাঘেরা আছে বলে শুয়োর হরিণ এসব জন্তুদের সংখ্যা খুব বাড়তে পারে না।"

মেজমামা তাঁর ব্যাগ খুলে রুটি মাখন ইত্যাদি যা খাবার ছিল বার করলেন, আহারের সঙ্গে নানা গল্প চলতে লাগল।

রাত গভীর হয়ে এল। চাঁদ মধ্যগগনে উঠেছে, সাদা সাদা মেঘের ভেতর দিয়ে যেন লুকোচুরি খেলে চলেছে। সমস্ত আকাশ ব্যাপী মহা নীরবতা। নীচে বনভূমির মাথায় চাঁদের আলো ঝকমক করছে; কিন্তু সে আলো বনের মধ্যে একটু প্রবেশ করতে পারছে না, সেখানে অন্ধকার আরও ভয়ঙ্কর রহস্যময়। বনের মধ্যে নিস্তব্ধতা নেই; কোন না কোন শব্দ কানে আসছে,—নানা বন্য-জন্তুদের ডাক, কখনও মনে হয় যেন গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ল; কোথায় কোন শিশু-হরিণ দল হতে দূরে পড়ে পথ হারিয়ে ডাকছে, কোথায় বাঘ একবার

গর্জ্জন করে উঠল, কোথায় হায়না পাগলের মত ডেকে উঠল বুঝি, কোথায় বুনো শুয়োরগুলি বাঁশবন ভেঙে ছুটেছে, কতরকমের খস্ খস্, গুম্ গুম্ শব্দ কানে আসছে। আমাদের মুখে কথা নাই। চুপচাপ দু'জনে বসে। মেজমামা মাঝে মাঝে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠছেন ; উত্তরে বনপথের দিকে তার সজাগ সতর্ক দৃষ্টি। আর আমি চেয়ে আছি নদীর দিকে।

গা মাঝে মাঝে ছম্ ছম্ করছে, সির সির করে উঠছে, অম্নি মামার দিকে চাইছি। চোখে ঘুম আসছে, কিন্তু মনে ভয় লাগছে, সেজন্য ঘুম আবার চলে যাচ্ছে। যখন নীচে বনের দিকে চাইতে ভাল লাগছে না, তখন চাঁদের আলো ধোওয়া আকাশের দিকে চাইছি।

"মামা, দেখ দেখ, তিনটে হরিণ এসেছে, জল খেতে, কি সুন্দর ! কি ডোরা-কাটা দেহ ! মামা—ওঃ !—"

"চেঁচাসনে, কি হল ?"

"বাঘ ! বাঘ !" তারপর আমার মুখ দিয়ে কথা ফুটল না। নদীর ধারে বাঁশ বনের অন্ধকারে একটি বাঘ বসেছিল, একটি হরিণ যেমন জলে মুখ দিয়েছে, বাঘটি তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল, এক থাবা মারলে তার মাথায়, সমস্ত বন কাঁপিয়ে একটা করুণ আর্ত্তনাদ উঠল, তারপর মরা হরিণটা মুখে করে বাঘ পা টিপে টিপে আবার বনের ভেতর চলে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মত আমি নিশীথ অরণ্যের এই নিদারুণ দৃশ্যটি দেখলুম, মুখে কোন কথা ফুটল না। একটা মর্ম্মভেদী চিৎকার, তারপর আবার সব চুপচাপ ; চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে কোন চিতাবাঘ পাগলের মত হেসে উঠল বুঝি !

আমি ঠক্ ঠক্ করে বসে কাঁপছি।

"মন্টু উঠে দাঁড়া ; ঘুম পেয়েছে, ঘুমোলে চলবে নাত।"

লক্ষ্মণ ঝোরা
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু

দাঁড়িয়েও আমার পা কাঁপতে লাগল। আমি তখন কল্পনার চোখে দেখছি, শালগাছের তলায় বসে বাঘটা হরিণকে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খাচ্ছে, রক্ত দরদর ধারায় মাটি দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। আকাশে চাঁদ ও মেঘের খেলার দিকে চেয়ে রইলুম।

এক পাল হরিণ জল খেতে এল। শঙ্কিত নয়নে তাদের দিকে চেয়ে রইলুম, কোথা থেকে বাঘ বুঝি তাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে! আচ্ছা হরিণগুলোর ত অমন তীক্ষ্ণ শিং, তারা বাঘের সঙ্গে লড়াই করে না কেন? কোন বাঘ এল না, হরিণেরা জল খেয়ে চলে গেল।

রাত আরও গভীর হয়ে এল। পূর্ব্বদিক হতে বাতাস উঠল, ঠাণ্ডা বাতাস, চারিদিকে সরসর, সন্‌সন্‌ শব্দ; জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বনভূমি বাতাসে দুলছে, কাঁপছে; মাঝে মাঝে বন্যজন্তুদের উন্মত্ত করুণ ডাক কানে আসছে। মনে আর ভয় নেই, চোখে ঘুম নেই। এই নিশীথের মহারণ্য যেন আমাকে মুগ্ধ করেছে, ইচ্ছে করছে ওর মাঝে চলে যাই।

"মনু, কেমন লাগছে?"

"গান গাইতে ইচ্ছে করছে মামা।"

"আর দু'ঘণ্টা কোনরকমে কাটিয়ে দে, তারপর পাখীদের গানে সমস্ত বন ভরে যাবে। এখানে খুব আগে ভোর হয়।"

"ওটা কি মামা, ওই দেখ জলে সাঁতার কেটে ওপারে গিয়ে উঠল।"

"ও! ও একটা সাপ, অজগর মনে হচ্ছে, খাবারের সন্ধানে বেরিয়েছে। একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে।"

কিন্তু সে ভয়ঙ্করের যে কি ভীষণরূপ, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

সাপটি নদীর তীরে একটি ছোট গাছে উঠল। একটি বড় চিতাবাঘ,

লক্ষ্মণ ঝোরা
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু

কি সুন্দর দেখতে, লম্বা, ছিপ্‌ছিপে, কালো ফোঁটা-কাটা দেহ, যেন কোন চিত্রকর বসে বসে এঁকেছে, চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। বাঘটি জল খেতে বন থেকে বেরিয়ে নদীর তীরে এল। কিন্তু জলের ধার পর্য্যন্ত তাকে পৌঁছাতে হল না। অজগর সাপ গাছ থেকে চিতাবাঘের গায়ে লাফিয়ে পড়ল, তাকে জড়াতে লাগল।

তারপর সাপে-বাঘে কি ভয়ঙ্কর ভীষণ যুদ্ধ! অজগর সাপ হয়ত হরিণ ভেবে বাঘটির গায়ে পড়েছিল! অজগর বাঘকে তার সমস্ত দেহ দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে লাগল, আর বাঘ তার তীক্ষ্ণ নখ-ভরা থাবা দিয়ে সাপের মাথায় মারতে লাগল, তার দেহ আঁচড়ে ক্ষত বিক্ষত করে তুল্‌ল।

সে কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ!

সাপের হিস্‌ হিস্‌ ও বাঘের দাঁত কড়মড়ানি, ক্ষ্যাপার মত অন্ধক্রোধে চিৎকার! সমস্ত বনভূমি যেন আতঙ্কে শিউরে উঠতে লাগল।

আমি দিশাহারা হয়ে গেলুম। মামা যদি আমাকে টেনে না ধরে থাকতেন তাহলে বোধ হয় আমি এগিয়ে গিয়ে নদীর জলে পড়ে যেতুম।

সাপ ছাড়ে না, বাঘও প্রাণপণে লড়ছে। সে শুধু নিজের প্রাণের জন্য নয় সমস্ত ব্যাঘ্রজাতির মানের জন্য—শক্তির জন্য লড়ছে। বাঘ হচ্ছে জঙ্গলের রাজা। অবশেষে বাঘেরই জয় হল। থাবার পর থাবার আঘাতে সে সাপের মাথা ফাটিয়ে থেৎল করে দিলে! সাপটা তার দেহ থেকে খসে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে বাঘটি বনের অন্ধকারে চলে গেল, তার আর জল খাওয়া হল না।

"মনু, ওদিকে আর তাকাসনি, তুই এদিকে এসে বস। তুই বরঞ্চ এই উত্তরে বনের দিকে নজর রাখ, আমি ওদিকটা দেখছি।

মৃত সাপের দিকে চেয়ে আমার গা ঘিন ঘিন করছিল, হাত পা কাঁপছে। নদীর ধার থেকে সরে এসে বাঁচলুম।

আবার চারিদিকে মহা নীরবতা। সমস্ত বন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। সব

বন্যজন্তুরা যেন পরস্পর যুদ্ধ করে শ্রান্ত হয়ে নিদ্রা যাচ্ছে। আমার চোখেও ঘুম এল ; দু'একবার ঢুলে পড়লুম, তারপর খাড়া হয়ে দাঁড়ালুম, ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না, আমি যে প্রহরী।

চোখ ঝিমিয়ে আসতে লাগল। পাহাড়টা ঢালু হয়ে নেমে গেছে তারপর বনের আরম্ভ। অন্ধকার বন, অবয়বহীন একটা কালো জন্তুর মত গুম হয়ে বসে আছে, এখুনি বুঝি লাফিয়ে উঠবে।

চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। স্তব্ধ অন্ধকারময় অরণ্য যেন গুটি গুটি করে আমার দিকে এগিয়ে আসছে, তার কোন মূর্ত্তি নেই, সেজন্যই তার রূপ ভয়ানক, এক ভীষণ বন্যজন্তুর মত এগিয়ে আসছে, হাত পা কিছু দেখাচ্ছে না, শুধু ক্ষুধিত সূচোলো মুখ, আর হিংস্র চোখ দু'টি জ্বল জ্বল করছে। আমি কি স্বপ্ন দেখছি? চোখ রগড়ে গা ঝাড়া দিলুম। কি ভয়ঙ্কর!



"মা মা! মা মা! আর্ত্তনাদ করে উঠলুম। মামা বিদ্যুৎবেগে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন,

আমাকে পেছনে একটু ঠেলে দিয়ে বন্দুক তুলে ধরলেন। গুম! গুম! গুম! তিনটি গুলি ছুটে গেল অন্ধকার অরণ্যের বুকে। আমার কাণ দুটো যেন ফেটে গেল। কি একটা গর্জ্জন হল, তারপর অন্ধকার বন আবার দূরে সরে গেল।

মামা আমাকে বুকে জড়িয়ে পাশে নিয়ে বসলেন, হাতে কিন্তু বন্দুক উঁচু করা আছে।

"আর ভয় নেই, মনু, এই ভোর হয়ে এল বলে।"

"ক'টা গুলি ছুঁড়লে মামা?"

"ভাল্লুকটাকে তুই খুব সময়ে দেখেছিস, আর একটু দেরী হলে গুলি ছোঁড়ার অসুবিধে হত। কিন্তু রাতের বেলা ভাল্লুক বড় বেরয় না। তুই একটু চোখ বুজে থাক।"

মামার বুকে কতক্ষণ চোখ বুজে ছিলুম জানিনা, যখন চোখ চাইলুম, দেখি, দুঃস্বপ্নের মত বনের রাত কেটে গেছে। পূবের আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে। মলিন চাঁদ পশ্চিমে হেলে পড়েছে। কিন্তু নীচে বনভূমি অন্ধকার, শীতল নীরব।

নদীর ধারে একটা গাছে একটা পাখী গান গেয়ে উঠল, তারপর আর একটি পাখী। তারপর সমস্ত বন পাখীর গানে ভরে উঠল। দূরে পাহাড়ের কালো চূড়ায় কে আবীর ঢেলে দিলে। ঊষার সুন্দর মধুর আলোয় পাখীর গানে চারিদিক ভরে গেল।

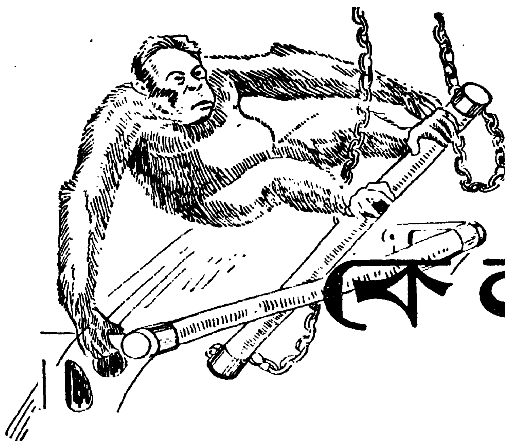
মামা হেসে বল্লেন, "মনু তখন গান গাইতে চাইছিলি, এবার একটা গান গা।"

সকালে আর আমাদের তাঁবুতে ফেরা হল না। দু'জনেরই ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে। সুতরাং নিকটের গ্রামে গিয়ে আমরা আশ্রয় নিলুম। যাবার সময় একটা বুট জুতো খুঁজে পাওয়া গেল না, আমার সেই শুধু পায়েই ফিরতে হ'ল!

আরো তাড়াতাড়ি—



তাঁড়াতাড়ি চলাফিরার যুগের প্রথমে
এরোপ্লেন — ট্রেন — ট্রাম — মোটর
(উপর থেকে নীচে)



কে না পারে?

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

পশু-রাজ্যে টাট্‌কা-নতুন আবিষ্কার "টেলিভিষণ" যন্ত্র আনা বারণ;—কেন জান তো? যন্ত্রটি খুবই আশ্চর্য্য রকমের। রেডিওতে যেমন গান শোনা যায়, এই "টেলিভিষণ" যন্ত্রে তেমন দূর দেশের চলন্ত, জীবন্ত ছবি দেখা যায়। যখন পশু-রাজ্যে সদ্য সার্কাস-ফেরত বনমানুষভায়া একটা "টেলিভিষণ" যন্ত্র নিয়ে গেল, তখন চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ প'ড়ে গেল। স্বয়ং পশুরাজ বল্‌লেন, "সবাইকে খবর দাও; আজই বিকালে এই নতুন যন্ত্রে মানুষের কেরামতির আশ্চর্য্য ছবি দেখান হবে;—দুনিয়ার যত সব আজব কাণ্ড।"

বিকালে হুহুঙ্কার পাড়ার ময়দানে জানোয়ারে জানোয়ারারণ্য হয়েছে—কেউ আর বাদ যায় নি। হাতী, বাঘ, উল্লুক, ভাল্লুক, হায়না, নেকড়ে, বানর, বনমানুষ, গরিলা, হরিণ, হিপ্পো, গণ্ডার, সজারু, কাঙ্গারু, বনবিড়াল, বেজী, ভোঁদড়, জেব্রা, জিরাফ ইত্যাদি আর কত বল্‌ব!

মাঝখানে পশুরাজ সিঙ্গিমশাই দিব্য ব'সে গোঁফে চাড়া দিচ্ছেন। ভাবখানা এই, "দেখ্‌ছ কি! এবার আর আমায় পায় কে? পশুরাজের রাজত্বে টাট্‌কা নতুন 'টেলিভিষণ'।"

তারপর, যথা-সময়ে যন্ত্র ঠিক ক'রে, ছবি দেখান সুরু হ'য়ে গেল। বিষয়টি হচ্ছে "সার্কাস"। প্রথমেই কয়েকটি ঘোড়ার খেলা। ঘোড়াদের যারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাদের সে খেলা তত পছন্দ হ'লো না; কিন্তু, পশুরাজ খুব খুসী হলেন। তারপর সঙের খেলা। সে খেলা দেখে সবাই হেসে কুটিপাটি! তারপর এল 'ট্রাপীজ' বা দোলনার খেলা। সেও খুব জোর খেলা। ক্রমে আসর জম্‌তে লাগ্‌ল।



শিম্পাঞ্জির হাসি

বনমানুষভায়া একবার একটু মাথা চুল্‌কিয়ে বল্‌ল, "এবার অন্য তামাসা দেখান যাক্।" পশুরাজ মাথা নেড়ে, থাবা নেড়ে বল্‌লেন, "না হে! না হে! সার্কাসই চলুক। বেজায় জমেছে এবার।"

বনমানুষভায়া আর কি করে? রাজার হুকুম মানাই চাই;—তাই সার্কাসের ছবিই চল্‌তে লাগ্‌ল। এবার এলেন চাবুক হাতে এক মেমসাহেব। দেখতে ছোট্টখাটো, কিন্তু চাবুকের বহরখানা



সিংহের বাচ্চাও হাস্‌ছে নাকি ?

বিরাট। চটাং চটাং চাবুক চালাচ্ছেন আর তাঁবুর পর্দ্দার দিকে দেখ্ছেন তা'র পর ?—

তা'রপর যা' ঘট্‌ল তা' আর কি বল্‌ব! সকলের চোখ তখন ছানাবড়া! কেউ ভয়ে সট্‌কে পড়্‌ল, কেউ লম্বা জিভ কাট্‌ল, কেউ কাঁচুমাচু হ'য়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগ্‌ল।

ব্যাপারখানা হ'লো এই—



কুকুরের বক্সিং

মেমসাহেবের চটাং চটাং চাবুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর পর্দ্দা ফাঁক ক'রে এক হোঁৎকা সিঙ্গিভায়া ট্রাইসাইকেল চালিয়ে আসরে নাম্‌লেন! ওমা, কি লজ্জার কথা!

এখানেই শেষ নয়। সিঙ্গিভায়া মেম-সাহেবের চাবুকের ভয়ে দিব্য ঘাড় হেঁট ক'রে এক মনে ছেলেটির মত সাইকেল চালিয়ে চলেছেন তো



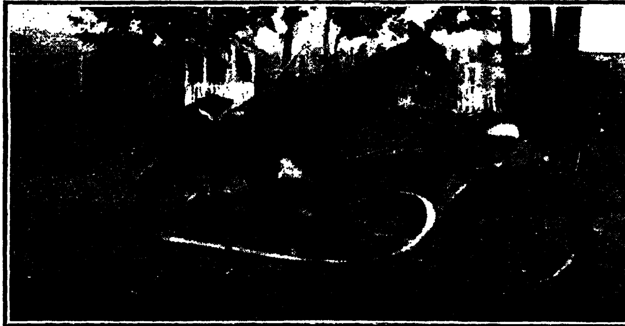
নাচুনে ছাগল

চলেছেনই। মাঝে মাঝে একটু ঢিলা দিলেই মেম সাহেব চাবুক উঁচিয়ে “গো অন্” বল্‌ছেন আর অম্নি সিঙ্গিভায়া নিতান্ত নিরীহ জীবটির মত আরো জোরে সাইকেল চালাচ্ছেন। ছি ! ছি ! ছি ! অপমানের আর শেষ নাই !

সর্ব্বনাশ ! এবার যে কি হবে কে বল্‌তে পারে ? সবাই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে সিঙ্গি-রাজের দিকে চাইল ; কিন্তু, কই তিনি ?



হরিণের নাচ



ক্যাঙ্গারুর মোটর সাইকেল চালাবার সখ হয়েছে

লজ্জায়, অপমানে মাথা হেঁট ক'রে তিনি কখন সুড়ুৎ ক'রে স'রে পড়েছেন কেউ দেখে নি। যাক্, সেদিন তো সকলে মানে মানে স'রে পড়ল। বনমানুষ ভায়া সকলকে

কে না পারে ?

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী



দুই ভায়ে তামাসা

মেনে বল্‌ল, "তোরা তো জানিস্‌, আমি আর দেখাতে চাইনি ;—আমার কোন দোষ নেই।"

এই ঘটনার পর তিনদিন পর্য্যন্ত নাকি সিঙ্গিরাজের গোঁফ ঝুলে ছিল, ল্যাজ একবারও উঁচু হয় নি, থাবার নখ একবারও কেউ দেখে নি ;—একেবারে তিনি মুষড়ে গিয়েছিলেন।

তিনদিন পর হুকুম হ'লো—"এ রাজ্যে 'টেলিভিষণ' যন্ত্র আর কোনদিন আনা হবে না। যেটা এসেছে, পঞ্চাশটা হাতী পঞ্চাশদিন সেটাকে পায়ের তলায় চেপে দুম্‌ড়িয়ে, ভেঙে, গুঁড়ো ক'রে, চুরমার ক'রে তা'র দফা শেষ করবে।"

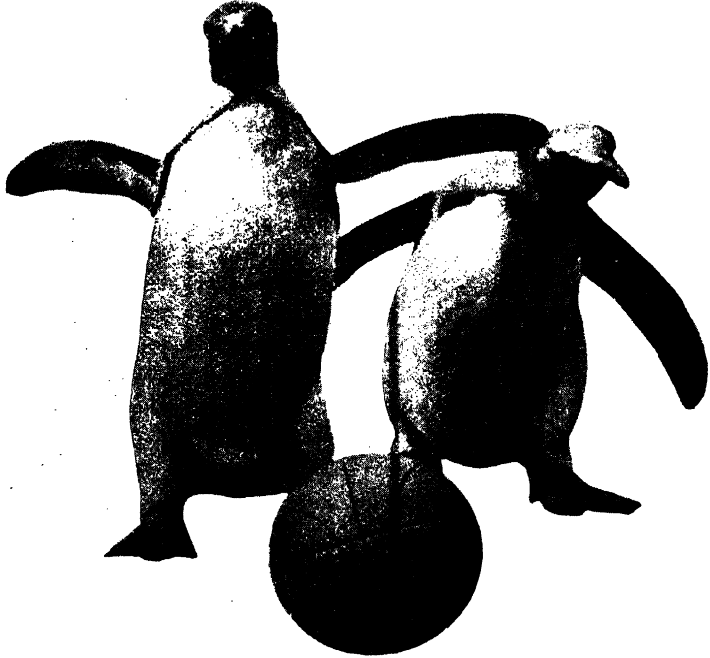
* * *

এ তো গেল গল্পের কথা। সত্যি কিন্তু, মানুষের বিদ্যাবুদ্ধির



রীতিমত রেস চলেছে !

কাছে হিংস্র জানোয়ারের হিংস্রভাব হার মেনেছে। আজ আর মানুষ পশুকে তত ভয় করে না। তাঁদের সঙ্গে ভাব পাতিয়ে, তাঁদের স্বভাব জেনে, তাদের ভালবেসে যত্ন ক'রে পশুকে মানুষ ইচ্ছামত চালাচ্ছে।

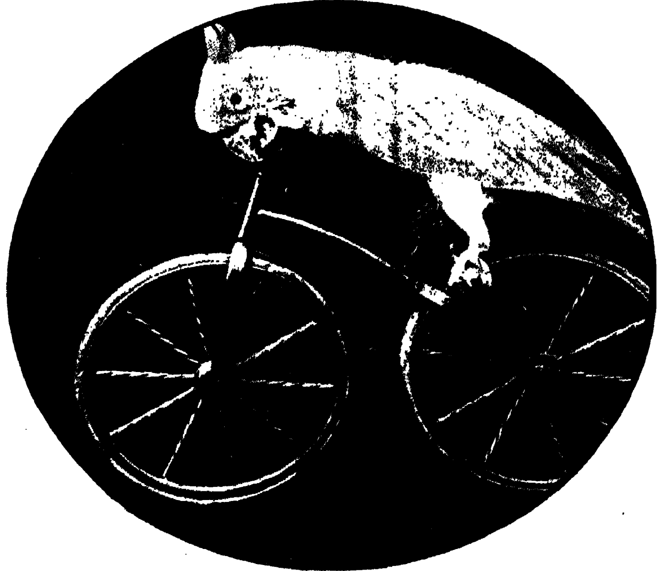


পেঙ্গুইনের ফুটবল খেলা

পশুরাও মানুষের সঙ্গে ভাব পাতিয়ে, মানুষের আদেশ মত নানা রকমের খেলা দেখাচ্ছে; আবার, তাদের মধ্যে যা'রা বুদ্ধিমান (যেমন বনমানুষ, বানর,

কুকুর) তা'রা নিজেই নানা রকমের খেলা শিখ্‌বার চেষ্টা করছে। মানুষও এই সুযোগে তা'দের স্বভাব সম্বন্ধে নানা রকম জ্ঞান লাভ করছে।

আমরা যেমন মনের ভাব প্রকাশ করি, পশুপাখীরাও সে রকম মনের ভাব প্রকাশ করে। কা'রও প্রকাশের ক্ষমতা বেশী, অথবা আমাদের বুঝ্‌বার পক্ষে সুবিধা ; কা'রও কম। হাসি, কান্না, অবাক ভাব, এসব বনমানুষ আর বানরেরা খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারে ;—এমন কি, মুচ্‌কে হাসির ভাবও বেশ প্রকাশ পায় বনমানুষের মুখে। অন্যান্য জন্তুর 'হাসি'র ছবিও অনেক তোলা হয়েছে, কিন্তু, সেগুলি বাস্তবিক হাসি কি না সে বিষয়ে অনেক প্রাণিতত্ত্ববিদের সন্দেহ আছে ছবিগুলি দেখ্‌লে কিন্তু কোনই সন্দেহ হয় না যে, সেগুলি হাসি নয়।



সাইকেলে কাকাতুয়ার কেরামতি

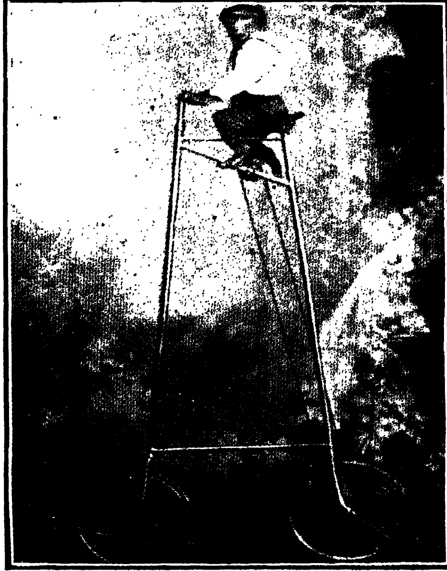
পশুরা কেউ গান করে কিনা জানি না ;—অন্ততঃ তাদের 'গান' গানের মত শোনায় না। পাখীরা যে গান করে তা' আমরা জানি। শিখা'লে পাখী কথাও বলে ; কিন্তু পশুরা কথা শেখে নি আজও। এমন কি, বুদ্ধিমান জীব

কে না পারে ?

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

বনমানুষও কথা বল্‌বার জন্য বিশেষ ব্যস্ত ব'লে মনে হয় না। তবে, মানুষ আজকাল পশুদের আওয়াজ নকল ক'রে তাদের ভাষা শিখ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে।

প্রত্যেক পশুরই খেল্‌বার সখ আছে; তবে, সকলের সখ এক রকমের নয়। কেউ নাচ্‌তে ভালবাসে, কেউ খায় ডিগ্‌বাজি, কেউ দুল্‌তে ভালবাসে, কেউ কুস্তি করে, কেউ কোন জিনিষ নিয়ে কাম্‌ড়া-কাম্‌ড়ি করে, কেউ নিজেদের মধ্যে কাম্‌ড়া-কাম্‌ড়ি, ধস্তাধস্তি করে। মানুষ এই সব খেলা লক্ষ্য ক'রে অনেক জন্তুকে খুব সহজে খেলা শিখাবার উপায় আবিষ্কার ক'রেছে।



বেয়াড়া সাইকেলে বানর ভায়ার ওস্তাদি

পশুপাখীর স্বভাব ভাল ক'রে লক্ষ্য করার ফলেও মানুষ তাদের সম্বন্ধে অনেক নূতন জ্ঞান লাভ ক'রেছে। কেমন ক'রে পশু-পাখীকে সহজে বাধ্য করা যায়, কেমন ক'রে তা'দের খেলা শেখান যায়, এসবের নিয়ম মানুষ এখন বেশ ভাল ক'রে জেনেছে। ফলে, যে সব জন্তু আগে কোন রকমের খেলা-দেখানর কাজে লাগ্‌ত না (যেমন হরিণ, উট, প্রভৃতি), আজকাল তাদের দিয়েও নানা রকমের খেলা দেখান হচ্ছে। এখন ছাগল, হরিণ এরাও দু'পা তুলে নাচতে শিখ্‌ছে।

পেঙ্গুইন পাখী কি রকম অদ্ভুত জীব দেখেছ তো? তা'রা নাকি ফুটবল

নিয়ে খেলা করতে ভালবাসে ;—অন্ততঃ, ফুটবলটিকে তাড়া করতে ভালবাসে। ছবিতে দেখ, ঠিক যেন এরা মানুষের মত ফুটবল খেল্‌ছে।

পশুপাখীর খেলার আর যে কয়টি ছবি দিলাম, সবগুলিতেই সে খেলা তা'দের শেখান হয়েছে। কিন্তু, অনেক সময়ই দেখা যায়, খেলা তা'দের পছন্দসই হ'লে বিনা আপত্তিতে, আদেশ করা মাত্র তা'রা খেলা দেখায়।

বানরভায়া এরোপ্লেনের উপর বসে ভাবখানা দেখাচ্ছেন, যেন "হুকুম পেলেই উড়ে যাই।" ভাল্লুকভায়াও মোটরের 'ষ্টিয়ারিং হুইল' ধ'রে ভাবখানা দেখাচ্ছেন, "মোটর চালিয়ে বুড়ো হ'য়ে গেলাম ; আমার কাছে তো এ সব ছেলেখেলা।" হাতীর ঠেলাগাড়ীর চেহারাখানাও একবার দেখ! যেমন হাতীর শরীরখানা, তেমনই তো মজবুত তার গাড়ী চাই। হাতী-গিন্নি দিব্য টুপি মাথায়, সামনের পা তুলে আরাম ক'রে বসেছেন ; পিছন থেকে হাতীভায়া ঠেল্‌ছেন। হাতীর বাচ্চাকে দেখ, কেমন লক্ষ্মী-ছেলের মত ট্রাইসাইকেল চালাচ্ছে।

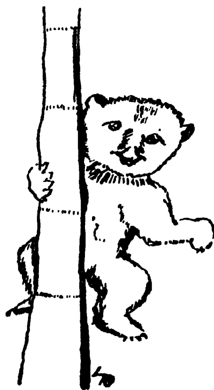
পশুদের মত পাখীরাও যে খেলা শিখ্‌তে পারে, কাকাতুয়ার সাইকেল-চালান তা'র একটা প্রমাণ। পাখীরা আরও নানা রকমের খেলা দেখায়। একটা সার্কাসে পায়রার চমৎকার তামাসা দেখিয়েছিল। টিয়াপাখীর খেলা তো কত সময় রাস্তাঘাটেই দেখা যায়। এমন কি, ছোট্ট ক্যানারি পাখীও খেলা দেখায়।

মানুষের যত্ন এবং চেষ্টার ফলে প্রায় সব জন্তুকেই খেলা শেখান হচ্ছে। উটের তামাসা, শীলের (Seal) তামাসা, সিন্ধু-সিংহের বা Sea-lion এর তামাসা— এ সব আজকাল প্রায়ই দেখা যায়। চাই কি, শেষটায় পশুরা হয় তো নিজেই সার্কাস খুলে বস্‌বে! কলিযুগে আজবের শেষ নাই।

বাচ্চা

শ্রীমতী লীলা দেবী, এম. এ.

"নারে বাবা, ঢের দেখেছি ; কিন্তু এ ছানাটা সত্যি বড় বিট্‌কেল দেখতে।"



ভালো ক'রে দেখবার জন্য খুদে ভাল্লুক মোটা মোটা কাণ তুলে ঘাড় কাৎ ক'রে সরসর ক'রে সুপুরি গাছ বেয়ে নেমে কাছে এলো।

দেখ্‌লো ছানাটার গায়ে লোম-ছাড়ানো ; ন্যাড়া, ভুঁড়ি-বের-করা। ছি! তা'তে কালো সূতোয় ছ্যাঁদা পয়সা বাঁধা। এরাম, মাগো! কুৎকুতে চোখের ধারে কাজল মাখা, নাকে সর্দ্দি।



চেহারা দেখে খুদে ভাল্লুকের বেজায় হাসি পেলো, একটা গোব্‌দা হাতের

বাচ্চা

শ্রীমতী লীলা দেবী, এম, এ,

আড়ালে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ ক'রে খুব খানিকটে হেসে নিলো। তারপর ইদিক্ উদিক্ তাকিয়ে মাগোকে খুঁজতে লাগ্লো।

বিশ্রী দেখ্তে ছানাটা ফোক্লা মাড়ি বের ক'রে ফিক্ ফিক্ হাস্তে লাগ্লো; এদিকে ঐ তো রূপ!

খুদে ভাল্লুক দেখলো ছানাটার আশেপাশে কেউ নেই, একটা ছোট বাড়ীর সাম্‌নে কালো বালিশে মাথা দিয়ে রোদ পোয়াচ্ছে বোধ হয়।

খুদে ভাল্লুকের হঠাৎ খিচুড়ীর গন্ধ পেয়ে বড্ড খিদে পেলো, তাই সে ছানা দেখা বন্ধ ক'রে হেলে দুলে বাড়ীটার পিছনদিকে চলে গেল। মনে পড়ে গেছিলো ঝাঁক্ড়ামামারা পাথর উল্‌টে মোট্কা পোকা ধ'রে খাচ্ছিলো; একটা দিয়েছিলো, মাগো কি মিষ্টি!



খুদেও গেছে আর তার হোঁৎকা মাও গোঁফ নাড়তে নাড়তে এসে উপস্থিত। সে এতক্ষণ মৌমাছি খাচ্ছিলো। খুদের খোঁজে এসে সেও ছানাটাকে দেখ্তে পেলো। বল্লে মাগো কি মিষ্টু! নাদুস্‌নুদুস্ খালি গা, তেলচুক্‌চুকে, চোখে কাজল, ফোক্লা হাসি, গাল বেয়ে নালঝোল গড়াচ্ছে, মাথাভরা নরম নরম লাল্‌চে চুল। ভাল্লুক তা'কে টুপ্ করে কোলে তুলে নিলো।

তাইতেই কি দারুণ হৈ চৈ! খোকাটার মা কেঁউ কেঁউ করছে, বাবা দৌড়োদৌড়ি করছে, ঠাকুর্দ্দা রেগে চেঁচাচ্ছে, ঠাকুমা ফোঁৎফোঁৎ করছে। ভাল্লুক বেগতিক দেখে ছানা নিয়ে খাড়া পাহাড় বেয়ে কিছুটা উঠে পাথরে পা ঝুলিয়ে ছানা-কোলে বসে ব্যাপার দেখ্তে লাগ্লো।

তার রেজায় হাসি পাচ্ছিলো। কোলের ছানাটাও বিড়বিড় শব্দ কচ্ছিলো আর মোট্কা হাত বাড়িয়ে তা'র নাকে মুখে বুলিয়ে দিচ্ছিলো।

বাচ্চা

শ্রীমতী লীলা দেবী, এম, এ,

ভাল্লুক আহ্লাদে গদগদ হয়ে তা'কে আস্তে আস্তে দোল দিতে লাগ্‌লো।

কি আপদ্! নীচে লোকগুলো যে রেগে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। প্রথম তা'রা ছোটখাট ইঁটপাট্‌কেল ছুঁড়তে লাগ্‌লো। এই বুদ্ধি নিয়ে বাপু চরে খাস্? ছানাটার যদি লাগ্‌তো, ঐ তো টিপ্!

ভাল্লুক পাহাড়ের গায়ে আরেকটু ঘেঁষে বস্‌লো। তা'রা বাঁখারী হাতে খোঁচা দিতে চেষ্টা করলো। তা' সে বেঁটে বাঁখারী অতদূর পৌছবে কেন?

ভাল্লুক এক প্রচণ্ড ধমক্ দিলো, ওরকম খচ্‌মচ্ কল্লে ছানা ভড়কাবে না? রাম বুদ্ধি বাবা তোদের, সাধে মানুষ হয়ে জন্মেছিস্!

সে ছানাটার গালে আস্তে আস্তে চুমু খেতে লাগ্‌লো। তাই না দেখে নীচে ছানার বোকা মা'টা হাঁউমাউ ক'রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। ভাল্লুকের এমন বিরক্তি লাগ্‌লো যে সে একটা বড় গোছের পাথর গড়িয়ে দিতে বাধ্য হোলো। আরে বাবা! তোর চেয়ে ঢের বেশী ছানা মানুষ করেছি, আমি জানি না কিসে কি হয়!

তা'তে তারা কিছুক্ষণের জন্য দূরে গাছতলায় সরে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগ্‌লো।

খানিকবাদে ফিরে এসে এক ঝুড়ি বাতাসা, কলা, আঙ্গুর এইসব রেখে আবার চলে গেলো। ভাল্লুক দেখ্‌লো তারা বেশীদূর গেলো না, ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগ্‌লো। কিন্তু ভাল্লুক ঢের মধু খেয়েছিলো, ক্ষিদে পায় নি, তা'ছাড়া কে যায় বাবা ওসব গোলযোগের মধ্যে!

এদিকে সকালবেলার সূর্য্যটা মাথার উপর চড়েছে, বেজায় গরম হচ্চে। ভাল্লুক নিজের গা দিয়ে বাচ্চাটাকে আড়াল ক'রে পাথরে ঠেসান দিয়ে নানান্ কথা ভাবতে লাগ্‌লো।



এবার ওড়া যাক্



"সবাই   ায় ; আমিই কেন না চালাই"

বাচ্চা

শ্রীমতী লীলা দেবী, এম, এ,

ছোটবেলা সেই শীতের আগে, ফল জড় করবার ধূম একটুখানি আবছায়া-মতন মনে আছে। শীতের হাওয়া লেগে গাছের পাতাগুলো যেন শক্ত হ'য়ে এঁটে থাক্‌তে চাচ্ছে, যাই একটু অন্যমনস্ক হচ্ছে অমনি লাল্‌চে হ'য়ে ঝরে পড়ছে! তারপর সারাশীত সে কি নাক্‌-ডাকানোর পালা! কি যে পরম আরাম, গাছের গুঁড়ির ফোকরে ঘুম, খাবার তাড়া নেই, শত্রুর দেখা নেই, শিকারীর ভাবনা নেই!

শিকারী বল্‌তেই ভাল্লুক সটান্ হয়ে বস্‌লো। মনে পড়লো সেই অনেক দিন আগে শিকারীর পেন্টুলুনের এক কামড় খেয়ে দেখে মা বলেছিলো "ও বড় বদ্ খেতে, খাস্‌নি রে!"

সে অনেক দিন আগে; ভুলেই গেছিলো; এখনও মনে হচ্ছে সে যেন আর কারও মার' বিষয়। তারপর আর মনে নেই। সে মা এখন কোথায় মৌমাছি তাড়িয়ে মধু খাচ্ছে, না সে সব ছেড়ে ছুড়ে কোন্ চুলোয় চলে গেছে কে জানে!

সূর্য্যটার তেজ কমে আস্‌তে লাগ্‌লো, গাছের মাথায় মাথায় পাতাগুলো কুচিকুচি আলো ধরতে লাগ্‌লো। নাঃ, এক জায়গায় আর ভালো লাগে না। পায়ের গাঁটে বাতে ধরেছে, সে বয়স কি আর আছে রে! তা'ছাড়া ছানাটারও তো ক্ষিদে পেয়েছে। ভাল্লুক গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, দেখ্‌লো নীচের লোকগুলো কখন্ দুত্তোর ব'লে চলে গেছে, খালি বাচ্চার সেই বোকা মতন মা'টা একদৃষ্টিতে ওপরে তাকিয়ে আছে।

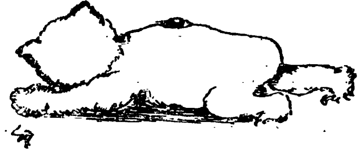
কিন্তু উঠে দাঁড়াতেই কোত্থেকে সব হাঁইহাঁই করে এসে জুট্‌লো। ভাব দেখে রাগ ধরে, যেন কী এক বিষম কাণ্ড বেধেছে! এই সামান্য জিনিষ নিয়ে এতো হৈচৈ! ইচ্ছে ক'রে ভয় দেখাবার জন্য ছেলেটাকে এক হাতে ঝুলিয়ে নিলো! ভাব্‌ছে দিই ফেলে!

এমন সময় চোখ পোলো নিজের ছানা ঝাঁকড়া চুল নিয়ে হেলে দুলে

বাচ্চা

শ্রীমতী লীলা দেবী, এম. এ.

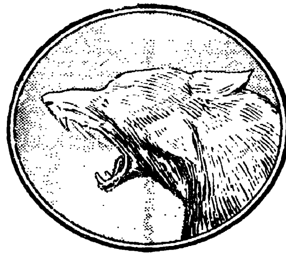
হাসি হাসি মুখ নিয়ে ঐ আস্‌ছে। মানুষগুলোর দেখাদেখি যেই ছানা ওপরে তাকিয়েছে, দেখে মা'র কোলে সেই খালি-গা বিশ্রী ছানাটা! ভাল্লুক-বাচ্চা মাটিতে গড়িয়ে হাত পা ছুঁড়ে কুঁই কুঁই করে কেঁদে উঠলো।



কিন্তু লোকরা তার কাছে পৌছবার বহু আগে ধুপ্‌ধাপ্ ক'রে তার চার-মণি মা পাথর বেয়ে নীচে নেমে মানুষছানা ডুম করে মাটিতে ফেলে তা'কে তুলে নিয়ে এক নিমেষেই অন্তর্ধান! যাবার সময় কুৎকুতে ছানাটার মা'র মাথায় আস্তে এক চাঁটি দিয়ে গেলো।

পরে লোকরা দেখ্‌লো ফলের ঝুড়িটাও নেই।

কিন্তু সে লতু নিনুদের কম্মো'ও তো হ'তে পারে?





শ্রীমতী পুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী

এ আবার কি! গাছটাকে এমন করে দড়ি দিয়ে জড়িয়ে বাঁধ্‌লে কে?

দড়ি নয় তো—ও হচ্ছে একরকম লতা! ডাল নাই, পাতা নাই, (twine) টোয়াইন সূতোর মত সরু লম্বা অদ্ভুত এই লতা, মাটিতে না জন্মিয়ে গাছের উপরে জন্মায়—তারপর সেই গাছের রস শুষে খেয়ে যত বড় হয়, ততই গাছটাকে নাগ পাশের মত জড়িয়ে ধ'রে তার দফা শেষ ক'রে দেয়। সোনার মত রং দেখে লোকে এর নাম রেখেছে স্বর্ণলতা, কিন্তু নাগিনী লতা কিম্বা ডাইনী লতা বল্লেই এর রাক্ষুসে স্বভাবের উপযুক্ত হত; না?

আরেক রকম রাক্ষুসে গাছ আছে, তারা হ'ল শিকারী। তারা ফাঁদ পেতে পোকামাকড় ধরে খায়। তাদের কারো কারো পাতায় একরকম আঠালো শুঁয়ো থাকে, তাতে পোকামাকড় বসলেই আটকিয়ে যায়; অমনি খপ্‌ করে পাতাটা বন্ধ হয়ে যায়; একেবারে পোকাটাকে হজম ক'রে, তবে আবার খোলে। কারো বা ফুলের এমন অদ্ভুত গড়ন, যে তার ভিতরে পোকারা একবার ঢুকলে আর বেরোতে পারে না। পোকা-মাকড়, মাছি এমন কি ছোট ছোট পাখীকে পর্য্যন্ত শিকারী গাছের ফাঁদে পড়তে দেখা যায়।

শিকারী গাছরা ফাঁদ পেতে পোকা ধরে খায়, আবার কতগুলি গাছ আছে,

আজব গাছ

শ্রীমতী পুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী

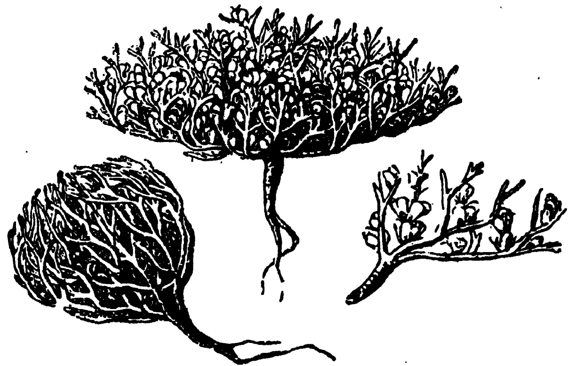
তারা পোকাদের সঙ্গে বেশ লেন্-দেনের কারবার করে। কি রকম লেন্‌দেন জান? গাছেরা ওদের মধু খেতে দেয়, তার বদলে ওরা গাছেদের মস্ত একটা কাজ করে দেয়। ফুল থেকেই ফল হয়, তা জান তো? ফুলের মধ্যে যে রেণু থাকে সেই রেণু নিয়ে পোকারা ফুলের বীজ কেশরে লাগিয়ে দেয়; তবেই বীজ কেশরটি প্রাণ পেয়ে, বড় হয়ে ক্রমে ফল হয়ে দাঁড়ায়!



এখানে যে সুন্দর ঝাড়ের মত ফুলওয়ালা গাছটি দেখছ, এর নাম য়ুকা (yucca)। এই গাছে সর্ব্বদাই একরকম প্রজাপতি দেখতে পাওয়া যায়; এই প্রজাপতির বাচ্চারা য়ুকা ফুলের বীচি ছাড়া কিছু খায় না! য়ুকা ফুলের মধ্যেই এই প্রজাপতি সর্ব্বদা ডিম পাড়ে—বীজকেশরের গোড়ায় একটি করে ডিম পাড়ে, আর এক ডেলা করে রেণু নিয়ে বীজ কেশরের মুখে বসিয়ে দেয়—যতদিনে বীজটি বড় হয়ে পাকে, ততদিনে ডিম ফুটে প্রজাপতির বাচ্চা বেরিয়ে এসে ঐ বীচি খায়। এমনি করে একসঙ্গে গাছের বীজ পাকবার আর প্রজাপতির খাবার বন্দোবস্ত হয়ে যায়!

পরের পৃষ্ঠায় একটা অদ্ভুত ফুল দেখ—যেন হাড়গিলের মুণ্ডু! চেহারা যেমন অদ্ভুত, গন্ধও তেমনি বিকট—ঠিক যেন পচা মাংসের মত! ঐ পচা গন্ধের

লোভেই ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি আর পোকা এসে এর কাছে জোটে! এর যে ঠোঁটের মত নলটা দেখছ, ওর ভিতরে সারি সারি রোঁয়া এমনভাবে সাজানো আছে যে, পোকা ও মাছিরা ঢোকবার সময় কোন বাধা পায় না, কিন্তু বেরোতে গেলেই রোঁয়াগুলি পথ আটকায়—কাজেই বেচারারা ভিতরে বন্ধ হয়ে যায়! ঐ যে মুণ্ডুর মত ফোলা জায়গাটা, ওর ভিতরে ফুলের কেশর আছে—পোকাগুলি বেরোবার জন্য ব্যস্ত হয়ে যত ছুটোছুটি করতে থাকে, ততই ওদের গায়ে রেণু লেগে যায়, আবার সেই রেণু বীজকেশরে লেগে যায়। দু একদিন পরে নলের রোঁয়াগুলো শুকিয়ে যায়, তখন পোকারা ছাড়া পায়;—দেখ্‌লে, কেমন কায়দা করে গাছটা ওদের ফাঁদে ফেলে নিজের কাজ করিয়ে নেয়?

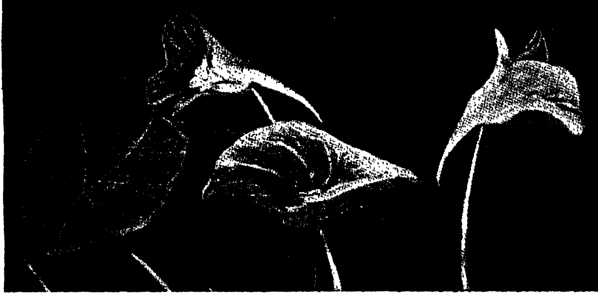


এই যে শুক্‌নো শিকড়ের মত জিনিষটা দেখ্‌ছ, একে "অমর গাছ" বলতে পার। একে জলে দিলেই খানিকপরে দিব্য তাজা একটি গাছ হয়ে যায়, আবার জল থেকে

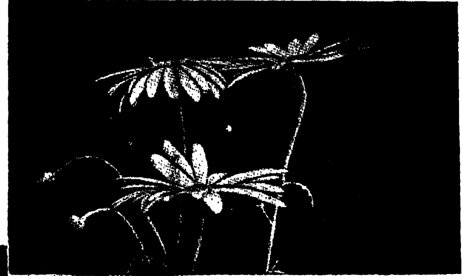
আজব গাছ

শ্রীমতী পুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী

তুলে নিলেই আবার কুঁকড়িয়ে শুকিয়ে যায়—এমনি করে যতদিন পরে এবং যতবার ইচ্ছা, ওকে মরানো আর বাঁচানো যায়।



কত গাছের যে কত অদ্ভুত স্বভাব থাকে ;—লজ্জাবতীর পাতা ছুঁলেই পুট্‌পুট্‌ করে বুজে যায়, বনচাঁড়ালের পাতা তালে তালে নাচে, অনেক গাছের পাতা রাত্রে ঘুমে বুজে যায়, এসব বোধহয় তোমরা শুনেছ, কিন্তু কোনও গাছকে রাত্রে জোনাকীর মত জ্বলতে শুনেছ কি ? উপরের এই ফুলগাছটি দেখ—অন্ধকারে এর গা থেকে কেমন সুন্দর আলো বেরোচ্ছে! ঝড়বৃষ্টির আগেই নাকি এই রকম আলো বেশ পরিষ্কার দেখা যায়!

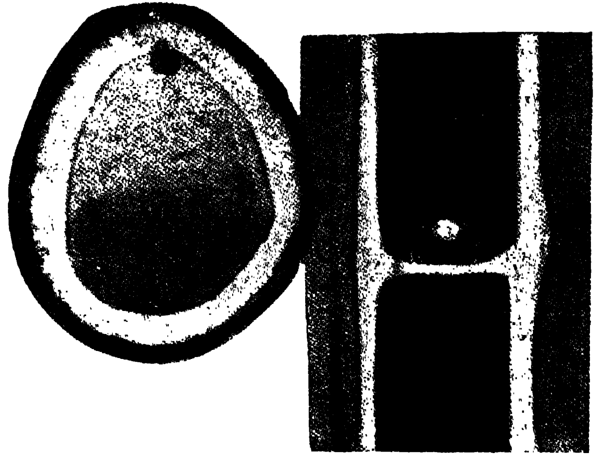




সমুদ্র-যাত্রার সময় যদি ঢেউ বেশী থাকে, তাহ'লে জাহাজের দোলানিতে অনেকেরই মাথা-ঘোরা, বমি ইত্যাদি হয়—তাকে বলে সমুদ্র-পীড়া (sea sickness.)। এই

ফুলগাছটি জাহাজে ছিল—সমুদ্র যখন শান্ত থাকত, তখন দেখ গাছটির কেমন দিব্য তাজা চেহারা, আর দোলানি আরম্ভ হ'লেই তার দুর্দ্দশা দেখ! নিশ্চয়ই বেচারার "সমুদ্রপীড়া" হয়েছে!

গাছেদের প্রাণ আছে, তারাও খায়-দায়, সুতরাং মাঝে মাঝে তাদের বদ্‌হজম হওয়া আশ্চর্য্য কি? মানুষের শরীরে হজমের দোষে অনেক সময় একরকম পাথর হয়, তাতে ভয়ানক যন্ত্রণা হয়। গাছেদের যন্ত্রণা হয় কি না জানিনা, কিন্তু পাথর যে হয়, তাতে সন্দেহ নাই। ছবিতে দেখ, বাঁশের মধ্যে আর নারকেলের মধ্যে কেমন পাথর হয়েছে—বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে বলেছেন যে এগুলো নাকি গাছের পাথুরি রোগ!



গাছেদের কি বুদ্ধিশুদ্ধি আছে নাকি? তা'রা যেরকম চেষ্টা ক'রে নিজেদের যা দরকার তার ব্যবস্থা করে—কোথায় জল, কোথায় খাবার, মাটির নীচে কতদূর শিকড় চালিয়ে তার সন্ধান করে নেয়—কোথায় আলো বাতাস যথেষ্ট পাবে তেমনি করে বেঁকেচুরে ওঠে, কোনও বাধা পেলে কত কৌশল করে সেটা অতিক্রম করে—সেকথা ভাবলে, কথাটা অসম্ভব মনে হয় না।

পরপৃষ্ঠার গাছটাকে দেখ; মরুভূমির মত শুক্‌নো দেশে এর জন্ম। সেখানে

আজব গাছ

শ্রীমতী পুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী

অনবরত ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বালি উড়ে এসে দম বন্ধ করে ফেলতে চায় এরকম অবস্থায় পড়লে আমরা কি করি ? ঝড়ের দিকে পিছন ক'রে দাঁড়াই না ? এই গাছেরাও ঠিক সেই কায়দা করে—এরা বাতাসের উল্টো দিবে মুখ করে থাকে, কাজেই ঝড় আর বালিতে এদের ক্ষতি করতে পারে না।



আমার জানালার ধারে একটা লতা আছে, গ্রীষ্ম-কালে তার ডগাগুলি সব ঘরের মধ্যে ঢুকে এসেছিল, আবার বর্ষা পড়তেই তারা আপনি বেঁকে ঘুরে বাইরে চলে গেল—কেন বলতো ? গরমের সময়ে কড়া রোদ থেকে কচি কচি নরম ডগাগুলিকে রক্ষা করবার দরকার ছিল, তাই তারা ঘরের মধ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছিল—বর্ষাকালে তাদের বৃষ্টির জল আর মিঠে রোদ দরকার, তাই তারা আবার আপনিই বাইরে চলে গেল !

এসব দেখলে কি মনে হয়না যে "অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা" করে নেবার মতন একটুখানি সহজবুদ্ধি ওদের আছে ?



৺সুকুমার রায়চৌধুরী

সবাই নাচে, ফূর্ত্তি করে, সবাই গাহে গান,
একলা ব'সে হাঁড়িচাঁচার মুখটি কেন ম্লান ?—
"দেখ্‌ছ নাকি আমার সাথে সবাই করে আড়ি—
তাইতে আমার মেজাজ খ্যাপা, মুখটি এমন হাঁড়ি।"

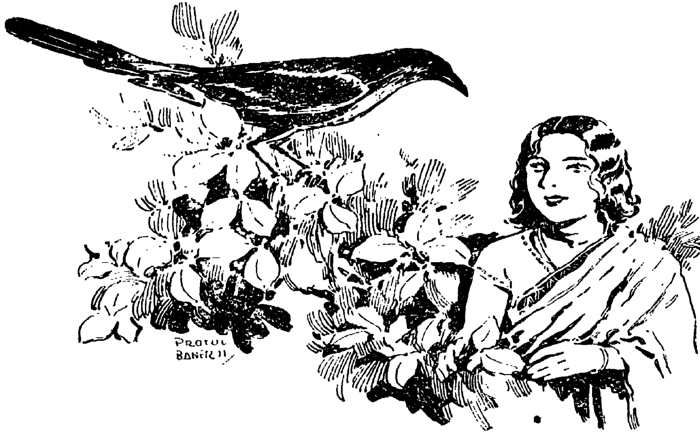
তাও কি হয়! ঐযে মাঠে শালিখ পাখী ডাকে,
তার কাছে কৈ যাওনি ত ভাই শুধাওনিত তাকে!—
"শালিখ পাখী বেজায় ঠ্যাঁটা চেঁচায় মিছামিছি,
হল্লা শুনে হাড় জ্বলে যায়, কেবল কিচিমিচি।"

মিষ্টি সুরে দোয়েল পাখী জুড়িয়ে দিল প্রাণ,
তার কাছে কৈ বস্‌লে না ত, শুন্‌লে না তার গান!—
"দোয়েল পাখীর ঘ্যান্‌ঘ্যানানি আর কি লাগে ভাল ?
যেমন রূপে তেমন গুণে, তেম্নি আবার কালো।"

সঙ্গীহারা

৺সুকুমার রায়চৌধুরী

রূপ যদি চাও যাও না কেন মাছরাঙ্গার কাছে ;
অমন খাসা রঙের বাহার আর কি কারো আছে ?—
"মাছরাঙ্গা ! তারেও কি আর পাখীর মধ্যে ধরি ?
রকম সকম সঙের মতন, দেমাক দেখে মরি ।"



পায়রা, ঘুঘু, কোকিল, চড়াই, চন্দনা, টুনটুনি,
কারে তোমার পছন্দ হয়, সেই কথাটি শুনি !
"এইগুলো সব ছ্যাবলা পাখী নেহাৎ ছোট জাত—
দেখলে আমি তফাৎ হটি অন্নি পঁচিশ হাত !"

এতক্ষণে বুঝতে পারি ব্যাপারখানা কি যে—
সবার তুমি খুঁৎ পেয়েছ, নিখুঁৎ কেবল নিজে !
মনের মতন সঙ্গী তোমার কপালে নাই লেখা,
তাইতে তোমায় কেউ পোছে না, তাইতে থাক একা !



শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

এক

আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগেকার কথা। তখন বাংলা এবং বিহারের সিংহাসনে রাজা হলেন, মহীপালদেবের ছেলে নয়পাল। সেই সময় বাংলা দেশে এক ভুবন-জয়ী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। একদা সমস্ত ভারত-ভূমি তাঁর জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল, দীপের আলোয় যেমন অন্ধকার আলোকিত হয়ে ওঠে। তাই ইতিহাসে তিনি দীপঙ্কর শ্রী নামে পরিচিত। তাঁর শ্রী বা সৌন্দর্য্য এই রকম ছিল যে, তিনি যেখানে যেতেন, সেই যায়গাই দীপের আলোয় হেসে উঠতো। জ্ঞানে তিনি সকলের বড় ছিলেন বলে তাঁর আর এক নাম হয় জ্ঞান-অতীশ। লোকে সাধারণত তাঁকে অতীশ বলেও জানতো। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে-সব মহাপুরুষের নাম অনন্ত কাল পর্য্যন্ত বেঁচে থাকবে দীপঙ্কর হলেন, তাঁদেরই একজন। এবং আমাদের পরম গৌরবের বিষয় যে, তিনি আমাদেরই মত ছিলেন, এই বাংলা দেশেরই ছেলে।

হিমালয়ের এপারে ভারতবর্ষ, ওপারে তিব্বত, দুই দেশই তাঁর জ্ঞানের

আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল। আজও তিব্বতবাসীরা দেব অতীশের নাম স্মরণ করে নিত্য প্রণতি জানায়।

হিমালয়ের ব্যবধান দূর করে সেদিন দীপঙ্কর এই দুই দেশকে এক করেছিলেন।

দুই

পূর্ব্ব বঙ্গের বিক্রমপুরে এক রাজার ঘরে দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মার নাম প্রভাবতী, পিতার নাম কল্যাণ শ্রী। ছেলেবেলায় তাঁর বাপ মা তাঁর নাম রেখেছিলেন চন্দ্রগর্ভ।

সুখের বিষয় তিনি যে-বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে বংশে অর্থের অভাব ছিল না এবং তাঁরা অর্থকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য মনে করতেন না। কল্যাণ শ্রী স্থির করলেন যে, তাঁর পুত্রকে তিনি ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এবং অন্য সব জ্ঞানে সুপণ্ডিত করে তুলবেন।

জেতারী নামে এক অবধূতের কাছে বালক চন্দ্রগর্ভের শিক্ষা আরম্ভ হলো। বিস্ময়ের ব্যাপার বালক অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতি দুরূহ সব গ্রন্থ পড়তে আরম্ভ করে দিল। কিশোর-কালের মধ্যেই তিনি অধিকাংশ শাস্ত্র পড়ে শেষ করে ফেল্লেন।

সেই সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেশ ভ্রমণ করতে করতে তাঁদের দেশে উপস্থিত হন। বালক চন্দ্রগর্ভের সহিত সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শাস্ত্র নিয়ে বিচার হয়। বিচারে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বালকের কাছে পরাজিত হন। এমনি অপূর্ব্ব মেধা ছিল সেই বালকের।

রাজ পরিবারের সুখ-ঐশ্বর্য্য ভোগ করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হলো না। সেই কিশোর-কালেই তিনি বেরুলেন, বৃহত্তর জ্ঞানের অনুসন্ধানে। কৃষ্ণগিরির বৌদ্ধ বিহারে মহাপণ্ডিত রাহুল গুপ্তের কাছে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম-শাস্ত্র পড়তে

লাগলেন। সেখানকার পাঠ শেষ করে তিনি ওদন্তপুরীর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেন। সেখানকার প্রধান আচার্য্য শীল রক্ষিতের সংগৃহীত যে-সব দুষ্প্রাপ্য শাস্ত্র ছিল, তা-ও শেষ করলেন। চন্দ্রগর্ভের অসামান্য প্রতিভা এবং জ্ঞান দেখে, শীলরক্ষিত তাঁর নাম দিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। সেই থেকে তিনি দীপঙ্কর নামে পরিচিত।

তিন

দেখতে দেখতে তাঁর বিদ্যা এবং ধর্ম্ম-জ্ঞানের কথা ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো।

তিনি সংসারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে বৌদ্ধ-ভিক্ষুর পীত-বসন পরিধান করলেন। যেখানে বুদ্ধদেব জ্ঞান লাভ করেছিলেন, সেই বুদ্ধ গয়ায় মহাবোধি মঠে তিনি বাস করতে লাগলেন।

সেই সময় হঠাৎ চেদী বংশের কর্ণদেব বাংলা দেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু রাজা নয়পালের কাছে তাঁর ভীষণ পরাজয় হয়। প্রতিদিন তাঁর অসংখ্য সৈন্য নিহত হতে লাগলো।

সেই নিদারুণ লোক-হত্যা দেখে দীপঙ্করের মনে বড় আঘাত লাগলো। তিনি নিজে দূত হয়ে, উভয় দলের সঙ্গে কথা বলে, যুদ্ধ বন্ধ করে দেন।

সেই সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে চীনে, তিব্বতে, দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এত বড় বিশ্ববিদ্যালয় সে-সময় জগতে আর ছিল না। দীপঙ্কর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ হয়ে দেশ-দেশান্তরের ছাত্রদের জ্ঞান-বিতরণ করতে লাগলেন।

হিমালয়ের ওপারে তিব্বতে তাঁর অপূর্ব্ব জ্ঞান-মহিমার কথা তখন আর একজন লোকের মনে এক তীব্র জ্ঞান-পিপাসা জাগিয়া তুলেছিল। তিনি হলেন স্বয়ং তিব্বতের রাজা যশী হড্। দেশের লোকের অজ্ঞতা দেখে, তাদের মধ্যে

নিদারুণ ধর্ম্ম-জ্ঞানের অভাব দেখে, সিংহাসনে বসেও, তাঁর মনে শান্তি ছিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, যেমন করেই হক্, তিব্বত থেকে এই অজ্ঞতা, এই অধার্ম্মিকতা দূর করতে হবে।

চার

তিনি স্থির করলেন, পুরোণো দলের লোকদের দিয়ে হবে না, নতুন মানুষের দল তৈরী করতে হবে। বেছে বেছে সাতটী বুদ্ধিমান্ বালক সংগ্রহ করলেন। তাদের পিতামাতার কাছ থেকে যশী হড্ তাদের জীবনের সমস্ত দায়িত্ব এবং ভার গ্রহণ করলেন।

সেই সাতটী ছেলেকে তাঁর নিজের মতন করে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুল্লেন। এই ভাবে ক্রমে তিনি একুশ জন যুবককে গড়ে তুল্লেন।

তাদের শিক্ষা শেষ হলে, একদিন তাদের সকলকে ডেকে তিনি বল্লেন, এখানকার শিক্ষা তোমাদের শেষ হয়েছে। কিন্তু তোমাদের শিক্ষা এখনও অসম্পূর্ণ। এইবার তোমাদের হিমালয় পার হয়ে, কাশ্মীরে, মগধে, তক্ষশীলায় যেতে হবে। সেখানে ভারতবর্ষে মহাজ্ঞানী সব পুরুষ আছেন। সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে, সেই সব পণ্ডিতদের কাছ থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করে তোমাদের তিব্বতে ফিরতে হবে। আর একটী কথা, তোমাদের সঙ্গে আমি প্রচুর স্বর্ণ দেব ; তিব্বতে সত্যকারের জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য সেই স্বর্ণ দিয়ে ভারতবর্ষ থেকে যাকে তোমরা উপযুক্ত মনে করবে, সেই রকম একজন পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠকে তিব্বতে নিয়ে আসতে হবে।

যশী হড়ের আদেশ নত মস্তকে গ্রহণ করে একুশ জন জ্ঞান-ভিক্ষু জ্ঞান-অমৃতের জন্যে সেদিন দুর্গম হিমালয়ের পায়ে-হাঁটা পথ দিয়ে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করেন।

সে কি দুর্গম পথ! স্বর্ণ-খনির লোভেও সে-পথ দিয়ে মানুষ যাতায়াত

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান
শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

করতো না। পদে পদে সেখানে তুষারের মধ্যে পথ হারিয়ে যায়। পথে পথে দস্যু, দস্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর সব হিংস্র জন্তু, বিষ-ভরা সব বিষ-ধর। কোথাও দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় মেঘের ওপরে মাথা তুলে আছে, কোথাও তরণী-হীন দুস্তর নদী, কোথাও বা অন্ধকারে পথহীন অরণ্য যোজনের পর যোজন বিস্তৃত হয়ে আছে।

সেই দুর্গম পথে যাত্রা করলো, একুশ জন জ্ঞান-ভিক্ষু।

উনিশ জন সে-পথ দিয়ে আর ফিরে এলো না। পথ তাদের গ্রাস করে নিল। মাত্র দুজন ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে তিব্বতে আবার ফিরে আসতে পেরেছিল। সে দুজনের নাম, রিন্‌ছেন্ জন্ পো এবং লেগ্‌স্ পহি সেরাব্।

পাঁচ

তাঁরা দুজনে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে বুঝতে পারলেন যে, নালন্দার প্রধান অধ্যক্ষ দীপঙ্করের তুল্য পণ্ডিত ভারতে আর নেই। যেখানেই তাঁরা যান, সেইখানেই শোনেন, দীপঙ্কর হলেন সর্ব্বজ্ঞ।

তাঁরা মনে মনে স্থির করলেন, যেমন করেই হক্, দীপঙ্করকে তিব্বতে নিয়ে যেতে হবে।

নালন্দা মহাবিহারে এসে তাঁরা দীপঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর অপূর্ব্ব শ্রী এবং শান্ত বচন শুনে তাঁদের অন্তর বিমুগ্ধ হয়ে গেল। একদিন দীপঙ্করকে নিভৃতে পেয়ে তাঁরা তিব্বত-রাজ যশী হডের অন্তরের বাসনা জানিয়ে তাঁর পায়ের তলায় বিরাট এক তাল সোনা উপহার স্বরূপ রাখলেন। বল্লেন, ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর জন্যে তিব্বত-রাজ এই উপহার পাঠিয়েছেন। আপনি গ্রহণ করে আমাদের সকলকে ধন্য করুন। আপনাকে তিব্বতে নিয়ে যাবার জন্যেই এই নিদারুণ পথের কষ্ট সহ্য করে আমরা এখানে এসেছি। আপনি যদি তিব্বতে আসেন, তাহলে আপনার জন্যে রাজার স্বর্ণ-ভাণ্ডার খোলা থাকবে, প্রত্যেক তিব্বতবাসীর শ্রদ্ধা আপনি নিত্য অর্ঘ্যস্বরূপ পাবেন।

তাঁদের কথা শুনে হেসে দীপঙ্কর বল্লেন, তিব্বত-রাজের স্বর্ণ-ভাণ্ডারের দ্বার চিরকাল তিব্বত-বাসীদের জন্যে খোলা থাক ; এক রতি স্বর্ণেও আমার কোন প্রয়োজন নেই ! আর কোন লোকের শ্রদ্ধার অর্ঘ্যও আমি কামনা করি না ! এখন আমি নালন্দা ত্যাগ করে যেতে অক্ষম। এখানে আমার ঘাড়ে এখন প্রভূত দায়িত্ব।

তখন তাঁরা কেঁদে ফেল্লেন। বল্লেন, আমরা একুশ জন যাত্রা করেছিলাম। মাত্র দুজন অবশিষ্ট আছি। ঊনিশ জন এই উদ্দেশ্যে প্রাণ দিয়েছেন ! আপনি দয়া করুন !

তাঁহাদের সেই সকরুণ কাহিনী শুনে দীপঙ্কর তাঁদের আশ্বাস দিলেন। বল্লেন, ক্ষুব্ধ হয়ো না। সেই ঊনিশ জনের মৃত্যুকে ব্যর্থ মনে করো না। তবে একথা নিশ্চিত, এখন আমার তিব্বত যাওয়া সম্ভব নয়। তোমরা এই স্বর্ণ-উপহার নিয়ে তিব্বতে ফিরে যাও। তিব্বতরাজকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানিও।

অশ্রুতে দু'চোখ ভরে, যে-পথ দিয়ে আসতে ঊনিশ জন সঙ্গীকে তারা হারিয়েছিল, সেই পথ দিয়ে তারা আবার তিব্বতে ফিরে গেল।

ছয়

তাঁদের মুখে যশী হড্ সমস্ত কথা শুনলেন। দীপঙ্করের জ্ঞান-মহিমার কথা শুনে, মনে মনে তিনি বার বার সেই পণ্ডিতের উদ্দেশ্যে নতি জানালেন। কিন্তু যখনই ভাবেন যে, তিনি এলেন না, তখনই তাঁর অন্তর বিষণ্ন হয়ে পড়ে। তার সমস্ত অন্তর আকুল করে কান্না জেগে ওঠে, তিব্বতের সমস্ত স্বর্ণ দিয়েও তোমাকে পেলাম না। হে গুরু, আর কি চাও ? কবে তুমি আসবে ?

যশী হড্ অনেক ভেবে স্থির করলেন যে, দীপঙ্কর যদি না আসেন, তা হলে তাঁর পরেই যিনি পণ্ডিত আছেন, আপাততঃ তাঁকে আনতে হবে। এবং তিব্বত


দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

তাঁদের কথা শুনে হেসে দীপঙ্কর বল্লেন, তিব্বতরাজের স্বর্ণভাণ্ডারের দ্বার চিরকাল তিব্বত-বাসীদের জন্যে খোলা থাক ; এক রতি স্বর্ণেও আমার কোন প্রয়োজন নেই ! আর কোন লোকের শ্রদ্ধার অর্ঘ্যও আমি কামনা করি না ! এখন আমি নালন্দা ত্যাগ করে যেতে অক্ষম। এখানে আমার ঘাড়ে এখন প্রভূত দায়িত্ব।

তখন তাঁরা কেঁদে ফেল্লেন। বল্লেন, আমরা একুশ জন যাত্রা করেছিলাম। মাত্র দুজন অবশিষ্ট আছি। উনিশ জন এই উদ্দেশ্যে প্রাণ দিয়েছেন ! আপনি দয়া করুন !

তাঁহাদের সেই সকরুণ কাহিনী শুনে দীপঙ্কর তাঁদের আশ্বাস দিলেন। বল্লেন, ক্ষুব্ধ হয়ো না। সেই উনিশ জনের মৃত্যুকে ব্যর্থ মনে করো না। তবে একথা নিশ্চিত, এখন আমার তিব্বত যাওয়া সম্ভব নয়। তোমরা এই স্বর্ণ-উপহার নিয়ে তিব্বতে ফিরে যাও। তিব্বতরাজকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানিও।

অশ্রুতে দু'চোখ ভরে, যে-পথ দিয়ে আসতে উনিশ জন সঙ্গীকে তারা হারিয়েছিল, সেই পথ দিয়ে তারা আবার তিব্বতে ফিরে গেল।

ছয়

তাঁদের মুখে যশী হড্ সমস্ত কথা শুনলেন। দীপঙ্করের জ্ঞান-মহিমার কথা শুনে, মনে মনে তিনি বার বার সেই পণ্ডিতের উদ্দেশ্যে নতি জানালেন। কিন্তু যখনই ভাবেন যে, তিনি এলেন না, তখনই তাঁর অন্তর বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। তার সমস্ত অন্তর আকুল করে কান্না জেগে ওঠে, তিব্বতের সমস্ত স্বর্ণ দিয়েও তোমাকে পেলাম না। হে গুরু, আর কি চাও ? কবে তুমি আসবে ?

যশী হড্ অনেক ভেবে স্থির করলেন যে, দীপঙ্কর যদি না আসেন, তা হলে তাঁর পরেই যিনি পণ্ডিত আছেন, আপাততঃ তাঁকে আনতে হবে। এবং তিব্বত



থেকে ছাত্র পাঠিয়ে, তাদের ভারতবর্ষ থেকে সুপণ্ডিত করে আনতে হবে। তারাই পণ্ডিত হয়ে ফিরে এসে তিব্বতে নব-যুগের সূচনা করবে।

এই স্থির করে তিনি আবার একদল লোককে ভারতবর্ষে পাঠালেন। ইতিমধ্যে তিনি প্রচুর স্বর্ণ সংগ্রহ করবার পথ খুঁজতে লাগলেন। কারণ এই ব্যাপারে যে-পরিমাণ স্বর্ণের প্রয়োজন, তা তাঁর রাজ-ভাণ্ডারে নেই।

এই সময় তিনি সংবাদ পেলেন যে, নেপালের সীমান্তে একটী স্বর্ণ-খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। অল্প সংখ্যক লোক নিয়ে তিনি সেই স্বর্ণ-খনি দেখতে যাত্রা করলেন।

যেখানে স্বর্ণ-খনি আবিষ্কৃত হয়েছিল, তারই নিকটে ছিল, দুর্দ্ধর্ষ গারলঙ্-রাজের রাজত্ব। এই গারলঙ্-রা অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির লোক ছিল। বৌদ্ধদের তারা ঘৃণা করতো। বিশেষতঃ গারলঙ্ রাজের যশী হডের ওপর ভয়ানক আক্রোশ ছিল।

গারলঙ্-রাজ গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেলেন যে, তিব্বতরাজ যশী হড্ অতি অল্প সংখ্যক লোক নিয়ে তাঁরই রাজ্যের সীমান্তে এসেছেন।

কাল বিলম্ব না করে, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে গিয়ে, একদিন সহসা গারলঙ্-রাজ যশী হড এবং তাঁর অনুচরদের আক্রমণ করলো। হঠাৎ এই ভাবে আক্রান্ত হওয়ায় যশী হড্‌কে সহজেই পরাভব স্বীকার করতে হলো। গারলঙ্-রাজ যশী হড্‌কে বন্দী করে ঘোষণা করলো যে, হয় যশী হড্‌কে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ত্যাগ করে, তাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করতে হবে, নতুবা তাঁর দেহের সমান ওজনের স্বর্ণ দিতে হবে। নতুবা মৃত্যু!

এই সংবাদ তিব্বত-রাজ্যে গিয়ে পৌঁছলে, লোকে হাহাকার করে উঠলো। যশী হডের দুই ছেলে এবং একজন ভাইপো ছিলেন। তিনজনই যশী হড্‌কে দেবতা-জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। তাঁরা কাল-বিলম্ব না করে স্বর্ণ সংগ্রহ করতে লাগলেন।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রচুর স্বর্ণ-সংগ্রহ করে তাঁর ভাইপো চেন্ চাব্ গারলঙ্-রাজের কাছে উপস্থিত হলেন।

সমস্ত স্বর্ণ ওজন করে দেখা গেল, মাথার ওজনের পরিমাণ সোণা কম পড়ছে!

নিষ্ঠুর গারলঙ্-রাজ বল্লেন, কম সোণা নিয়ে তিনি যশী-হড্‌কে কিছুতেই মুক্তি দেবেন না।

চেন্ চাব্ বহু কাতর মিনতি জানালেন;—কিছু সময় পেলে তিনি আরও স্বর্ণ সংগ্রহ করে দেবেন। কিন্তু গারলঙ্-রাজ আর সময় দিতে চাইলেন না। হয়, যশী হড্‌কে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ত্যাগ করতে হবে, নতুবা কারাগারে মৃত্যুকে বরণ করতে হবে।

চেন্ চাব্ কারাগারে যশী হড়ের সঙ্গে দেখা করলেন। যশী হড়ের মুখে দুঃখের চিহ্ন নেই।

চেন্ চাবকে তিনি ছেলের চেয়েও ভালবাসতেন। তাঁকে সযত্নে তিনি স্বয়ং বৌদ্ধ-শাস্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। চেন্ চাবকে কাঁদতে দেখে, যশী হড্ বল্লেন, তুমি অকারণে বিষণ্ণ হচ্ছ। তুমি পণ্ডিত। মৃত্যুতে কাতর হওয়া তোমার শোভা পায় না। অকারণে এত স্বর্ণ কেন খরচ করবে? এই স্বর্ণ থাকলে, ভারতবর্ষ থেকে বহু পণ্ডিতকে আনা সম্ভব হবে। আমার জন্যে দুঃখিত হয়োনা। এ আমার পরম সৌভাগ্য যে, ধর্ম্মের জন্যে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করতে পারলাম। তবে একটা মিনতি তোমাকে জানিয়ে যাই, তুমি যেমন করে হক্, দীপঙ্করের কাছে এই সংবাদ পাঠাবে, তিব্বতের সমস্ত স্বর্ণ দিয়ে নয়, জীবন সমর্পণ করে জ্ঞান-ভিক্ষু যশী হড্ এই অন্তিম মিনতি তাঁর কাছে জানিয়ে গিয়েছেন, যেন তিনি একবার তিব্বতে আসেন। এই আমার অন্তিম বাসনা।

চেন্ চাব্ বিদায় নিয়ে যশী হড়ের মুক্তি-মূল্যের জন্য আরও স্বর্ণ সংগ্রহ

করতে লাগলেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই শুনলেন যে, কারাগারে তিনি দেহত্যাগ করেছেন।

সাত

চেন্ চাব্ যশী হডের অন্তিম-বাসনাকে সফল করবার জন্যে জীবন-উৎসর্গ করলেন। আরও দু'বার দীপঙ্করের কাছে লোক পাঠান হয়েছিল—তিনি প্রত্যেক বারই অক্ষমতা জ্ঞাপন করে সেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

চেন্ চাব্ বহু অনুসন্ধান করে বিনয়ধর নামে এক তিব্বতী পণ্ডিতকে আবার পাঠালেন। বিনয়ধর ভারতীয় ভাষাও আয়ত্ত করেছিলেন।

পাঁচজন লোক নিয়ে বিনয়ধর হিমালয় পার হলেন।



"মৃত্যুতে কাতর হওয়া তোমার শোভা পায় না।"

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

আট

নালন্দার দ্বারদেশে আবার তিব্বতের লোক এসে করাঘাত করলো।

দ্বারী দ্বার খুলে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

—আমরা তিব্বত থেকে আসছি!

—কি প্রয়োজন আপনাদের?

—আমরা মহাজ্ঞানী দীপঙ্করকে তিব্বতে নিয়ে যেতে চাই!

বৃদ্ধ দ্বার-রক্ষক তাঁদের সাদর সম্ভাষণ করে বিহারের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বল্লেন, তোমরা বড়ই সরল। এইভাবে তোমাদের উদ্দেশ্যের কথা যদি প্রচার কর, তা হলে তোমাদের ওপর এখানকার সকলেই অসন্তুষ্ট হবে। দীপঙ্করকে কেউই ছেড়ে দেবে না। তা ছাড়া তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। তোমাদের একটা পরামর্শ দিচ্ছি, শোন! এই বিহারে গ্য-চ্যন্ বলে একজন তিব্বতীয় আছেন। তোমরা এখন তাঁর কাছেই থাক। দীপঙ্কর ছাড়া কারুর কাছে তোমাদের উদ্দেশ্যের কথা জানিও না।

এই বলে দ্বারী তাঁদের গ্য-চ্যনের কাছে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। নিজের দেশের লোকদের দেখে গ্য-চ্যন্‌ও উল্লসিত হয়ে উঠলেন। বিনয়ধর দীপঙ্করের সাক্ষাৎ লাভের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একদিন ঊষাকালে বিনয়ধর দেখেন, বিহারের বাহিরে বহু ভিক্ষুক অন্নের জন্য সমবেত হয়েছে। একধারে দাঁড়িয়ে তিনি সেই দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

কিছুকাল পরে দেখেন, এক দিব্য-মূর্ত্তি বৃদ্ধ এসে সেই জনতার সামনে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখবা মাত্রই জনতা সমস্বরে চীৎকার করে উঠলো, ভাল হো, নাথ অতীশ, ভাত ওনা, ভাত ওনা! (তোমার জয় হ'ক, প্রভু অতীশ, আমাদের ভাত দাও)।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

তৎক্ষণাৎ বিনয়ধর বুঝলেন, ইনিই সেই মহাপুরুষ, যাঁর সন্ধানে বারে বারে তিব্বত থেকে লোক এসে ফিরে গিয়েছে।

বিনয়ধর তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে একধারে সেই অন্ন বিতরণ দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

একদিন প্রভু অতীশকে নিভৃতে পেয়ে বিনয়ধর তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে প্রণাম করলেন।

বৃদ্ধ দীপঙ্কর জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কে ভিক্ষু?

বিনয়ধর বল্লেন, আমি ভিক্ষু নই, আমি ভিক্ষুক! আমি এসেছি তিব্বত থেকে! সমগ্র তিব্বত অন্ন চায়। সে অন্ন থেকে হত-ভাগ্য তিব্বতবাসীদের বঞ্চিত করা প্রভু অতীশের শোভা পায় না।

বরাবর তিব্বত থেকে লোক এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছে। সমস্ত কথা দীপঙ্করের মনে পড়ল। তিনি তখন ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ব্যস্ত।



বৃদ্ধ দীপঙ্কর বল্লেন, বেশ আমি যাব তিব্বতে।

কিন্তু আজ যদিও তাঁর কর্ম্ম-ভার লঘু হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আজ তিনি বৃদ্ধ, অশীতিপর!

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দীপঙ্করের চরণ স্পর্শ করে, বিনয়ধর বল্লেন, আমি এক মৃত ব্যক্তির অন্তিম বাসনার বাহক হয়ে আপনার কাছে এসেছি। তিনি হলেন আমাদের রাজা যশীহড্। শত্রু-কারাগারে মৃত্যু-কালে তিনি আপনার কাছেই তাঁর অন্তরের অন্তিম বাসনা জানিয়ে গিয়েছেন।

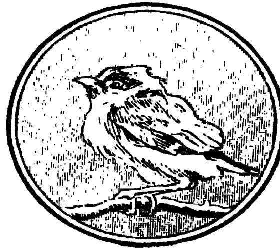
তখন বিনয়ধর যশী হড়ের অপূর্ব্ব মৃত্যুর কথা সমস্ত বল্লেন। যশী হড়ের সেই অপূর্ব্ব ত্যাগের কথা শুনে বৃদ্ধের অন্তর দুলে উঠলো। মৃত্যু দিয়ে লেখা এ আহ্বান-লিপি কি প্রত্যাখ্যান করা যায়?

বৃদ্ধ দীপঙ্কর বল্লেন, বেশ আমি যাব তিব্বতে। যশী হড়ের অন্তিম-বাসনা আমি সফল করবো। কিন্তু এ সংবাদ তুমি কাউকেই জানাবে না। তা হলে, আমাকে কেউ যেতে দেবে না। আমরা গোপনে পালিয়ে যাব!

তারপর একদিন নিশা-যোগে গোপনে ভারতের জ্ঞান-বৃদ্ধ তিব্বতের দিকে যাত্রা করলেন।

লোকে বলে, তিনি ছিলেন জ্ঞানের সূর্য্য। তাঁর অভাবে, হিমালয়ের এপারে ক্রমশঃ অন্ধকার নেমে এলো! তাঁকে পেয়ে হিমালয়ের ওপারে নতুন সূর্য্য জেগে উঠলো! তিব্বত থেকে আর তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন নি!

আজ পর্য্যন্ত সমগ্র বৌদ্ধ-জগৎ তাঁর নাম স্মরণে নত-মস্তকে বলে, নমো অতীশ, নমো জোভো জী, নমো প্রভু স্বামী।





—শিশু-নাটিকা-

শ্রী সুখলতা রাও

—পরিচয়-

বালক—

- বীর
- মিত্র
- কটু
- পটু

বালিকা—

- শান্তা
- সুনন্দা
- মানিনী
- পরিচারিকারা

—ছেলের দল—

আজবপুর

শ্রীমতী সুখলতা রাও

এক

[আজব-পুরের বাগানে আজব-ফুল, আজব পাখী ; ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছে ।]

বীর, মিত্র, কটু, পটু, শান্তা, সুনন্দা ও মানিনী ।

মিত্র । আমাদের দেশের মত এমন দেশ কি আর আছে ?

বীর । এই আকাশে ছড়ান কত কত দেশ, তার মধ্যে কোথায় কি আছে তা'ত দেখিনি, কেমন ক'রে বল্‌ব ? আমার ইচ্ছা হয় ঐ সব দেশের একটাতে ঘুরে আসি ।



সুনন্দা । হ্যাঁ ভাই, বেশ হয় তাহ'লে । দু চার দিন সেখানে খেলা ক'রে আবার কিন্তু ফিরে আস্‌তে চাই ।

মানিনী । আমাকে যদি কোন দেশে রাণী ক'রে রেখে দেয় ত আমি আর ফিরে আসি না ।

শান্তা । আমাদের দেশেই রাণী হওনা কেন ? এস তোমাকে ফুল দিয়ে রাণীর মত সাজিয়ে দি ।

কটু । হুঁঃ, রাণী না আরো কিছু । যা চেহারার ছিরি ।

মানিনী। বেশ, তোমার তাতে কি ?

মিত্র। আহা হা, ঝগড়া কর কেন ? এখন কাজের কথা শোন। সবাই মিলে একবার ঐ সবুজ নীল দেশটাতে, যেটাকে পৃথিবী বলে, সেখানে যাই, কি বল ?

বীর। ঠিক্ ঠিক্, কিন্তু বেশী দিন থাক্‌ব না।

পটু। না। আমাদের রাজা বলেছেন, এ দেশ ছেড়ে আর কোথাও গিয়ে বেশী দিন থাকলে বিপদ হবে।

শান্তা। পৃথিবীটা কেমন ?

কটু। গেলেই দেখতে পাবে।

বীর। এখান থেকে দেখা যায় নীল সবুজ ঠাণ্ডা, দিনের বেলা সূর্য্যের আলো পড়ে, রাত্রে জ্যোৎস্না পড়ে।

সুনন্দা। ভারি সুন্দর।

মিত্র। তবে আর দেরী কেন ? চল যাই।

সকলে। চল, চল, চল। [প্রস্থান]

দুই

[পৃথিবীর বাগান, আজবপুরের বালক-বালিকারা।]

বী। এখানের মত এমন ফুল এমন ফল আমাদের দেশেও বুঝি নেই।

মি। সুন্দর বটে।

ক। কিন্তু এখানের লোকজন কি রকম কে জানে, কাউকে ত দেখা যাচ্ছে না। মানিনীর রাণী হওয়ার আশা নেই, সে গুড়ে বালি।

মা। (এক ছড়া মণি মুক্তার মালা তুলিয়া ধরিয়া) আগে দেখ, তারপর ব'ল।

শা। ও কি ? ও কি ?

সু। দেখি দেখি ; কোথায় পেলে ?

মা। ঐ গাছের নীচে পড়েছিল।

প। বাঃ, এরকম ত কখনও দেখিনি !

বী। সত্যিই ত, কী আশ্চর্য্য জিনিষ ! ঠিক যেন চাঁদের আলো, সূর্য্যের আলো, আকাশের নীল জমাট বেঁধে, গেছে।

ক। কার টা না ব'লে নিয়ে এসেছ, ফিরিয়ে দাও।

মা। আমি পেয়েছি, আমার জিনিষ। রাণী হ'লাম ব'লে, আর কি। ঐ দূরে একটা বাড়ী দেখা যাচ্ছে ; ওখানে নিশ্চয় আরও অনেক কিছু আছে ; যাই, দেখে আসি।



"আগে দেখ তারপর ব'ল।"

শা। বেশী দেরী ক'র না, শিগ্‌গীর ফিরে এসো। [মানিনীর প্রস্থান]

প। বাড়ীটার গায়ে কত কাজ করেছে, এখানের লোকের বাহাদুরী আছে।

বী। ঐ শোন।

আজবপুর

শ্রীমতী সুখলতা রাও

[ধোপা নাপিত প্রভৃতি প্রথম দলের ছেলেদের প্রবেশ ও গান।]

—গান—

[সুর—'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি।]

ধোপা, নাপিত, চাষা, তাঁতী, মিস্ত্রী আর রাখাল,
এস এস ভাই।
কাজের ছেলের পাল কোথা গো, কাজের ছেলের পাল,
এস এস ভাই।
কাজ আমাদের দানা পানি,
কাজ আমাদের জীবন জানি,
কাজের গুণে ঘরে আনি
দুটো মুঠো চাল।
এস এস ভাই। [প্রস্থান।]

[বীর ও পটু তাহাদের পিছু পিছু চলিয়া গেল।]

[গান করিতে করিতে দ্বিতীয় দলের প্রবেশ।]

[সুর—ঐ ; দুই দলের তাল যেন কাটিয়া না যায়।]

বড় লোকের ঘরে টাকা, তাইতে খেটে খায়,
না যদি দেয় দেখ্‌ব তবে কেমন ক'রে পায়।
উঁচু কুলে জন্ম পেয়ে,
আমরা বড় ওদের চেয়ে ;
ওরা বাঁচে মোদের খেয়ে ;
যেমন যার কপাল।
আমরা বড়, ভাই।

[প্রস্থান, কটুও সঙ্গে চলিল।]

মি। কেমন কেমন ঠেক্‌ছে যে। এ দেশের চাল চলন বড় সুবিধার মনে হচ্ছে না।

সু। তাইত দেখ্‌ছি।

শা। মানিনী ত এখনও এল না?

মি। এরাই বা কখন ফিরবে কে জানে? আমরা দেরী করতে পারব না, না ফেরে ত আমরা তিনজন দেশে যাব।

শা। ওদের ফেলে রেখে যাব?

মি। আমাদের দোষ কি বল? থাকলে আমাদেরও বিপদ।

সু। কিন্তু এদের গানের কথাগুলো শুন্‌লে?

মি। হ্যাঁ। মানুষ ছোট বড় কি দিয়ে হয়? কেউ যদি গরীব হয়, বা শরীরকে খাটিয়ে খায়, তাতে তার মনটা ছোট হয়ে যায় না ত। যে জ্ঞানে বড়, যার মন বড়, সেই বড়; যার মন ছোট, সেই ছোট। ওরা আর আসবে না; চল যাই। দুদিন বাদে আবার এসে খোঁজ নেব।

সু। তখন কি ওরা আমাদের চিন্‌তে পারবে? হয়ত এদের সঙ্গে মিশে এদের মত হ'য়ে যাবে।

শা। কি জানি।

[সকলের প্রস্থান।]

তিন

[কিছুদিন পরে। পৃথিবীতে।]

[বীর ও পটু কয়েকটি ছেলের সঙ্গে গুলি নিয়ে খেলা করিতেছে। জল নিয়া পরিচারিকাদের প্রবেশ, রাণীর প্রবেশ।]

১মা পরিচারিকা। ছেলেগুলো আর খেলবার যায়গা পায় না। সর্ সর্, ছোঁয়া লাগ্‌লে জল নষ্ট হবে।

আজবপুর

শ্রীমতী সুখলতা রাও

[পটুর হাতের গুলি দ্বিতীয়ার গায়ে লাগিল ।]

২য়া পরিচারিকা । এই খেলে যা ! এখুনি নেয়ে এলাম, আবার নাইতে হবে । যত সব দুষ্টু-বুদ্ধির দল । দূর—দূর ।



"সর্ সর্..."

১মা প । কথা শোনেনা দেখ, পালা বল্‌ছি । ঐ রাণীমা আসছেন ।

পটু । কোথাকার রাণী তোমাদের ?

১মা প । মানপুরের রাণী, নাম মানিনী ।

[মানিনীর প্রবেশ]

ছেলেদের পলায়ন

মানিনী । এ পথে ওদের যাওয়া আসা বন্ধ করতে হবে, নইলে মান মর্য্যাদা আর থাকবে না, ছোট বড়তে তফাৎ থাকবে না ।

[প্রস্থান]

[বাইরে কাদের কথা শোনা গেল]

মিত্র, শান্তা ও সুনন্দা । ছোট বড়তে তফাৎ থাকবে না ।

[বলিতে বলিতে প্রবেশ]

সু । এক মানিনী ছাড়া তাদের আর কাউকে দেখতে পেলাম না । সে যে রকম

বদলিয়ে গেছে, তাতে অন্য সবাই কেমন হয়েছে ভাবতে ভয় করে। চল মানিনীর বাড়ী—

মি। চুপ্, চুপ্, ঐ কারা আস্‌ছে। এস লুকিয়ে পড়ি।

[ঝোপের আড়ালে লুকান।]

[পড়ুয়াদের প্রবেশ, সঙ্গে কটু]

শা। ঐ ত কটু।

[নীচু গলায়]

মি। চুপ্।

ক। শুন্‌ছি ছোট লোকের ছেলেদের জন্য অনেক খরচ ক'রে ইস্কুল করা হচ্ছে। ওদের এত লেখা পড়ায় দরকার কি? ওরা কি বেদ পুরাণ পড়বে? এই দেখ বলতে বলতেই এসে হাজির।

[বই হাতে পটু ও বীরের প্রবেশ। তাড়াতাড়ি যাইতে গিয়া কটুর সঙ্গে পটুর ধাক্কা লাগা।]



ক। কী—এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর, আমাদের গায়ের উপর এসে পড়িস?

[লাঠির ঘা।]

বী। ইচ্ছা ক'রে ত পড়েনি, মার কেন ?

ক। চোখে পথ দেখতে পায় না ? ভাগ্যি এখনও স্নান করিনি, নইলে মেরে সিধে ক'রে দিতাম।

১ম পড়ুয়া। লেখাপড়া শিখে ওঁরা মনে করেছেন আমাদের সমান হয়েছেন। দুদিন পরে বলবেন 'আমরা ঠাকুর পূজো দেব।'

বী। ঠাকুর কি কেবল তোমাদেরি, আমাদের নয় ?

২য় পড়ুয়া। হাঃ হা, হাসালে।

[পড়ুয়াদের প্রস্থান।]

পটু। ভাই মিথ্যে ওদের সঙ্গে কথা বলা। আমরা কপাল দোষে যখন ছোট হয়েই জন্মেছি, তখন স'য়ে থাকতে হবে।

বী। ওঁরা বড়, আমরা ছোট ; কিন্তু কিসে ? আমাদেরও হাত পা শরীর আছে। আমাদের ভিতরেও কত বড় লোক, ভাল লোক আছে—

[মিত্র, সুনন্দা ও শান্তা বাহির হইয়া আসিল]

মি। আমাদের একটু জল দিতে পার ? বড় জল তেষ্টা পেয়েছে।

বী। তোমরা কোথা থেকে আস্‌ছ ?

মি। অনেক দূর থেকে।

বী। কি জাত তোমরা ? আমাদের হাতের জল খাবে ত ? আমরা তাঁতী।

মি, সু, শা। আমরা তোমাদেরি জাত, জল দাও।

বী। সঙ্গে এস। [প্রস্থান]

চার

[সভাঘর। রাণীর নিমন্ত্রিত কটু ও দু চারজন। পটু ও বীরের হাত ধরিয়া মিত্রের প্রবেশ। শান্তা ও সুনন্দার প্রবেশ।]

ক। কে হে ? এখানে কেন ?

আজবপুর

শ্রীমতী সুখলতা রাও

বী। আজ আমাদের এখানে নেমন্তন্ন।

ক। কি জাত তোমরা? ঘরের বাইরে দাঁড়াও

মি। আমরা তোমাদেরি জাত।

ক। তবে ঐ ছোটলোক-দের হাত ধরেছ কেন? ওরা জাতে তাঁতী তা জান?

মি। ঐ তাঁতী আর আমি একই জাত।

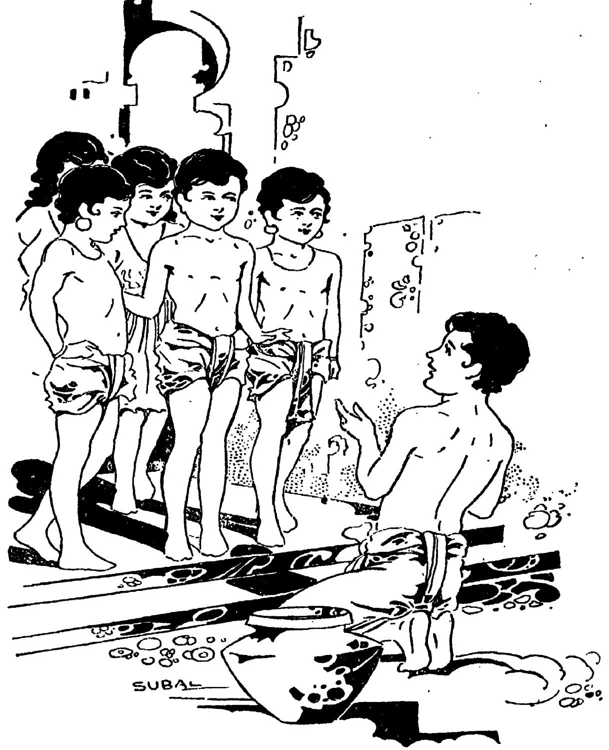
ক। এই যে বল্লে তুমি আমাদের জাত?

মি। হ্যাঁ, তাও বটে।

ক। এ কি ঠাট্টা পেয়েছ?

মি। ঠাট্টা না ভাই কটু, চিন্‌তে পারছ না?

[কটু চম্‌কাইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল]



[কটু বসিয়া পড়িল]

মি। আমি মিত্র, এই বীর, পটু, শান্তা, সুনন্দা। আমাদের ভুলে গেলে?

বী। তাইত। এতদিন কি ক'রে ভুলেছিলাম?

প। নিজেকে কি ক'রে ছোট ক'রে ছিলাম?

ক। বীর, পটু, ক্ষমা কর। কত ঘৃণা করেছি তোমাদের, মেরেছি পর্য্যন্ত।

[মানিনীর প্রবেশ]

ক, প, বী। এই যে রাণী আসছেন।

মা। রাণী নয়, মানিনী। তোমাদেরি একজন। [সকলের গান

গান

[সুর—চল্ রে চল্ সবে ভারত সন্তান]

চল চল সবে ঘরে ফিরে যাই।
ছাই দেশেতে রহিতে না চাই।
মিথ্যা দর্পে জাতির গর্ব্বে
মানুষে মানুষ ছোট করে ভাই।
চলার পথে সবাই স্বাধীন,
বাধা কিছু নাই।
চল চল ঘরে ফিরে চল,
ছোট বড় সেথা ভুলি ভাই।
(সবে ঘরে ফিরে যাই)





শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বড় বাজারে মসলা পোস্তায় দুপুরের বাজার সবে আরম্ভ হয়েছে। হাজারি বিশ্বাস প্রকাণ্ড ভুঁড়িটী নিয়ে দিব্যি আরামে তার মসলার দোকানে বসে' আছে। বাজার একটু মন্দা। অনেক দোকানেই বেচাকেনা একেবারে নাই বললেই চলে তবে বিদেশী খদ্দেরের ভিড় একটু বেশী। হাজারির দোকানে লোকজন অপেক্ষাকৃত কম। ডান হাতে তালপাতার পাখার বাতাস টানতে টানতে হাজারি ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে সাম্‌নের দিকে ঝুকে পড়ছিল, এমন সময়ে হঠাৎ কার পরিচিত গলার স্বর শুনে সে চমকে উঠল।

—"বলি, ও বিশ্বেস—বিশ্বেস মশাই—" বার দুই হাঁক ছেড়ে যতীন ভদ্র তার ডান হাতের লাঠিটি একটী কোণে রেখে দিয়ে সম্মুখের খালি টুলটার উপর ধপাস্ করে' বসল।

যতীন হাজারি বিশ্বাসের সমবয়স্ক—অনেক দিনের বন্ধু। ভাগ্যলক্ষ্মী এতকাল তার উপর অপ্রসন্ন ছিল। হালে সে হাজারির পরামর্শে মসলার বাজারে দালালী আরম্ভ করেছে। দু'পয়সা পাচ্ছেও সে। যতীনের মোটা-গলার কড়া আওয়াজ পেয়ে হাজারি খুব আগ্রহান্বিত হয়ে উঠে বসল। হাজারি বিলক্ষণ জানত যে, যতীন যখনই আসে, কোন একটা দাঁও বিষয়ে পাকাপাকি খবর না নিয়ে সে আসে না। তাই সে যতীনকে খুবই খাতির করে।

মসলা ভূত

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

যতীন বল্‌লে—"দেখ, শুধু, দোকানদার হ'য়ে খদ্দেরের আশায় রাস্তার দিকে হাঁ করে বসে থাকলে তা'তে আর টাকা আসে না—ঘুমই আসে। পাঁচটা খবরাখবর রাখতে হয়, বুঝলে?

হাজারি বল্‌লে—"এসো, এসো, যতীন। ভাল আছো? অনেক দিন দেখিনি। কিছু খবর আছে নাকি?



—"সেই খবর দিতেই তো আসা। এ বাজারে শুধু গণেশের পা'য়ে মাথা ঠুকলেই টাকা করা যায় না। অনেক হদিস্ জানতে হয়—অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবে টাকা; বুঝলে? এখন কি দেবে বল। জানই ত যতীনচন্দ্র বকে একটু বেশী কিন্তু খবর যা আনে তা একদম পাকা। যাক্, এখন আসল কথা তোমায় যা বলি বেশ মন দিয়ে শোন।—"

যতীন অতঃপর হাজারিকে কাছে বসিয়ে চুপি চুপি তার কথাটী বলে গেল।

মসলা ভূত

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

যতীনের কথায় টাকার গন্ধ পেয়ে হাজারি কাণ খাড়া করে' এমনি একাগ্র ভাবে শুনে যেতে লাগল যে, সত্যনারায়ণের পাঁচালীও লোকে অতটা মন দিয়ে শোনে না।

ব্যাপারটী এই। গ্রেহাম্ ট্রেডিং কোম্পানীর একটা মস্ত মাল-জাহাজ—এস্, এস্, রেঙ্গুন,—ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিসের কোন এক বন্দর থেকে প্রচুর মাল নিয়ে কল্‌কাতায় আসছিল। যত রকম মাল বোঝাই ছিল তার মধ্যে মসলার বস্তাই সব চেয়ে বেশী। লঙ্কা, হলুদ, জীরে, তেজপাতা প্রভৃতি কত রকমের মসলা। প্রতি বস্তাটী ওজনে আড়াই মণের কম নয়। এরকম শত শত বস্তার গাদায় জাহাজখানা আগাগোড়া ঠাসা।

সেই মাল-জাহাজখানি গঙ্গার ভিতর ঢুকতেই ঘন কুয়াসার মধ্যে শেষ রাত্রির ভাটার মুখে গঙ্গার চোরাবালির চড়ায় ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায়। জাহাজ যখন সবে ডায়মণ্ড্ হারবার পেরিয়ে গঙ্গায় এসেছে তখন এই ব্যাপার। সারেঙ্গ শত চেষ্টা করেও কিছুতে সামাল দিতে পারল না। জাহাজ-ডুবির সঙ্গে কতক লোকও জলে ডুবে মারা যায়। জাহাজের কতক মাল নষ্ট হয়ে যায় আর বাদবাকী মাল সব গঙ্গার জলে ভাসতে থাকে। মসলার বস্তাগুলি প্রায়ই ডোবে নি—বিশেষ ক্ষতিও হয় নি। দূর থেকে ঐ মসলা বস্তার গাদাগুলো ভেসে যেতে দেখে পোর্ট কমিশনারের লোকেরা সে সব তুলে পারে টেনে নেয়। কাল সকাল সাড়ে আটটার সময়ে নীলাম ডেকে সেই বস্তাবন্দি মসলাগুলো বিক্রি করা হবে।

ধড়িবাজ হাজারি বিশ্বাস যতীনের কথাবার্ত্তা শুনে চট্ করে সব বুঝে নিলে। কত লোককে চড়িয়ে কত পাকা ধানে মই দিয়ে তবে সে আজ এত টাকার মালিক। কথাবার্ত্তা সব তখনি ঠিক হ'য়ে গেল। যাবার সময়ে যতীন আবার হাজারিকে বেশ ক'রে মনে করিয়ে দিয়ে বললে—"দেখো ভায়া!

টাকা যদি পিটতে চাও তবে এ সুযোগ কিছুতেই ছাড়া নয়। জলের দামে জাহাজ ডুবির লাটের মাল বিকিয়ে যাচ্ছে। কাল সকাল সাড়ে আটটায় নীলাম। আমি সাতটার সময়েই এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।"

পরদিন হাজারি যতীনকে নিয়ে যথা সময়ে খিদিরপুরের দিকে রওনা হয়ে গেল। নীলামের জায়গায় পৌঁছতে আর বেশী দেরী নেই—দূর হ'তে কলরব শোনা যাচ্ছে। যতীন আগে আগে চলছে—হাজারি পিছনে পিছনে ছুটছে। এতবড় সস্তার কিস্তিটা ফস্কে না যায়। হাজারি যতীনকে বরাবর নীলামের কাছে বস্তাগুলো গুণতি করতে পাঠিয়ে দিয়েই নিজে সটান এক দৌড়ে সাহেবের কাছে গিয়ে মস্ত বড় এক সেলাম করলে। সাহেবের সঙ্গে দুমিনিট ফিস্‌ফাস করে কি কথাবার্ত্তা বলে হাজারি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে নীলামের ডাক বন্ধ করে দিলে।

যতীন বললে—"কি খবর ভায়া—সুবিধা করতে পেরেছ ত ?"

হাজারি খুব ব্যস্তসমস্তভাবে বললে—"পরে বলব। কাজ হাসিল্! এখন কত বস্তা গুণলে বল দেখি।"

—"একশো' বস্তা গোণা হয়ে গেছে।"

বাস্তবিক, উচু উচু গাদা করা মসলা বস্তাগুলোর দিকে চেয়ে হাজারির চোখ জুড়িয়ে গেল। সে যেদিকেই তাকায়, দেখে যে অগণিত বস্তা সারবন্দি থামের মত রাস্তা জুড়ে' দাঁড়িয়ে আছে। উঃ এমন দাঁও জীবনে কারো ভাগ্যে একবার বই দুবার আসে না! এখন মসলা পোস্তায় কোনরূপে তার গুদোমে হাজারি এগুলো চালান দিতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

"আর দেরী নয়"—হাজারি যতীনকে তাড়া দিয়ে ডেকে বললে,—"ওহে ভায়া, শুভ কার্য্যে আর বিলম্ব কেন। এখন লরি ডেকে তাড়াতাড়ি মাল বোঝাই করে' পোস্তায় চালান দিয়ে দাও। আমি ততক্ষণ এগিয়ে যাই।"

মসলা ভূত

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

একবারে সব মাল লরীতে ধরল না। দ্বিতীয় ক্ষেপ বস্তা চাপিয়ে দিয়ে যতীন যখন পোস্তায় ফিরে গেল তখনও বিকেল আছে। সে এসে দেখে, সবই অব্যবস্থা। রাশীকৃত বস্তার গাদা হাজারির দোকানের গোড়ায় ফুটপাতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মাত্র তিনটী লোক এতগুলো মাল তুলবার জন্য লাগান হয়েছে। চতুর্দ্দিকে লোকের মহা ভিড়—হৈ হৈ ব্যাপার। এদিকে পুলিশ তাড়া দিচ্ছে—"জলদি মাল হাটাও।" হাজারি কেবল চেঁচাচ্ছে। সে যেন কিছুই গুছ্ গাছ্ করে উঠতে পাচ্ছে না।

কাণ্ডকারখানা দেখে যতীন নিজেই কোমর বেঁধে লেগে গেল। প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সব মাল তোলা হয়ে গেল। বস্তাগুলো পাশাপাশি সাজিয়ে দেখা গেল ঘরে আর কুলোয় না। তখন বস্তার উপর বস্তা চাপিয়ে দিয়ে কড়িকাঠ পর্য্যন্ত মাল ঠাসা হ'ল। গম্বুজের মত এক একটা ফুলো ফুলো বস্তা আর বস্তাগুলো উঁচুও কি কম। এই ভাবে বস্তা ভরাট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যতীন আর হাজারি যখন বাড়ী ফিরল তখন রাত্র দশটা। সে রাত্রি গুদোমে তালা লাগিয়ে দিয়ে প্রতিদিনের মত হাজারির চাকর বাইরে শু'য়ে রইল।

শেষরাত্রে মসলার গুদোমে কি একটা শব্দ শুনতে পেয়ে আশে পাশে দোকানদারদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তারা চোরের আশঙ্কা করে চাকরটাকে ডেকে তুললে। চাকরটা শশব্যস্ত হয়ে আলো জ্বালিয়ে বেশ পরখ ক'রে এদিক ওদিক দেখতে লাগলো। কিন্তু চোর ঘরে ঢুকল কি ক'রে। গুদোমের দরজার তালা বন্ধ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। খানিক বাদে "দুম্ দুম্" শব্দ! সকলে কাণ খাড়া ক'রে রইল। বেশ মনে হ'ল এবারকার শব্দটা যেন হাজারির মসলার গুদোমের ভেতর থেকেই আসছে। অথচ ঘরের দোর জানালা বন্ধ—বার থেকে মোটা তালা দেওয়া। কি আশ্চর্য্য চোর ভেতরে যাবেই বা কি করে! আর চোরই

যদি না এল তবে শব্দও বা করে কে? মাঝে মাঝে মনে হতে লাগল, ঘরের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসবার জন্য কারা' যেন ভেতর দরজায় ধাক্কা মারছে। শেষ রাতের বাকী সময়টা এই ভাবে শব্দ শুনেই কেটে গেল। আরও আশ্চর্য্য, রাত ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে গুদোম ঘর থেকে শব্দও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল! সে রাত্রি এই পর্য্যন্ত।

পরদিন সকালে মসলাপট্টির দোকানদারদের মুখে মুখে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, হাজারির দোকানে বিষম কাণ্ড—ভীষণ চুরি! আসলে সত্য যা নয় তার দশ গুণ বাড়িয়ে দিয়ে মিথ্যা রটতে লাগল। ক্রমে কথাটা হাজারির কাণে উঠলো। হাজারি বিশ্বাস খবর পাওয়া মাত্র দৌড়ে এসে' তালা খুলে গুদোমে ঢুকে দেখে যে, বস্তাগুলো ঠিকই আছে একটী মালও বেহাত হয়নি'। কি ব্যাপার? তখন সে ভাবলে, কিছু নয়; তার মসলা বস্তাগুলো দেখে যাদের চোখ টাটিয়েছিল—এ নিশ্চয়ই সেই বদমায়েসদের মিথ্যে কারসাজি। তারাই মজা দেখবার জন্যে চুরির গুজব রটিয়েছে।

কিন্তু হ'রে চাকরটাও যে বললে, ভীষণ শব্দ শোনা যাচ্ছিল! এই শব্দরহস্যটা হাজারি কিছুতেই কিনারা করতে পারলনা। চোর যদি এসেই থাকবে তবে কিছু নিলেও না উপরন্তু শব্দ ক'রে জানান দিয়ে চলে গেল—একি ব্যাপার! তবে কি তাকে ভয় দেখাবার জন্যেই রাত্রিবেলা দুর্ব্বৃত্তেরা এই সব আয়োজন করেছে? সাত পাঁচ ভেবে হাজারি সেদিনকার মত কথাটা চেপে গেল। ভাবলে, আজ রাতে আর বাড়ী না গিয়ে নিজেই দোকান পাহারা দেবে। করলও তাই।

রাত্রে ঘুমোবার আগে হাজারি আজ বেশ করে চাকরটাকে নিয়ে গুদোমের উপর থেকে আরম্ভ করে নীচু পর্য্যন্ত পাতি পাতি প্রত্যেকটী বস্তার গাদা দেখতে লাগল। তারপর ভেতর থেকে জানালাটা খুলে রেখে ঘরে তালা লাগিয়ে

দিলে। তবে, আজ একটা নয়—হব্‌সের চার লিভারের দুটো মস্ত ভারী তালা।

হাজারি চাকরটাকে নিয়ে ঘরের সাম্নে শুয়ে নানা কথাবার্ত্তার পর যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন রাত দুপুর। শেষ রাত্রের দিকে কি একটা শব্দ হ'তেই হাজারির ঘুম ভেঙে গেল। হ'রে চাকরটা আগেই একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিল। গত রাত্রের ব্যাপারও তার বেশ মনে আছে। তাই সে আজ নিজে আর কোন কথা না বলে চুপ করেই পড়েছিল। কিন্তু খানিক বাদেই ও আবার কিসের শব্দ! ধপাস্—ধপাস্—ধুপ্—দুম্—দুম—দাম্—। ঘরের ভেতর বস্তায় বস্তায় কি বিষম ধস্তাধস্তি। যেন দৈত্যদানবে লড়াই বেঁধেছে।

হ'রে আর হাজারি তখন ধড়ফড় ক'রে এক লাফে বিছানা ছেড়ে আলো জ্বালিয়ে দেখতে লাগলো তালা ঠিক আছে কি না। তালা দুটো ঠিকই আছে। হাজারি জানালার ফাঁকে চোখ তাকিয়ে দেখতে পেলো—দুটো প্রকাণ্ড বস্তা ঘরের ভেতর থেকে দরজায় ঢুঁ মারছে। ভয়ে হাজারির চোখ দুটো ডাগর হ'য়ে উঠল। বস্তা জীবন্ত হয়ে উঠল না কি? না সে চোখে ভুল দেখছে! না অনিদ্রা আর দুর্ভাবনায় তার মাথার ঠিক নেই! হাজারি ভয়ে ভয়ে খানিকটা চোখ বুজে রইল।

হাজারির চোখ যখন খুলল তখন ভোরের আলো জানালার গরাদ দিয়ে ঘরে স্পষ্ট দেখা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শব্দটব্দও সব থেমে গেছে।

হ'রে অমনি বলে উঠল—"বাবু সেদিনও দেখেছি—ভোর হ'তেই শব্দ থেমে যায়।"

হাজারি আর দ্বিরুক্তি না ক'রে তালা খুলে ঘরে ঢুকে দেখল কোথাও কিছু নেই। মালপত্র ঠিকই আছে, তবে কাল্‌কের থেকে আজ তফাৎ এই যে বস্তাগুলো যেটি যে জায়গায় দাঁড় করান ছিল, সেটি ঠিক সেখানে নেই। প্রত্যেক

মসলা ভূত
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বস্তাটীই যেন সরে সরে তফাৎ হয়ে গেছে। একটা বস্তা আর একটার ঘাড়ে কাৎ হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে পেছন দিকের কতগুলো বস্তা হাণ্ডলবাণ্ডল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

হাজারি মহা ভাবনায় পড়ে গেল। চোরই যদি হয় তবে শব্দের সৃষ্টিপাত কেন। আর চোর ঢোকেই বা কোথা থেকে আর বেরিয়েই বা যায় কেমন করে। অসম্ভব! তবে কি জাহাজডুবির লোকগুলো জলে ডুবে মরে ভূত হয়ে মসলা বস্তায় যে যার ঢুকে ব'সে আছে?

লাটের মাল কিনে অবধি দু'রাত্রি ত এই ভাবে কাটল। আজ তৃতীয় রাত্রি। হাজারির রোখ অসম্ভব বেড়ে গেছে। আজ সে মরিয়া হ'য়ে দুজন লোক নিয়ে সারা রাত্রি গুদামের বাইরে জেগে বসে রইল। হাতের কাছে যাকেই সে পাবে, কিছুতেই আজ আর তাকে আস্ত রাখবে না। তার এই অভীষ্ট সিদ্ধ করার জন্যে দিনমানেই সে খুব ঘুমিয়ে নিয়েছে—পাছে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ে।

টং টং টং টং—পাশের ঘরের ঘড়িতে চারটে বেজে গেল। হাজারির চোখের পাতা পড়েনা। সে ঠায় জেগে আছে। কোথাও কিছু নেই কিন্তু হঠাৎ এ কি কাণ্ড! শত শত লোক একত্র খুব দম দিয়ে নিঃশ্বাস টেনে ছেড়ে দিলে যেমন একটা ঝড়ের মত সাঁই সাঁই ক'রে শব্দ হয় অবিকল তেমনি একটা শব্দ শোনা গেল।

হাজারি আলো জ্বালিয়ে দিয়েই একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল। দরজার দোর-গোড়ায় যে দুটো লোক শুয়েছিল হাজারি চট্ করে তাদের জাগিয়ে দিয়ে বললে—"তোরা শীগ্গির ঘরের পেছনটায় দৌড়ে গিয়ে দেখ্ দেখি—চোরেরা সেখানে কোন সিঁধ কেটেছে না কি।" তারপর হাজারি গুদোমের তালা খুলে ফেললে।

মসলা ভূত

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিসের সিঁধ আর কোথায় বা চোর! বস্তাগুলো যে সব হাই ছেড়ে সারবন্দি হয়ে দাঁড়াতে লাগল!

হরে চাকরটা ভয়ের সুরে বললে—"বাবু, এদিকে চেয়ে দেখুন"—

হাজারি দুই চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে বললে,—"এ্যা—বল কি? আমার মসলার বস্তারা নাচছে?" চাকর দু'জন এ দৃশ্য দেখেই তখন ভয়ে দে চম্পট। তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড।



বস্তাগুলি সব একটার পর একটী ঠক্ ঠক্ করে' ঠিক্‌রে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল! সৈন্ধব লবণের প্রকাণ্ড জাঁদরেল গোছের বস্তাটা ত সর্ব্বাগ্রে বেরিয়ে পড়েই সটান্ গঙ্গার দিকে দে ছুট্। অন্য বস্তাগুলো সব সারি দিয়ে ফুট্‌পাতে দাঁড়িয়ে "ধিনিক্ ধিনিক্" করে' খানিকটা নেচে নিয়ে তারপর সমানে লাফিয়ে মার্চ্ করে' ষ্ট্রাণ্ড্ রোড্ ট্রামের রাস্তা ছাড়িয়ে চলতে লাগল।

নীলামে-কেনা বস্তাগুলো দলের অগ্রণী হয়ে' চলেছে, পেছনে পেছনে চলেছে সারবন্দী গুদোমের অন্য অন্য বস্তা। এইভাবে হাজারির মসলার গুদোম উজাড় হ'য়ে গেল!

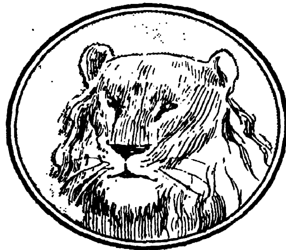
মসলা ভূত

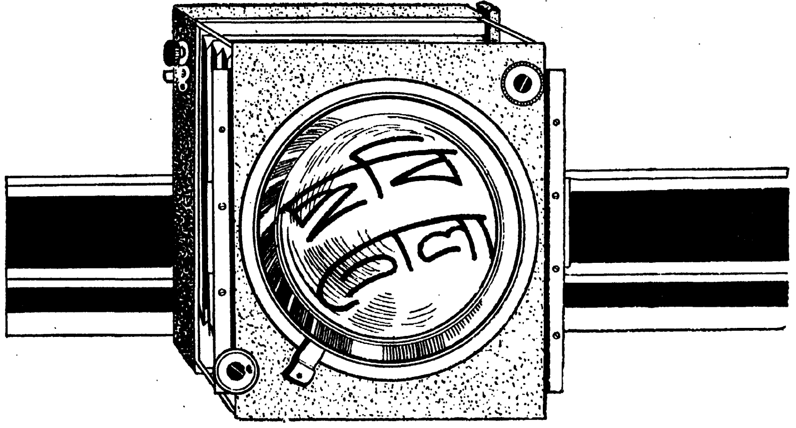
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ রাত্রি। আকাশে ভাসা ভাসা মেঘ। গঙ্গার জলে মেটে মেটে জ্যোৎস্না। হাজারি বিশ্বাস একা দাঁড়িয়ে! একি সত্যি না স্বপ্ন! নির্ব্বাক হতবুদ্ধি হ'য়ে দাঁড়িয়ে সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে দেখছে। লোক ডেকে চেঁচিয়ে উঠবে সে শক্তিও তার লুপ্ত।

সারবন্দী মসলার বস্তাগুলো গঙ্গার ধারে পৌছল এবং গঙ্গার উঁচু বাঁধানো পোস্তার ওপর থেকে ধপাস্ ধপাস্ করে' নীচে গঙ্গার জলে দিল ডুব। এই ভাবে পরপর সমস্ত বস্তা একে একে গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। এবারেও আগে ডুবল নীলামের বস্তাগুলো—তারপর গুদোমের অন্য অন্য বস্তা। এক রাত্রির মধ্যে হাজারি বিলক্ষণ নিঃস্ব হয়ে গেল।

এই ঘটনা শোনার পর হাজারির প্রতিবেশী দোকানদারেরা সকলেই বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে এক বাক্যে বলে উঠল,—"হুঁ, হুঁ। এ আমরা অনেক আগেই জানতাম। ভরা অমাবস্যির জাহাজ ডুবি! আর সেই লাটের মাল কিনলে কিপ্টে হাজারি বিশ্বেস! ভাগ্যিস্, বুদ্ধি করে' আমরা ঘেসিনি। এ মাল কিনলে আমাদেরও কি আর রক্ষা থাকত!"—



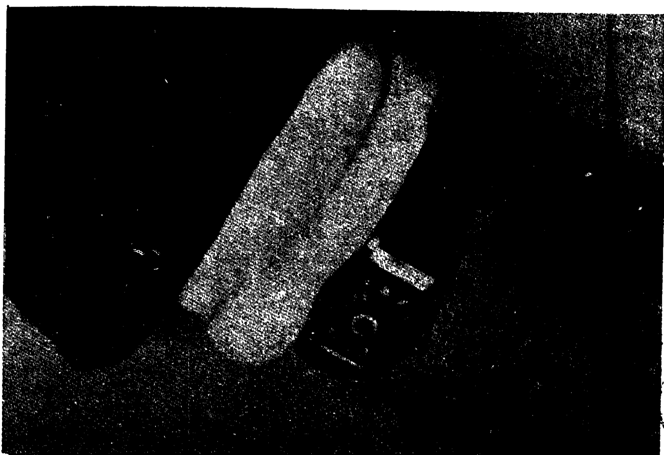


শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

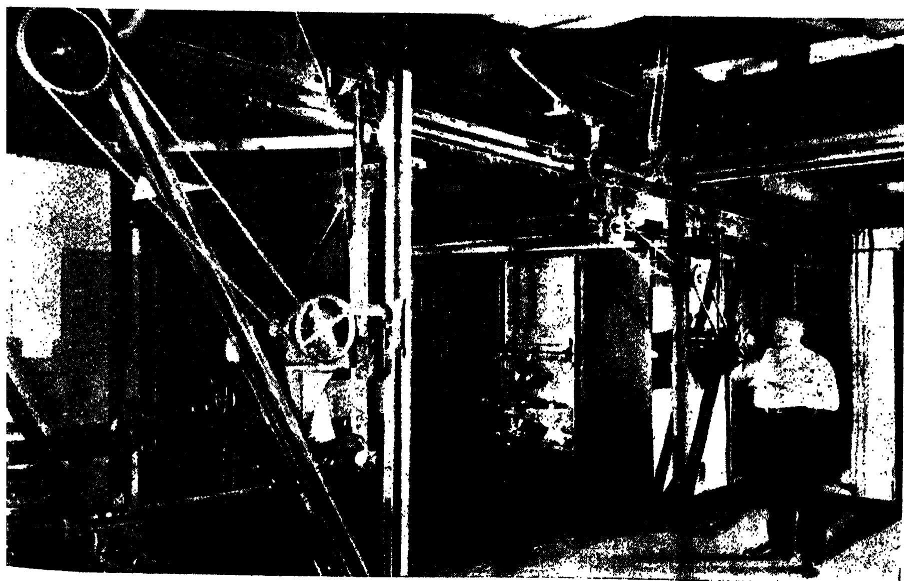
চলিত কথায়, ফটোগ্রাফ তোলাকে আমরা 'ছবি তোলা' বলি। আজকের দিনে ছবি তোলা ব্যাপারটা শক্ত কিছুই নয় ;—ঘরে ঘরে এখন ক্যামেরা। ছোট ছোট ফিল্মে তোলা ছবির দামও বেশী কিছু নয়; কাগজে সেই ছবি ছাপ্‌তেও বেশী খরচ পড়ে না। তা' ছাড়া, এই ছোট ছবিকে ইচ্ছামত বড় ক'রেও নেওয়া যায়। সেদিন একটা কাগজে দেখলাম, একটা ছোট্ট ফিল্মের ১½"×২" ছবিকে ১৫"×২০" আকারে বড় করা হয়েছে! বড় ছবি তুল্‌বার জন্য বিরাট ক্যামেরাও তৈয়ারী করা হচ্ছে।

বিশ বছর আগেকার কথা একবার ভেবে দেখ। তখনকার ক্যামেরা ছিল কত বড়; ছবি তোলার হাঙ্গামও ছিল কত বেশী। আজকাল যেমন চট্‌ ক'রে ছবি তুলে নেওয়া যায় তখন তত সুবিধা ছিল না।

বড় বড় ভাল লেন্স্‌, আধুনিক ব্যবস্থার হাল্কা ক্যামেরা, খুব অল্প সময়ে (অল্প 'এক্স্‌পোজারে') ছবি তোলা চলে এমন ফিল্ম আর প্লেট, ডেভেলাপ করার



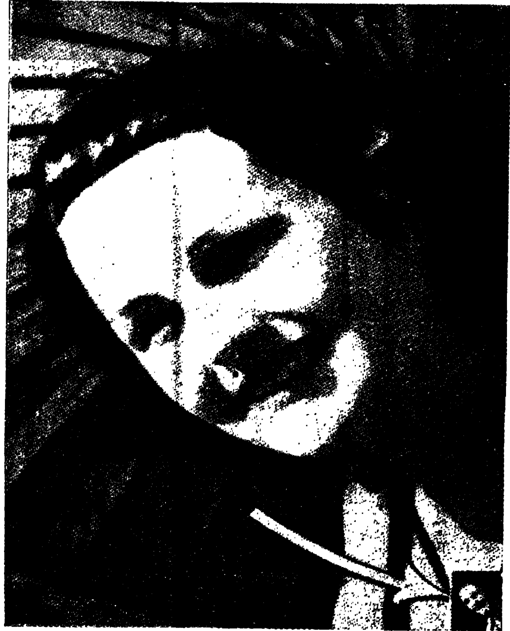
ছোট ক্যামেরার ছবি



সব চেয়ে বড় ক্যামেরা। ওজন ২৫০ মন। ভিতরে একটি লোক অনায়াসে বাস করতে পারে।

এবং কাগজে ছাপার আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম—এগুলি আজ ফটোগ্রাফারের হাতে মোক্ষম অস্ত্র। তাই আজ পৃথিবীর চারিদিকে ফটোগ্রাফার ছড়িয়ে পড়েছে। গহন বনে, মরুভূমিতে, জনহীন প্রান্তরে, অজানা দেশে, জলে, স্থলে, শূন্যে—সব জায়গায় আজ ফটোগ্রাফার আর ফটোগ্রাফ।

অভ্রভেদী হিমালয়ের অজেয় শিখর এভারেষ্ট আজ ক্যামেরার কাছে হার মেনেছে, ক্যামেরা সাগর-রহস্য ভেদ কর্‌তে আরম্ভ ক'রেছে, আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত গহ্বরের ছবি ক্যামেরা তুল্‌ছে; —বাকি আর রইল কি? আলোর সাহায্যে ছবি তোলা তো কতই দেখেছি; আজ অন্ধকারেও ছবি তোলা হচ্ছে। নিমেষের মধ্যে যা' ঘট্‌ছে তা'র ছবি উঠছে শুধু নয়—নিমেষকে শত ভাগে ভাগ ক'রে তা'র এক এক ভাগে ঘটা একটি ঘটনার আলাধা ছবি উঠ্‌ছে। আজ টেলিগ্রাফে, বেতারে ছবি পাঠানো হচ্ছে। অতি সুন্দর রঙ্গিন ছবি উঠ্‌ছে;



খুব ছোট ছবিকে বড় করা

—তবে, এখনও তাড়াতাড়ি তোলার ব্যবস্থা হ'তে পারে নি। ভবিষ্যতে অবশ্যই সেটা সম্ভব হবে। ক্যামেরার সাহায্যে ছবিকে বাঁকাচোরা বা অতি-



বাঁকা-চোরা ছবি তোলার যন্ত্রে তোলা ছবি

উপরের বাঁ দিকের কোণার ছবিটি এক সাহেবের মুখের স্বাভাবিক চেহারা। বাকি ছবিগুলি যন্ত্রের সাহায্যে তোলা তাঁর নানারকম আঁকাবাঁকা চেহারা।

রঞ্জিত ক'রে হাসির ছবি তোলারও যন্ত্র আবিষ্কার করা হয়েছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে ইচ্ছামত চোখ, নাক, মুখ, কপাল, মাথা, কান—বড় ছোট ক'রে তোমার ব্যঙ্গ-ছবি (বা Cartoon) তোলা যাবে। কত আর বল্‌ব ?

মানুষের উৎসাহ, উদ্যম, চেষ্টা আর যত্নের ফলে আজ ফটোগ্রাফি আমাদের কাছে কত রহস্য উদ্‌ঘাটন করছে। আজ তা'রই দু'চারটি কথা তোমাদের বল্‌ব।



গণ্ডার রুখে দাঁড়িয়েছে—এবার তাড়া কর্‌বে

সেদিন একটা ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় একটা লেখা পড়্‌ছিলাম "Hunting wild game with the Camera," অর্থাৎ "ক্যামেরা দিয়ে বন্য-জন্তু শিকার।" সে আবার কি ? ক্যামেরা কি তবে আজকাল বন্দুকের কাজ করে নাকি ? লেখাটা পড়ে দেখ্‌লাম, ক্যামেরার সাহায্যে কেমন করে বন্য-জন্তুর ছবি তোলা হয় তা'রই বিষয় লেখা হয়েছে। বন্য-জন্তুকে শিকার ক'রে যেমন আমরা নিয়ে আসি, তেমনি ক্যামেরার সাহায্যে তা'র ছবিটি শিকার ক'রে (অর্থাৎ লুকিয়ে

তুলে) নিয়ে আসা হয়। এর জন্য নানা রকমে কষ্ট সহ্য তো করতেই হয়; অনেক সময় প্রাণটি হাতে ক'রেও নিয়ে যেতে হয়। ডাক্তার নিউম্যান নামে এক ফটোগ্রাফার আফ্রিকার জঙ্গলে গণ্ডার, সিংহ প্রভৃতি ভীষণ হিংস্র জন্তু ক্যামেরায় শিকার ক'রে বেড়াতেন—অর্থাৎ, তা'দের ছবি তুল্‌তেন। এই কাজে তিনি এত ওস্তাদ হয়েছিলেন যে, গণ্ডার সিং বাগিয়ে তাঁর দিকে তাড়া কর্‌লেও, আগে চট্ ক'রে ছবিটি তুলে নিয়ে তারপর দৌড় দিতেন। একদিন হিসাবের একটু গোল হয়ে গেছিল, আর তখনই গণ্ডার এসে একটি গুঁতোয় তাঁকে মেরে ফেল্‌ল। সিংহের ছবি তুল্‌তে গিয়ে একজন সাহেব পাহাড়ের কিনারায় ক্যামেরা নিয়ে নীচে গহ্বরের দিকে তাক্ কর্‌ছিলেন। সিংহ ক্ষেপে গিয়ে এক দারুণ লাফে একেবারে ক্যামেরা শুদ্ধ সাহেবকে টেনে নীচে ফেল্‌ল;—তা'র পর আর কতক্ষণ? সাহেবের সঙ্গী এসে গুলি ক'রে সিংহকে মেরে ফেল্‌লেন বটে, কিন্তু, সাহেব আর ক্যামেরার দফা ততক্ষণে একেবারে শেষ।

রাত্রের অন্ধকারে লুকিয়ে বসে থেকে, বন্য-জন্তু এলেই চট্ ক'রে উজ্জ্বল আলো ফেলে তা'র ছবি তুলে নেওয়াও শিকারের একটা ফিকির। অনেক সময় জন্তুর যাবার রাস্তায় একটা তার লাগিয়ে রাখা হয়। অন্ধকারে জন্তুর পায়ে লেগে সেই তারে টান পড়ে আর তখনই আপনা থেকে আলো জ্বলে ওঠে আর ক্যামেরায় ছবি উঠে যায়। বলা বাহুল্য, এই কাজের জন্য যে প্লেট ব্যবহার করা হয় তাতে অল্প এক্স্‌পোজারে ভাল ছবি ওঠা চাই।

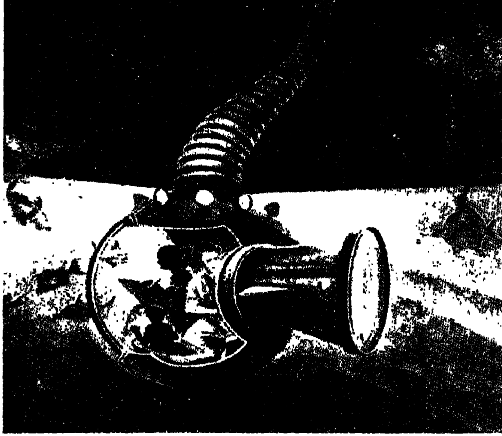
আজকাল অনেক সময়েই বন্য জন্তুর ছবি দূর থেকে তোলা হয়। তাতে বিপদের আশঙ্কা থাকে না। গাছের উপরে জন্তু ব'সে থাক্‌লে তার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না; একেবারে গাছের উপরের দিকে ক্যামেরার লেন্সটি ফিরিয়ে টক্ ক'রে ছবি তুলে নিলেই হ'লো। হাল্কা, ছোট্ট ক্যামেরা এই সব কাজে খুবই সাহায্য করে, কারণ, বন্য-জন্তুর ছবি তুল্‌তে গেলে অনেক সময়েই

দৌড়ে পালান দরকার হয়। আগেকার দিনে প্রকাণ্ড ক্যামেরা নিয়ে দৌড়ে পালান ব্যাপারটা কত কঠিন ছিল একবার ভেবে দেখ।

সিনেমায় তোমরা অনেক বন্য-জন্তুর ফিল্‌ম্‌ দেখেছ। আধুনিক যন্ত্রপাতি না হ'লে সে সব ফিল্‌ম্‌ তোলাই সম্ভবপর হতো না। আজকালকার সিনেমা ক্যামেরা আর ফিল্‌ম্‌ জঙ্গলে নিয়ে গিয়েও ব্যবহার করা চলে ব'লেই, শত অসুবিধা, বাধা, বিপদ ঘাড়ে নিয়ে, মাসের-পর-মাস খেটে এই সব ছবি তোলা হয়।

সাগরের জলে নেমে ডুবুরি অনেক আশ্চর্য্য জিনিষ দেখে। কত অদ্ভুত মাছ, কত সুন্দর প্রবাল আর আগাছা, কত অদ্ভুত সমুদ্রবাসী জীব তা'রা চোখে দেখে আর তা'র বর্ণনা করে। মানুষের ইচ্ছা সেই সব জীবের আর দৃশ্যের ছবি তোলে; কিন্তু জলের নীচে গিয়ে ছবি তোলা তো বড় সহজ নয়! একটু নীচে গেলেই ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার; উজ্জ্বল আলো না ফেল্‌লে কিছু দেখ্‌বার জো নাই। তা' ছাড়া, জলের মধ্যে ক্যামেরা নিয়ে ছবিই বা তুল্‌বে কেমন ক'রে? তাই একটা মজবুত কাঁচের বাক্স বানিয়ে, তা'র মধ্যে ক্যামেরা রেখে, শুধু এক্‌স্‌পোজার দেবার ব্যবস্থাটি বাইরে থেকে চালাবার ব্যবস্থা ক'রে সাগরের তলায় ছবি তুল্‌বার চেষ্টা করা হ'লো। প্রথমে খুব ভাল ছবি ওঠেনি। ক্রমে যন্ত্রপাতির উন্নতি হয়ে, ছবি আরো ভাল উঠ্‌ল, কিন্তু, একলা ডুবুরি ক্যামেরা সাম্‌লাবে, না আলো জ্বাল্‌বে, না নিজেকে সাম্‌লাবে? ঠিক যে সময় ছবি তুলবার সুযোগ ঘট্‌ল, সেই সময়টিতে হয়তো আলো জ্বালা হয়নি, কিম্বা নিজেকে সাম্‌লান হয়নি—সুযোগটি হারিয়ে গেল। এইভাবে ছবি তুলে সুবিধা হ'তো না। শেষটায়, উইলিয়াম্‌সন্‌ নামে এক আমেরিকান সাহেব এক বুদ্ধি খাটা'লেন। তিনি একটা মস্ত লোহার গোলা তৈরী ক'রে তা'র দু'দিকে দুটো মোটা কাঁচের মজবুত জানালা লাগালেন। তা'রপর, সেই গোলার সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড লম্বা

লোহার নল লাগিয়ে দিলেন। নলের মুখটি একটা জাহাজের সঙ্গে ভাল ক'রে আটকিয়ে দিয়ে, গোলাটিকে আস্তে আস্তে সাগরের জলে ছেড়ে দেওয়া হ'লো। লোহাটি ওজনে বেশ ভারী থাকায় জলের মধ্যে ডুবে গেল। তা'র পর, লম্বা মইএর সাহায্যে নলের ভিতর দিয়ে নাম্‌লেই অনায়াসে গোলার মধ্যে পৌঁছান যায়। গোলার মধ্যে বস্‌বার জায়গা আছে, সাগরের জলে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক

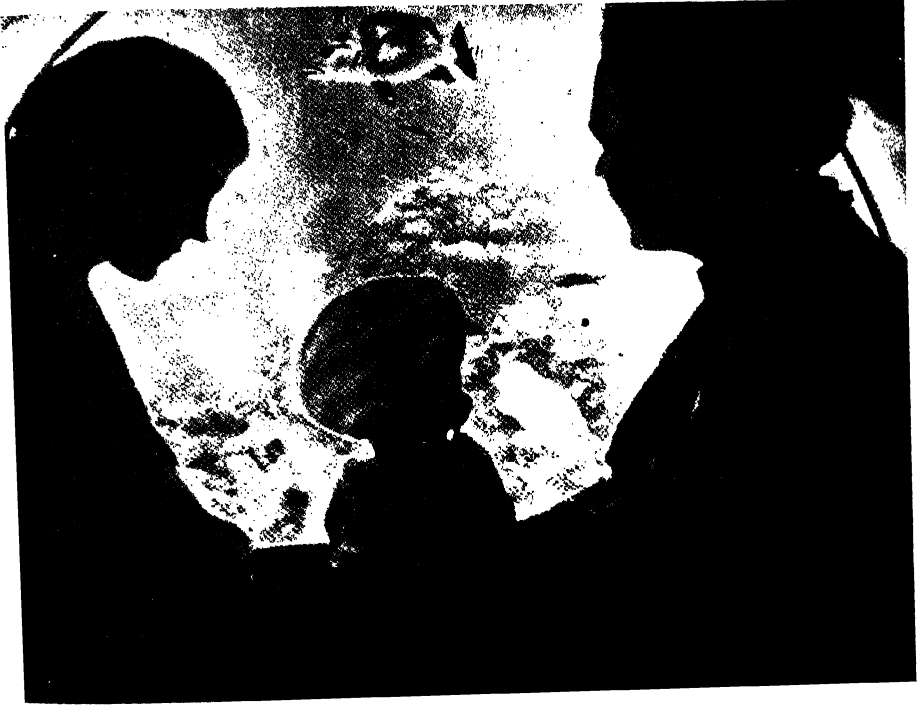


আলো ফেলার ব্যবস্থা আছে, উপর থেকে অক্সিজেন বাতাস পাঠা'বার এবং প্রশ্বাসের বিষাক্ত বাতাস টেনে নিবার ব্যবস্থা আছে। কাজেই, ইচ্ছা করলে, গোলার মধ্যে ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাগর-রহস্য দেখা যায়, ছবি তোলা যায়, ছবি আঁকাও যায়। উইলিয়াম্‌সন্ সাহেব এই গোলার মধ্যে ব'সে সাগর-তলার অনেক ছবি তুলেছেন এবং এঁকেছেন। তাঁর ছোট শিশু-পুত্রটিকেও গোলার মধ্যে বসিয়ে অনেক তামাসা দেখিয়েছেন।

সাগর-জলে গোলা নামিয়ে যে রকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে, মানুষের পেটের ভিতরের ছবি তুল্‌বার জন্যও অনেকটা সেই ধরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটী ছোট্ট—শুধু ছোট্ট বল্‌লে হবে না, 'ক্ষুদে' বল্‌তে হবে—ক্যামেরা আছে; —যেন একটি রসগোল্লা। সেটিকে গিলে খেয়ে ফেল্‌তে হবে। সর্ব্বনাশ! সে আবার কি ?—কোনও ভয় নেই! ক্যামেরার সঙ্গে একটি সূতো বাঁধা আছে;

ছবি তোলা

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী



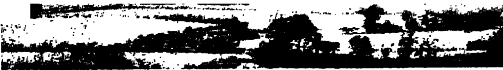
উইলিয়াম্‌সন্‌ সাহেবের পত্নী আর ছোট ছেলে গোলার মধ্যে ব'সে তামাসা দেখ্‌ছেন।

তার মাথাটি একজনের হাতে। ক্যামেরা গিল্‌বার সঙ্গে সঙ্গে দপ্‌ ক'রে একটি আলো জ্বলে উঠ্‌ল আর পেটের ভিতরটিকে আলোকিত কর্‌ল। ক্যামেরাটি আবার একটু অদ্ভুত গোছের। তা'র চারিদিকেই লেন্স্‌। আলো জ্বল্‌বার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি লেন্সের মধ্যে দিয়ে আলো প্রবেশ ক'রে এক একটি ছবি উঠ্‌ল। তা'র পর, সূতোটা ধ'রে আস্তে আস্তে টেনে ক্যামেরাকে পেট থেকে বের ক'রে

ছবি তোলা
শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌ

নিয়ে, 'ক্ষুদে' ক্যামেরার অতি-ক্ষুদে ফিল্ম্ ডেভেল্যাপ করলেই পেটের চারিদিকের কুড়িখানি ছোট্ট ছবি পাওয়া যাবে। এই ছবিগুলিকে বড় ক'রে নিলেই হ'লো। একটি কথা এই সম্পর্কে বলা হয় নি ; যখন ক্যামেরা পেট থেকে টেনে বের করা হবে তখন একটি দারুণ 'ওয়াক্' যে উঠ্‌বে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই! যাক্ সে কথা ; তা' দিয়ে আমাদের কি বা আসে-যায় ?





'ইন্‌ফ্রা রেড' প্লেটে দূরের ছবি—(১০ মাইল দূরের দৃশ্য)

টেলিস্কোপ ('দূরবীক্ষণ' যন্ত্র বা 'দুরবীন') তোমরা দেখে থাকবে। টেলিস্কোপের সাহায্যে দূরের জিনিষ কাছে এবং অনেক বড় দেখা যায়। এই দূরবীনের সঙ্গে ক্যামেরা জুড়ে দিয়ে আজকাল খুব ভাল 'টেলিফটো' বা 'দূরের ছবি' তোলা হচ্ছে। এই ব্যাপারে নূতন রকমের প্লেট খুব সাহায্য করছে। এই প্লেটের এক বিশেষ ক্ষমতা এই যে, চোখে আমরা দূরের জিনিষ সচরাচর যতটা ঝাপ্‌সা দেখি, এই প্লেটে ছবি তুল্‌লে তা'র চেয়ে অনেক স্পষ্ট ছবি ওঠে। কুয়াসা থাকার জন্য আমরা ঝাপ্‌সা দেখি ; কিন্তু, এই প্লেটে কুয়াসা ভেদ করে। কিছুদিন আগে, বিলাত থেকে লর্ড ক্লাইড্‌স্‌ডেল এরোপ্লেনে চ'ড়ে পূর্ণিয়া সহরে

ছবি তোলা

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

ফটোর উপর আলো ফেলা হচ্ছে আর ফটো উঠ্‌বার যন্ত্রের ফিল্মেও কম-জোর বেশী-জোর আলো প'ড়ে পাঠাবার যন্ত্রের ফটোগ্রাফের হুবহু নকল উঠে যাচ্ছে। মোটামুটি যন্ত্রের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম; আসল যন্ত্রটির মধ্যে অনেক কল কারখানা কারিকুরি আছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে তীর থেকে সাগরের মাঝে যে-কোন জাহাজে বেতার ফটো-টেলিগ্রাফ পাঠান যায়।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, কিছুকাল আগে, ছবি তোলার অনেক বাধা ছিল। গরমে প্লেট আর কাগজের উপরের মশলা-মাখান ফিল্ম্ (বা মশলার পরত) গ'লে উঠে যেত; ক্যামেরার কাঠ গরমে ফেটে যেত, শুখিয়ে যেত। আজকালকার প্লেট, ফিল্ম্, কাগজ ইত্যাদি



(বাঁয়ে) মূর্ত্তি-ফটো যন্ত্রের সাহায্যে তৈয়ারী মূর্ত্তি
(মাঝে) একটি মূর্ত্তির প্রথম অবস্থা
(ডানে) আবিষ্কারক মূর্ত্তির বিভিন্ন অংশের ফটো দেখাচ্ছেন

গরমেও ব্যবহার করা চলে, ক্যামেরায় কাঠ প্রায় ব্যবহার করাই হয় ন —ধাতু দিয়েই ক্যামেরার কাঠাম তৈরী হয়। এই সব দেখে-শুনে একজন ফটোগ্রাফার একদিন একটা অসমসাহসিক কাজ করার মতলব করলেন তিনি মনে মনে ভাবলেন, "ভাল একটি সিনেমা ক্যামেরাকে যদি গরম-সহ পোষাকে ঢেকে নিই আর ভিতরের ফিল্মকেও যদি ঐ ভাবে বাঁচিয়ে নেবার

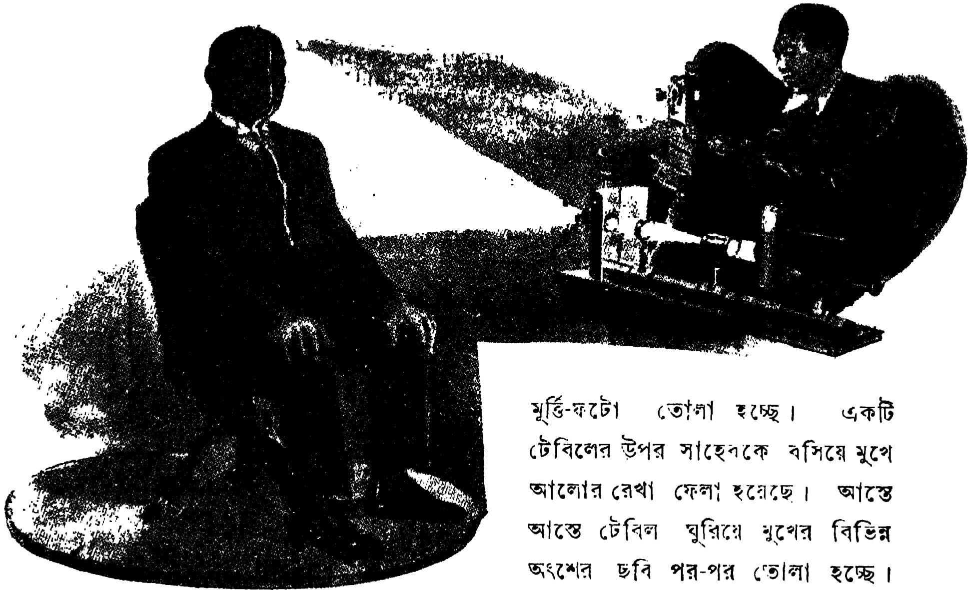
ব্যবস্থা করি; তারপর নিজে যদি আপাদ-মস্তক গরম-সহা পোষাকে শরীর ঢেকে নিই, তা' হ'লে তো আগ্নেয়গিরির গহ্বরের ভিতরকার ছবি তোলা যেতে পারে!" দু' একটি বন্ধু বান্ধবকে ঐ কথা বলায় প্রথমে তা'রা হেসে উড়িয়ে দিল। তা'র পর যখন সব সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক হয়ে গেল আর ইটালির ষ্ট্রম্বোলি নামক আগ্নেয়গিরির গহ্বরের মুখের কাছে গিয়ে দেখান হ'লো, কোথা দিয়ে নাম্‌তে হবে, কেমন ক'রে নাম্‌তে হবে, কোন্ জায়গার ছবি তোলা হবে ইত্যাদি, তখন বন্ধুরা রাজী হলেন,—সেই সাহসী ব্যক্তিকে দড়ির সাহায্যে গহ্বরে নামিয়ে দিতে। প্রাণটা হাতে ক'রে তিনি গহ্বরে নেমে ছবি তুললেন, অনেক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখলেন, তারপর দড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে উঠে চলে' এলেন। আগ্নেয়গিরির কখন কি খেয়াল হয় কে জানে? যে মুহূর্ত্তে তিনি ভিতরে নাম্‌লেন, সেই মুহূর্ত্তে যদি আগুনের জোর হল্‌কা তাঁর দিকে আস্‌ত তা' হ'লেই তো দফা শেষ হ'য়ে যেত! কিন্তু, সে সব বাধাকে তিনি গ্রাহ্যই করেন নি। ফলে, তিনি গহ্বরের ভিতরের ছবি সিনেমা-ক্যামেরায় তুলে এনে সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছেন। ভিতরের আগুনের খেলা নাকি এক ভীষণ ব্যাপার! কোথায় লাগে তা'র কাছে আতসবাজি, কোথায় লাগে তা'র কাছে পৃথিবীর অন্য অগ্নিকাণ্ড! প্রকৃতির খেলার কাছে কি আর অন্য খেলা শোভা পায়?

রঙ্গিন ছবি তুলবার উপায় বহুকাল আগেই বেরিয়েছিল। কিন্তু, সেই উপায়ে ছবি তোলা বড়ই সময় আর কষ্ট-সাপেক্ষ ছিল। মানুষের ছবি সে উপায়ে তোলা তো একরকম অসম্ভবই ছিল। তিনখানা প্লেটে পর পর এক্স্‌পোজার দিলে—তা'ও এক একটা বেশ লম্বা এক্স্‌পোজার—তবে ছবি উঠ্‌বে। ততক্ষণ কি করে স্থির থাকা যায়? আর যদি ছবি ঠিক ওঠেও, তা' হ'লে, তার থেকে কাগজে রঙ্গিন ছাপা তোলাও এক মহা হাঙ্গামের ব্যাপার ছিল। ক্রমে, নানা

ছবি তোলা

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

বৎসরের পরীক্ষার ফলে একটি প্লেটে রঙ্গিন ছবি তোলার উপায় আবিষ্কৃত হ'লো! সেই প্লেটের উন্নতি হয়ে আধুনিক রঙ্গিন ছবির প্লেট হয়েছে। কিন্তু, এই প্লেট থেকে কাগজে রঙ্গিন ছাপার ভাল উপায় এখনও বের হয় নি। উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে বটে, কিন্তু, এখনও তার যথেষ্ট উন্নতি হয়নি। আশা করা যায়, কালে হবে।

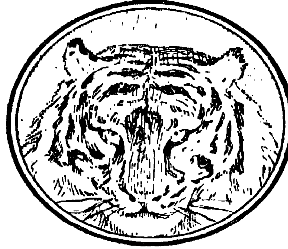


মূর্ত্তি-ফটো তোলা হচ্ছে। একটি টেবিলের উপর সাহেবকে বসিয়ে মুখে আলোর রেখা ফেলা হয়েছে। আস্তে আস্তে টেবিল ঘুরিয়ে মুখের বিভিন্ন অংশের ছবি পর-পর তোলা হচ্ছে।

'মূর্ত্তিতে যেমন উঁচু-নীচু থাকে, ফটোতেও যদি সেই রকম উঁচু-নীচু তোলা যায় তা' হ'লে কেমন হয়?'—এ কথা মানুষ অনেককাল আগেই ভেবেছে, আর, তা'র উপায়ও বেরিয়েছে। ক্রমে এই ধরণের ছবি তোলার উপায়ের আরও উন্নতি হ'য়ে ঘরে ঘরে উঁচু-নীচু গড়নযুক্ত ফটোগ্রাফ থাক্‌বে এই আশা

করা যায়। ধাতুর উপর এই ধরণের ফটোগ্রাফ তুল্‌বার উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বিলাত থেকে একটি কোম্পানী এই ফটোর কারবার করার জন্য এ দেশে আপিস খুলেছে।

যেভাবে উন্নতি হয়ে চলেছে, তা'তে মনে হয়, এবার শুধু কথা-কওয়া ছবি তুল্‌তে পার্‌লেই ছবির চরম উৎকর্ষ হবে। 'টকি'তে তো হয়েছেই ;—তবে তা'র যন্ত্রপাতি অনেক। ভবিষ্যতে কি এমন দিন আস্‌বে, যখন, ঘরে বাঁধান ফটোগ্রাফ স্বাভাবিক-ভাবে নড়াচড়া করবে, উঁচু-নীচুও থাক্‌বে রঙ্গিন হবে—আবার কথাও বল্‌বে ?





শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

এক

সে ছিল এক বাহাদুর চোর। লাহোর জেলায় শূরসিং গ্রামে হইয়াছিল তার জন্ম। তার বাপ ছিল এক জমিদার—অনেক ক্ষেত-খামারের মালিক—কিন্তু নিজের হাতে চাষবাস করিতে এতটুকু লজ্জা বোধ করিতেন না, তাই তাঁহার ক্ষেতে ফলিত সোণার ফসল।

যে বাহাদুর চোরের গল্প তোমাদের বলিতেছি, তাঁহার নাম বিধিচাঁদ। ছেলেবেলা হইতেই তাহার বুদ্ধি ও চতুরতার জন্য সকলে তাহাকে ভালবাসিত। বাপ-মার সবে-ধন নীলমণি,—কাজেই সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত,—এক কথায় বেশি আদর পাইলে ছেলেমেয়েদের যেমন হয়, এও তেমনি হইল,—বিধিচাঁদ দুষ্ট লোকের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া হইল চোর। বাপ, মা প্রথম প্রথম মিষ্টি কথায় সৎপথে চলিবার জন্য অনুরোধ উপরোধ করিতেন, শেষটায় কঠোর ভাবে শাসন করিতেও ছাড়িতেন না,—কিন্তু কোন ফলই হইল না। বাপ-মা মরিয়া গেলেন,—কিন্তু বিধিচাঁদ হইল দেশের নাম করা দুষ্ট চোর।

তোমরা পরশমণির কথা জান। পরশমণি ছোঁয়াইলে পাথরও হয় সোণা। ভাল মানুষেরা এই পৃথিবীর পরশমণি, ইঁহাদের স্পর্শে আসিলে সমাজে অতি

বাহাদুর চোর

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

যে বড় ঘৃণিত ও নিন্দিত ব্যক্তি সেও মহৎ হয়। তাহার চরিত্রেরও পরিবর্ত্তন ঘটে।

দিনের পর দিন যায়—বিধিচাঁদের স্বভাবের কোনও পরিবর্ত্তন হইল না। সে রাত্রিকালে চুরি করে, দিনের বেলা নিজের ঘরে লুকাইয়া থাকে। এই ভাবে দিন যায়। পথ চলিলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, পথের লোকেরা তাহার দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলে—ঐ যায় বিধিচাঁদ চোর।

একদিন তার অদৃষ্টে আসিল শুভ সুযোগ। একজন শিখের সঙ্গে বিধিচাঁদ চোরের দেখা হইল। সে তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, 'চুরি করা কত বড় দোষ।' বিধিচাঁদের মন কেমন হইয়া গেল, সে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল,—তাইত তবে আমার কি উপায় হইবে। শিখ বলিল—তুমি আমার সঙ্গে অমৃতসরে চল। বিধিচাঁদ তাহাই করিল,—অমৃতসরে গুরু অর্জ্জুন দেবের পদতলে সে লোটাইয়া পড়িল।

গুরু অর্জ্জুন দেব প্রসন্ন মনে হাসিভরা মুখে, তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"বৎস! তুমি ত পৃথিবীতে খারাপ কাজ করিতে আস নাই। তুমি আর অন্যায় কাজ করিতে পারিবে না। চুরি করা বড় গুরুতর পাপ কাজ। লোকে কত কষ্টে অর্থ উপার্জ্জন করে, গরীবের দুঃখের সংসারের সামান্য সঞ্চয় হইতে তাহাকে বঞ্চিত করার মত গুরুতর পাপ কি আর পৃথিবীতে আছে? ঈশ্বর যে তাহাকে ক্ষমা করেন না। ভাই বিধিচাঁদ, তুমি ভাল হও, আজ হইতে সৎপথে চল।"

গুরুর এই সুমধুর ব্যবহারে তাহার মন গলিয়া গেল। তাহার সারা দেহ ও মনের মধ্যে একটা ধিক্কার আসিল, সে গুরুকে কহিল,—"গুরুজি! আমি তোমার আদেশ মান্য করিয়া চলিব।"

সেদিন হইতে বিধিচাঁদের জীবনে ঘটিল আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। যে ছিল চোর

ও দস্যু, যাহার সবল বাহু একদিন দরিদ্রকে পীড়ন করিত, আজ তাহার সেই সবল বাহু দুইটি হইল, দীন দরিদ্রের সহায় ও সম্বল। গুরুর সে হইল—বিশ্বস্ত অনুচর।

গুরু হরগোবিন্দ যখন গুরু হইলেন, তখন তিনি যে সৈন্যদল গঠন করিলেন, তাহার একদলের অধ্যক্ষের পদ দিলেন বিধিচাঁদকে। তিনি বিধিচাঁদের সাহস ও নির্ভীকতা এবং সব চেয়ে বড় তার বিশ্বস্ততা দেখিয়াই তাহাকে তাঁহার পার্শ্ব-চর করিয়াছিলেন।

গুরু যখন গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী হন, তখন বিধিচাঁদ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন গুরু হরগোবিন্দকে যদি কেহ কিছু বলিত, তাহা হইলে বিধিচাঁদ তাহাকে কোন রূপেই মার্জ্জনা করিতেন না।

দুই

বিধিচাঁদ কত বড় সাহসী ছিলেন, এইবার তাহার একটি গল্প বলিতেছি।

একবার করোরি মল নামে কাবুলের একজন বণিক গুরু হরগোবিন্দের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তিনি গুরুকে উপহার দিবার জন্য সঙ্গে আনিয়া-ছিলেন দুইটি খুব ভাল আরবী ঘোড়া।

করোরি মলের এই ঘোড়া দুইটির কথা লাহোরের শাসনকর্ত্তার কাণে পৌঁছিলে, তিনি তাহার নিকট হইতে ঘোড়া দুইটি চাহিয়া লইলেন।

এদিকে করোরি মল গুরুজীর কাছে আসিয়া বলিল,—আপনার জন্য যে ঘোড়া দুইটি আনিয়াছিলাম, তাহা লাহোরের শাসনকর্ত্তা লইয়া গিয়াছেন।

গুরু বলিলেন—ভাবনা কি ? সে ঘোড়া দুইটি আমি আনিতেছি। তারপর বিধিচাঁদকে বলিলেন,—যাও বিধিচাঁদ, ঘোড়া দুইটী আনিবার ব্যবস্থা কর।

বিধিচাঁদ লাহোরে আসিলেন এবং একজন ঘেসেড়া সাজিলেন। প্রত্যেক

দিন মাঠ হইতে ঘাস কাটিয়া আনিয়া বাজারে বেচেন। একদিন সুবেদারের আস্তাবলের মালিক বাজারে ঘাস কিনিতে আসিলেন। বিধিচাঁদের সঙ্গে দাম দস্তুর করিয়া তাঁহার মনে হইল, এই লোকটী বেশ ভাল, তখন তিনি তাহাকে রোজ রোজ দুর্গের আস্তাবলে যাইয়া ঘাস জোগাইবার ভার দিলেন। বিধিচাঁদ, রোজ আস্তাবলে যান, ঘাস যোগান আর কড়ায় গণ্ডায় দাম চুকাইয়া আনেন।



অল্পদিনের মধ্যেই দুর্গের লোকজনদের সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্ঠতা হইল। বিধিচাঁদ রোজ যে ঘাস বিক্রী করিয়া টাকা পাইতেন,সে টাকার কিছু কিছু দিয়া ঘোড়ার সহিসদের খুব বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। আর বাকী টাকা দান করিতেন গরীব দুঃখীকে। দুর্গের অধ্যক্ষও বিধিচাঁদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে দুর্গের মধ্যে একটি কাজ দিলেন।

কিছুদিন পরে করোরি মলের দেওয়া সেই ঘোড়া দুইটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়িল—বিধিচাঁদের উপর। দুর্গের সকলেই তাহাকে ভালবাসে, যে ঘোড়া দুইটিকে পালিবার ভার পড়িয়াছিল বিধিচাঁদের উপর, সেই ঘোড়া দুইটিও তাহার অনুগত হইয়া পড়িল।

বাহাদুর চোর

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

এক উৎসবের দিন দুর্গের লোকেরা রাত্রি জাগিয়া হল্লা করিয়া সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সেই সুযোগে বিধিচাঁদ একটি আরবী ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া অমৃতসরে আসিয়া গুরুজীকে সেই ঘোড়াটি উপহার দিলেন।

হরগোবিন্দ বলিলেন, বিধিচাঁদ! আমি যে অন্য ঘোড়াটিও চাই—দুইটি ঘোড়া না হইলে চলিবে কেন?

এইবার বিধিচাঁদ সাজিলেন এক জ্যোতিষী। জ্যোতিষী সাজিয়া আসিয়া লাহোরের বাজারে বসিলেন। আশ্চর্য্য গণৎকার! যাহার হাত দেখেন সেই খুশী হইয়া যায়! অল্পদিনের মধ্যেই লাহোরের সর্ব্বত্র জ্যোতিষীর খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

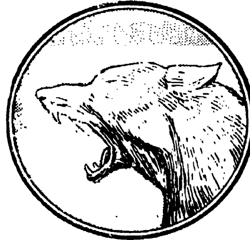
একদিন এই জ্যোতিষীর ডাক পড়িল সুবাদারের দরবারে। সুবাদার তাহার ঘোড়া চুরির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।—গণৎকার অমনি বলিলেন,—যদি আপনি আমাকে দুর্গের ভিতরে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে কেমন করিয়া ঘোড়া চুরি হইয়াছিল,—সেই কথা বলিতে পারিব।

সুবাদার বিধিচাঁদকে দুর্গের ভিতর আস্তাবলে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে যাইয়া বিধিচাঁদ রক্ষীদিগকে সব দরজা বন্ধ করিতে বলিলেন। রক্ষীরা আদেশ পালন করিল। তারপর বিধিচাঁদের কাছে অন্য ঘোড়াটি উপস্থিত করা হইল। —বিধিচাঁদ অমনি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বলিলেন—জান তোমরা আমিই প্রথম ঘোড়াটি চুরি করিয়া নিয়াছিলাম, এইবার দ্বিতীয় ঘোড়াটিও চুরি করিয়া চলিলাম! এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিধিচাঁদ ঘোড়ার পিঠে মারিলেন এক চাবুক। ঘোড়া দুর্গের সে দিক্‌কার নীচু প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া ঘন-বনের মধ্য দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।—দুর্গের লোকেরা কি যে করিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না।

বিধিচাঁদের সম্বন্ধে এমন আরও অনেক দুঃসাহসিকতার গল্প আছে। বিধি-

চাঁদের মত দুঃসাহসী লোক—শিখদের মধ্যেই বড় কম জন্মিয়াছেন। গুরু হরগোবিন্দ তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন।

তোমরা যদি কখনও লাহোর জেলার শূরসিং গ্রামে বেড়াইতে যাও,—তাহা হইলে দেখিবে ছায়া-নিবিড়-তরুতলে বিধিচাঁদের সমাধি-মন্দিরের চূড়া আকাশ ছুঁইয়া দাঁড়াইয়া আছে।





বিমল রায়চৌধুরী, এম, এ

দধিসত্ত্ব মুনি নর্ম্মদাতীরে তাঁহার মনোরম কুটীরে বাস করিতেন। শ্বেত পাথরের বেদীতে সাদা কম্বলের আসনে বসিয়া তিনি ধ্যান করিতেন। চুল দাড়ি গোঁফ কামাইয়া মাথায় ঘাড়ে আর মুখে দই মাখিয়া তিনি ধ্যানে বসিতেন। সকালে একটি শ্বেতপাথরের বাটীতে ঘোলের সরবৎ রাখিয়া তাহাতে একটি শ্বেতপদ্ম ভাসাইয়া দিতেন। দুই তিন ঘণ্টা পরে ধ্যান হইতে উঠিয়া সেই ঘোল পান করিতেন। আবার দই মাখিয়া ধ্যানে বসিতেন। এইভাবে দিনের ভিতর ৩।৪ বার ধ্যান এবং ঘোলপান করিতেন। তিন সপ্তাহ পরে তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন। উৎসাহের চোটে তিনি আরও তিন বৎসর এই সাধনা অভ্যাস করিলেন।

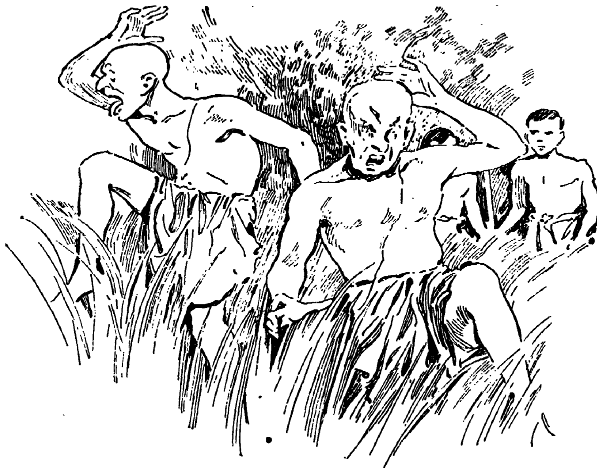
তপস্যার প্রভাবে দধিসত্ত্ব মুনির শরীর মন বড়ই স্নিগ্ধ হইল। দিনের বেলায় তাঁহার ঘাম হইত না; রাত্রিতে বড়ই আরামে নিদ্রা হইত। এখন তিনি গ্রামে গ্রামে শিষ্য খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনেকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সাধনার ফল কি?" মুনি বলিলেন, "এক সপ্তাহে শরীর মন জুড়াইয়া যাইবে, দুই সপ্তাহে অপূর্ব্ব কান্তি হইবে, তিন সপ্তাহে তালুমূলে পূর্ণচন্দ্রের উদয়

হইবে, মস্তক ভেদ করিয়া জ্যোৎস্নারাশি বাহির হইবে। তখন নিজেরা তো যারপর নাই আরাম বোধ করিবেই, অন্যেও তোমাদের প্রশংসা করিবে এবং তোমাদের অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিবে। ঘোর গ্রীষ্মেও তোমাদের কষ্ট হইবে না। উন্মাদ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগে কখনও ভুগিতে হইবে না, মাথায় রক্ত উঠিবে না। বিশেষতঃ নাসা, ব্যঙ্গ এবং নীলীরোগে কখনও কষ্ট পাইতে হইবে না। লম্বজিহ্বতা, গলগ্রহ এবং হনুমন্যাদির বিকৃতি সারিয়া যাইবে। তখন এমন সুন্দর চেহারা হইবে যে, সিংহ ব্যাঘ্রও তাহা দেখিয়া হিংসা ভুলিয়া আরামে চক্ষু বুজিয়া ফেলিবে।"



মুনির পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা শুনিয়া এবং সহাস্য বদন ও স্নিগ্ধ কান্তি দেখিয়া ১৫ জন লোক তাঁহার শিষ্য হইল। যাহারা হইল না তাহারাও বলিল, "ভাবিয়া দেখিব।" শিষ্যেরা চুল দাড়ি গোঁফ কামাইয়া দই মাখিয়া গুরুর সহিত ধ্যানে বসিল। প্রথম দিনই পাঁচ জন শিষ্য বলিল, "মুনিঠাকুর, আর তো দই মাখিয়া সাধনা করিতে পারি না; মুখের চারিদিকে বড়ই মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে।" মুনি মনে মনে দুঃখিত হইলেও বলিলেন, "তোমাদের যখন এতই কষ্ট হইতেছে তখন তোমরা যাইতে পার।" সেই পাঁচ জন চলিয়া গেল। অবশিষ্ট দশ জন শিষ্য

উৎসাহের সহিত তপস্যা করিতে লাগিল। এক সপ্তাহ পরে আরও পাঁচ জন বলিল, "গুরো! মাথা যে পচিয়া গেল। দই মাখিয়া মাখিয়া অসহ্য চুলকানি হইয়াছে।" মুনি ক্ষুণ্ণ ভাবে বলিলেন, "তোমরাও যাইতে পার।" অবশিষ্ট পাঁচ জন শিষ্য মুনির উপর নির্ভর করিয়া তপস্যা চালাইতে লাগিল। মুনি তাহাদিগকে বলিলেন। "বৎসগণ, দ্বিতীয় সপ্তাহ আরম্ভ হইয়াছে, এইবার তোমাদের দিব্য-কান্তি লাভ হইবে।"


শিষ্য লাফ দিয়া পলাইয়া গেল

দ্বিতীয় সপ্তাহ শেষ হইলে শিষ্যদের মধ্যে তিন জন বলিল, "গুরুজী, ঠাণ্ডা লাগিয়া লাগিয়া আমাদের সর্দ্দি নামিয়া গেল; আর তো দই মাখা চলে না" মুনি বলিলেন, "মাথা ঠাণ্ডা করিবার জন্যই তো এত আয়োজন করিয়াছি! তোমাদের যদি সহ্য না হয় তবে বুঝিতে হইবে তোমরা আমার শিষ্য হইবার যোগ্য হও নাই।"

সেই তিন জন চলিয়া গেল। অবশিষ্ট দুইজন শিষ্যকে মুনি বলিলেন, তোমাদের উৎসাহের প্রশংসা করি। আর সাত দিন ধ্যান কর, মহাসিদ্ধি লাভ হইবে, তালুমূলে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইবে।" ছয় দিনের পর দুই শিষ্যের একজন বলিল, "গুরুদেব, তালুমূলে চন্দ্রোদয় হইয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই চন্দ্রে গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং আমি চলিলাম।"

দধিসত্ত্ব মুনি

শ্রীযুক্ত সুবিমল রায়চৌধুরী এম্-এ

পরদিন শেষ শিষ্যকে মুনি বলিলেন, "বৎস, আর একদিন মাত্র। যে দিনের জন্য আমরা এতকাল অপেক্ষা করিতেছিলাম আজ সেই মহাদিন। চল, আমরা ঐ ধানক্ষেতে বসিয়া ধ্যান করি।" গুরুশিষ্যে ধানক্ষেতে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। ৩।৪টি বালক লাঠি হাতে সেখানে খেলা করিতে আসিল। তাহারা গুরুশিষ্যের দইমাখা মাথা দেখিয়া বলিল, "দেখ, কে হাঁড়িতে চূণ মাখাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। লাঠি দিয়া হাঁড়ি ফাটাইয়া দিলে বেশ হয়।" এই বলিয়া তাহারা গুরু ও শিষ্যের মাথায় লাঠি দিয়া মারিল। শিষ্য লাফ দিয়া পলাইয়া গেল। মুনিও মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে উঠিয়া পড়িলেন। বালকগণ লজ্জায় দূরে সরিয়া গেল। ইহার পর মুনি আর শিষ্য সংগ্রহ করেন নাই।





ভাবের আবেশ

শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু

ব্যাঞ্জো হাতে মন যে মাতে
আজ্‌কে দু'পরে,
বস্‌লো এসে 'বাচ্চু' ভায়া
সিঁড়ির উপরে ;

ইস্কুলেতে খোকন্ গেছে,
বাবাও 'আপিসে',
পারছে না আর ভাব্‌টা এখন
রাখ্‌তে চাপি' সে।

উল্‌সে ওঠে উল্লাসী মন
—তাইরে নারে না,-
'বাচ্চু' এখন কারুর কিছুই
ধারটি ধারে না।

ভাবের আবেশ

শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু

মধুর সুরে গান যে চলে,
'ব্যাঞ্জো' বাজিয়ে,
দৌড়ে এসো, তোমরা যারা
শুন্‌তে রাজী হে।

দরাজ গলায়, জমাট্‌ ভাবে,
ভরাট সুরে যে,—
বাচ্চা বাঁদর আচ্ছা করে'
গানটি জুড়েছে।

ভাবের যখন বন্যা আসে,
থাক্‌তে পারে কে ?
বাচ্চু এখন ভাবের মাতাল,
থামায় তারে কে ?

তোমরা যারা গানের রসিক
সুরের সমঝ্‌দার—
আভাস পেয়ে 'সাবাস' দেবে
এম্‌নি চমৎকার।



ঘটিরাম হাতী

শ্রীযুক্ত দেবব্রত রায়চৌধুরী এম্-বি

কল্‌কাতায় হগ্-মার্কেটে আমার কাপড়ের দোকান আছে। একদিন সকালেই দেখি ঘটিরাম হাতী দোকানের দিকে আস্‌ছেন। ঘটিরামবাবু মস্ত বড় লোক; কিন্তু যেমন তাঁর চেহারা, তেম্নি তাঁর স্বভাব। চক্‌চকে মিশ্-কালো বার্ণিশ করা রং, জালার মত বিরাট ভুঁড়ি, ভাঁটার মত গোল দুটি চোখ, কাঁচা-পাকা ছাঁটা গোঁপ, বেঁটে মোটা;—গজ-কচ্ছপ, কিম্ভূত-কিমাকার চেহারা;—অনেকটা হাতীর মতই। স্বভাব বড় তিড়িক্কে, লোককে অনর্থক জ্বালাতন কর্‌তে বড় ভালবাসেন।

সকাল বেলাই এঁকে আস্‌তে দেখে মনটা বড় দমে গেল;—'বউনী'র সময় এ কি আপদ! দিনটা ভালয় ভালয় গেলে হয়।

যা' হোক, উনি সিল্কের কাপড় দেখ্‌তে চাইলেন; আমিও তাঁকে নানা রকমারী কাপড় দেখাতে লাগ্‌লাম। কোনটাই আর তাঁ'র পছন্দ হয় না। আমি তো গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে থানের পর থান বের কর্‌তে লাগ্‌লাম; দেখ্‌তে দেখ্‌তে কাপড়ও জমে গেল পর্ব্বত প্রমাণ। এক ঘণ্টা সতের মিনিট পরে হাতী মশাই জানালেন যে কোনও কাপড়ই তাঁ'র পছন্দ হচ্ছে না—তবে, টাকায়-ছ'খানা-ওয়ালা রুমাল যদি থাকে তা' হ'লে উনি তার একটা নিতে পারেন। মনে

মনে বেজায় চট্‌লাম; আমার কাছে ভাল ভাল কাপড় সব রয়েছে, দামেও খুব সুবিধা;—নেবার মতলব নেই; অনর্থক শুধু হয়রান করা। কি আর করি! বড় মানুষ, পরে যদি কখনো আমার বাঁধা খদ্দের হয়ে যান এই ভেবে, মনের রাগ মনেই রেখে একখানা রুমাল এগার পয়সায় তাঁকে দিলাম। তা'ও আবার কত বাছাবাছি! ৩৯ খানা রুমাল দেখে, তবে বাবুর একটা পছন্দ হ'লো। দামটা দিলেন; আমিও রুমালখানা কাগজে মুড়ে তাঁ'কে দিতে যাচ্ছি, এমন সময় উনি বল্লেন, "দেখুন, এখন আমার এটা নিয়ে যাবার সুবিধা হবে না আপনার লোক দিয়ে বেলগাছিয়ায় আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবেন।"

ইনি আগে দু'চারবার যা' আমার দোকানে এসেছেন, সব বারেই সামান্য যা' কিছু কিনেছেন, আমার দারোয়ান দিয়ে এঁর বাড়ীতে পৌঁছে দিতে হয়েছে তবে, একটা সামান্য রুমালের জন্য আবার ৬৷৷০ মাইল দূরে তাঁর বাড়ীতে লোক পাঠাতে হবে, এ কথা স্বপ্নেও ভাবি নি। রাগে শরীর গজ্ গজ্ কর্‌তে লাগ্‌ল; কিন্তু, আগেই বলেছি, এঁকে বাঁধা খদ্দের কর্‌তে পার্‌লেই আমার লাভ; কেন না, লোক মন্দ হ'লেও টাকা পয়সা ঝটাঝট্ বের ক'রে ফে্‌লেন। কাজেই তাঁকে বল্লাম, "বেশ, তা'ই হবে।"

ঘটিরাম বাবু আমার দোকান থেকে বের হয়ে জাফর মিঞা মেওয়াওয়ালার কাছে গিয়ে নানা রকম ফল বাছাই; দর-দস্তুর ক'রে শেষটায় একটা কাগজী নেবু কিন্‌লেন জাফরকে সেই নেবুটী তিনটার সময় তাঁর বাড়ীতে পৌঁছে দিতে বল্লেন শুন্‌লাম।

সেদিন সন্ধ্যার সময় জাফর এসে অনেক আপশোষ কর্‌তে লাগ্‌ল যে ঘটিবাবু মাঝে মাঝে এসে বড় বিরক্ত করেন। আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোক বল্লেন, "ঘটিবাবু সাহেব-বাড়ী থেকে রোজ তাঁর জিনিষ কেনেন। তোমরা কেন তাঁর এত খোসামোদ কর্‌তে যাও? তিনি কখনও তোমাদের খদ্দের হবেন না। কেবল তোমাদের জ্বালিয়ে আর বিরক্ত ক'রে মজা দেখেন। তোমরা ওঁকে জব্দ

কর্‌লেই পার। আমি একটা উপায় ব'লে দিচ্ছি।"—এই ব'লে তিনি যে একটা পরামর্শ দিলেন, তা' শুনে আমরা হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লাম। তারপর, ঘটি-বাবু আবার কবে আস্‌বেন সেই আশায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রইলাম।

দিন দশেক পর দেখি, ঘটিবাবুর মোটর মার্কেটের সাম্নে দাঁড়াল। ঘটিবাবু হেলে দুলে গদাই-লস্করী চালে আমার দোকানে ঢুক্‌লেন। এবার তাঁর ছিটের কাপড় চাই;—জামা তৈরী হবে। জানি কিছু নেবেন না, তবুও খুব অমায়িক ভাবে এটা-ওটা-সেটা দেখাতে লাগ্‌লাম। যা' ভেবেছিলাম তাইই,—কিছুই বাবুর পছন্দ হ'লো না। তবে, কালো সুতোর গুলি বা রীল যদি থাকে তো উনি একটা নিতে পারেন। দিলাম একটা ন' পয়সা দামের। দামটা পেলাম তক্ষুনি, তবে গুলিটা তিনটার সময় বেলগাছিয়ায় পৌঁছে দিতে হবে।

ঘটিবাবু চ'লে যেতেই আমি তাড়াতাড়ি লরিংটনের আফিসে টেলিফোন করলাম। তা'রা ছোট-বড় নানা রকম মাল-বহা মোটর-লরি রাখে;—ভাড়া খাটায়। তা'দের বল্লাম যে ২টার সময় একটা ২-টন লরি আর আটজন কুলি চাই;—কিছু মাল বেলগাছিয়ায় নিয়ে যেতে হবে। আরও বল্‌লাম যে, লরিটা যতদূর সম্ভব পুরাণো আর নট্‌খটে হওয়া চাই;—চল্‌তে চল্‌তে যেন যথেষ্ট আওয়াজ করে; তবে বিগ্‌ড়ে যেন না যায়। খরচের বিল, 'বাবু ঘটিরাম হাতী, বেলগাছিয়া' এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

ঠিক ২টার সময় কুলি নিয়ে লরি এল। যেমন তা'র নোংরা চেহারা, তেমনি তা'র আওয়াজ। চল্‌তে চল্‌তে ঝর্‌-ঝর্‌, ফট্‌-ফট্‌ ভট্‌-ভট্‌ ঢং-ঢং ঘন্‌-ঘন্‌—কত কিছু আওয়াজ যে বের হয় কি বল্‌ব! কুলিদের সর্দ্দারকে ডেকে বল্‌লাম, "যা' বলি ঠিক সেইমত কাজ যদি করতে পার তো তোমায় বক্‌শিশ দিয়ে খুসী করব। তোমরা এই সুতোর গুলিটা লরিতে ক'রে বেলগাছিয়ায় ঘটিরাম হাতী বাবুর বাড়ীতে পৌঁছে দেবে। এটা যেন বেজায় ভারী জিনিষ এরকম ভান করবে।

আমিও ট্রামে চড়ে সেখানে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে ঘটিবাবুর বাড়ীর সাম্নে মিল্‌ব।"

স্তোর গুলিটা লরির ঠিক মাঝখানে রেখে মোটা কাছির পাক দিয়ে তা'কে ঘেরা হ'লো; তা'র পর কাছিটাকে লরির চারপাশ ঘুরিয়ে অষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা হ'লো;—যেন কত বড় কি একটা জিনিষ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারপর আটজন কুলি নিয়ে লরি ঝকড়্-ঝকড়্ ক'রে বেলগাছিয়া রওয়ানা হ'লো। আমিও ট্রামে চ'ড়ে গিয়ে ঘটিবাবুর বাড়ীর সাম্নেই তাদের ধরে ফেল্লাম। তাঁর মস্ত বড় ফটকের ভেতর গিয়ে লরি খুব আওয়াজ কর্‌তে কর্‌তে ঢুক্‌ল;—যেন এত ভারী জিনিষ এতদূর বয়ে এনে লরি আর চলেই না।

ঘটিবাবু দোতালার বারান্দায় ব'সে গড়্গড়া টান্‌তে টান্‌তে কাগজ পড়্ছিলেন; আমাদের ওভাঁবে আস্‌তে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে লরি বারান্দার সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়েছে। চারজন কুলি তাড়াতাড়ি কোমর বেঁধে লরির উপর উঠে কাছি খুল্‌তে লাগ্‌ল। কাছির ভেতর থেকে শেষে গুলি বের হ'লো। চারজন কুলি উপুড় হয়ে হেঁইয়ো হেঁইয়ো ক'রে সেটাকে ঠেল্‌বার বাহানা করতে লাগ্‌ল, আর বাকি চারজন আট হাত বাড়িয়ে সেটাকে ধরে নেবার জন্য তৈরী হ'লো। সে যেন এক মহামারী ব্যাপার! নীচের চারজন গুলিটাকে ধরে ফেল্‌তেই উপরের চারজন লাফিয়ে নীচে নাম্‌ল। তারা আট জনে মিলে গুঁতোগুঁতি কর্‌তে কর্‌তে সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, আর সবাই সমস্বরে চেঁচাতে লাগল—

"চলোরে ভাইয়া—হেঁই ওঃ!
আওর ভী থোড়া—হেঁই ওঃ!
মারোরে জোয়ান—হেঁই ওঃ!
ফাট্‌তা রে জান—হেঁই ওঃ!
খুব হুঁসিয়ার—হেঁই ওঃ!
মার দিয়া শের—হেঁই ওঃ!"

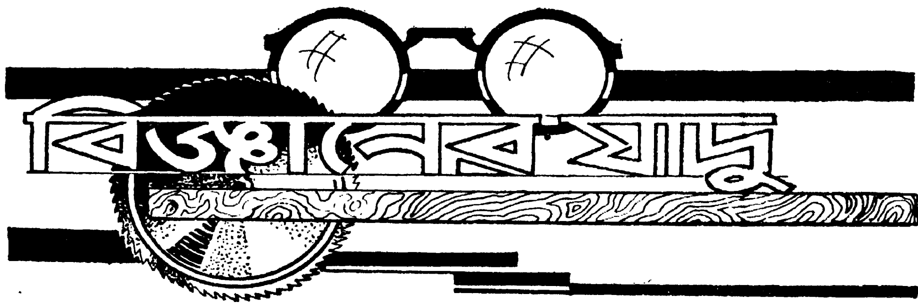
ঘটিরাম হাতী

শ্রীযুক্ত দেবব্রত রায়চৌধুরী এম্-বি

এই কর্‌তে কর্‌তে আর এক-পা এক-পা ক'রে এগিয়ে ক্রমে তা'রা ঘটিবাবুর পায়ের কাছে গিয়ে অতি সন্তর্পণে গুলিটা রেখে ভয়ানক হাঁপাতে লাগ্‌ল আর গামছা ঘুরিয়ে বাতাস কর্‌তে লাগ্‌ল—যেন পরিশ্রমের গরমে দর্‌দরিয়ে তাদের ঘাম বের হচ্ছে। রকম-সকম দেখে ঘটিবাবু এত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে এ পর্য্যন্ত একটা কথাও তাঁর মুখ থেকে বের হয় নি; কেবল তিনি গোল গোল চোখ দুটি পাকিয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়েছিলেন। আমাকে দেখে বল্লেন, "এ কি ব্যাপার সুবোধবাবু?" আমি বল্‌লাম, "আপনি গুলিটি পৌঁছে দিতে ব'লেছিলেন তাই পৌঁছে দেওয়া হ'লো। এখন আমি যাই।"—এই ব'লে আমি চট্‌পট্ স'রে পড়্‌লাম।



কুলিরা বক্‌শিশ নিতে এলে তাদের কাছে শুন্‌লাম যে লরিংটনের বিল ১৭।৵১০ ঘটিবাবু বিনা বাক্য-ব্যয়ে দিয়ে দিয়েছেন। কুলিদের বক্‌শিশ্ আমি আর জাফর মিঞা ভাগাভাগী ক'রে দিয়ে দিলাম। এর পর ঘটিরামবাবু আর এখনও আমাদের জ্বালাতন কর্‌তে আসেন নি।



শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

কাঠ থেকে রেশম ; কয়লা থেকে তেল ; চিনাবাদাম থেকে দুধ আর কাগজ ; আলকাত্‌রা থেকে নানা রঙের বাসন ; কাঠের গুঁড়ো থেকে চিনি ; কাঁচ থেকে রেশম ; ছানা থেকে সুন্দর সুন্দর রং-বেরঙের মজবুত বাসন, কৌটা, খেলার জিনিষ ;—কত আর বল্‌ব ? বিজ্ঞানের অদ্ভুত যাদুর কথা লিখ্‌তে বস্‌লে শেষ আর হবে না। প্রতিদিনই নূতন আবিষ্কার, প্রতিদিনই নূতন আশ্চর্য্য।

বিংশ শতাব্দীর রাসায়নিক আর বৈজ্ঞানিক বলেন, "কোনও জিনিষ ফেলা উচিত নয়।" কাজেও হয়েছে তাই। আবর্জ্জনা আর এখন আবর্জ্জনা নয়। রাস্তার আস্তাকুঁড়ের ময়লা থেকে এখন ন্যাকড়া, কাগজ, লোহালক্কড় বেছে নিয়ে তা' থেকে কাগজ আর নতুন লোহার জিনিষ তৈরী হচ্ছে ; অন্যান্য আবর্জ্জনা থেকে বার্ণিশ, তেল, জ্বালানি গ্যাস্, ভূষো কালী—এই সব তৈরী হচ্ছে। চামড়ার কুচি একত্র জমিয়ে, তা'কে অন্যান্য মাল-মশলার সঙ্গে মিশিয়ে চামড়ার থান তৈরী করা হচ্ছে ; পুরানো ছেঁড়া জুতো থেকে শিরিষ তৈরী হচ্ছে। শিং, হাড় ইত্যাদির কুচো থেকেও শিরিষ তৈরী হচ্ছে। পুরোনো ছেঁড়া পশমী কাপড় থেকে আবার আস্ত কাপড় হচ্ছে। রেশমের ছাঁট থেকে রেশমী কাপড় তৈরী হচ্ছে। খড়-কুটো, কাঠের গুঁড়ো, শুক্‌নো পাতা—সবই আজকাল কাজে লাগ্‌ছে।

লোহা মরচে ধ'রে নষ্ট হয় ; তাই রাসায়নিক 'মর্‌চে-হীন' (Rustless)

লোহা তৈয়ারী করেছেন। সেই লোহা দিয়ে তৈয়ারী ছুরিতে কখনও মর্চে ধরে না। নিকেল, রূপো এই সব ধাতু দিয়ে লোহা গিল্টি করলে সহজেই সে গিল্টি নষ্ট হ'য়ে যায়, তাই ক্রোমিয়াম ধাতু দিয়ে সস্তায় বহুদিনস্থায়ী গিল্টি করা হচ্ছে (Chromium-plating)।

কাঁচ সহজে ভেঙে যায়; কাঁচের টুকরার খোঁচা লেগে মানুষ জখম হয়; তাই আজকাল মজবুত কাঁচ (Armour-plate-glass) তৈয়ারী হচ্ছে। এই কাঁচে আঘাত লাগ্‌লে কাঁচ যদি চুরমারও হয়ে যায়, একটি টুকরাও খ'সে পড়্‌বে না। তোমরা তিন-টুকরা জোড়া-লাগান কাঠ (plywood) দেখেছ কি? আজকাল চেয়ারের বস্‌বার জায়গাটুকু, কাঠের পার্টিশন ইত্যাদি এই কাঠ দিয়ে তৈয়ারী হয়। মজবুত কাঁচও এই রকম তিনটি কাঁচকে তাপের সাহায্যে জোড়া লাগিয়ে তৈয়ারী করা হয়।

কাঁচের মত স্বচ্ছ, কাঠের মত শক্ত, প্রায় রবারের মত স্থিতিস্থাপক এক রকম জিনিষ তৈয়ারী করা হয়েছে তা' দিয়ে বাসনপত্র বানা'লে মজবুতও হবে, আবার কাঁচের মত স্বচ্ছও হবে। ঘড়ির আভাঙ্গা (Unbreakable) কাঁচ তোমাদের অনেকেরই হাতে হয়তো আছে। সেটা কিন্তু কাঁচ নয় ;—কাঁচেরই মতন স্বচ্ছ অন্য জিনিষ।

আজকাল যে নকল রেশম বেরিয়েছে—যাকে আমরা 'রেয়ন' 'রেডিও সিল্ক' ইত্যাদি নাম দিয়েছি—সে জিনিষ কিসে থেকে তৈয়ারী, জান কি? কাঠ থেকে এই নকল রেশম তৈয়ারী হয়। রাসায়নিক বলেন, রেশম যে জিনিষ, এই নকল রেশমও সেই জিনিষ। গুটিপোকা পাতা খেয়ে তা'র থেকে রেশম বের করে তা'র লালার সঙ্গে; বৈজ্ঞানিক কাঠের কোনও অংশকে রাসায়নিক উপায়ে তরল ক'রে ফেলে তা'র থেকে কৃত্রিম রেশম বের করেন।

কাঠের গুঁড়ো থেকে চিনি তৈয়ারী হয় জান কি? উপায়টি কিছু শক্তও

নয়। সালফিউরিক এসিড (গন্ধক দ্রাবক) দিয়ে কাঠের গুঁড়োকে গরম ক'রে এই চিনি তৈয়ারী করা হয়। অবিশ্যি, তৈয়ারীর পর চিনিকে দানাদার ক'রে, সালফিউরিক এসিড সম্পূর্ণভাবে দূর ক'রে দিতে হয়। 'গ্লুকোজ্' (Glucose) নামে যে চিনি ওষুধে ব্যবহার করা হয়, এ হলো সেই জাতের চিনি।

আলকাতরা থেকে কত শত রকমের জিনিষ তৈয়ারী হয় তা' বোধহয় তোমরা কিছু কিছু জান। কত রকমের রং (লাল, নীল, হল্‌দে, সবুজ, বেগুনি, কালো, মেটে, ছেয়ে—আরো কত) কত ওষুধ, ফটোগ্রাফের ডেভেলাপার, শোধক ওষুধ (ফিনাইল, কার্ব্বলিক এসিড), কত সুন্দর সুন্দর সুগন্ধি,—এ সব তো হয়ই ; তা' ছাড়া, একরকমের কঠিন জিনিষ তৈয়ারী হয় যা' দিয়ে নানা রকমের মজবুত এবং সুন্দর বাসন, সখের জিনিষ ইত্যাদি তৈয়ারী করা যায়।

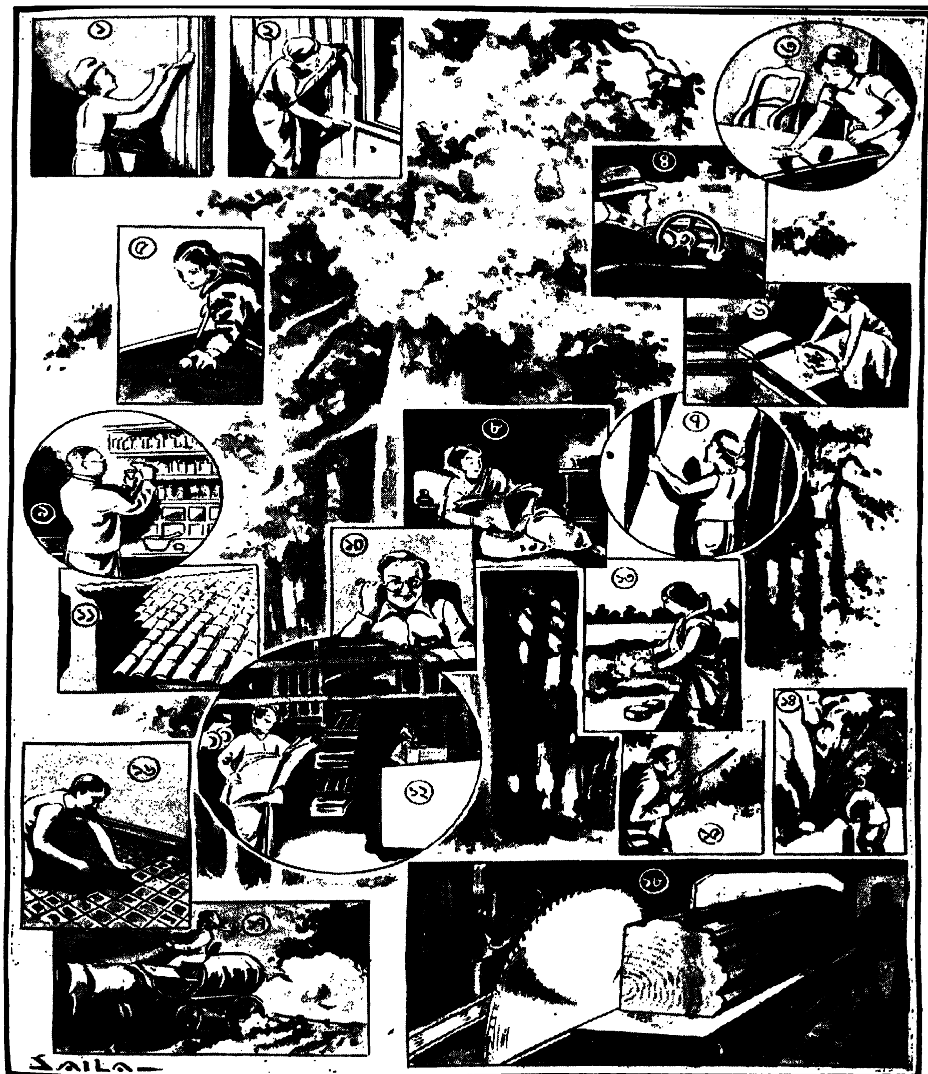
ছানা (দুধের) থেকে একরকম কঠিন জিনিষ হয়, তার সঙ্গে রং এবং অন্যান্য জিনিষ মিশিয়ে কৃত্রিম হাতীর দাঁত, কৃত্রিম ঝিনুক, কৃত্রিম কচ্ছপ-খোলা, ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর জিনিষ তৈয়ারী হয় ; তা' দিয়ে ফাউণ্টেন পেন, কৌটা, ছোট বাক্স, আরো অনেক রকমের সখের জিনিষ তৈয়ারী হয়।

কাপড় ভাঁজ প'ড়ে সহজে নষ্ট হয়ে যায় আর ময়লা দেখায় ; তাই আজ-কাল এমন কাপড় তৈয়ারী করা হচ্ছে যা' ভাঁজ প'ড়ে নষ্ট হয় না।

ভেড়ার লোমে পশম তৈয়ারী হয় ; তাই তা'র দাম বেশী ; সব দেশে ভেড়ার লোম পাওয়াও যায় না ; তাই, নকল রেশমের মত নকল পশম কাঠ থেকে তৈয়ারী করার চেষ্টা চল্‌ছে ; সে চেষ্টা অনেকটা সফলও হয়েছে।

চামড়ায় যা'তে আর পালিশ লাগাতে না হয়, তাই একরকম চামড়া তৈয়ারী করা হয়েছে যার মধ্যে পালিশের জিনিষ রয়েছে—আপনা থেকে সে চামড়া পালিশ হ'য়ে যায়। সে চামড়া জল লেগে সহজে নষ্ট হয় না।

কৃত্রিম চামড়ার তো কথাই নাই। আসল চামড়ার চেয়ে কৃত্রিম চামড়া



কাঠ থেকে তৈয়ারী নানা জিনিষ

(১) রং, (২) 'পুটিন'-জাতীয় জিনিষ, (৩) পালিশ, (৪) নকল কাঁচ, (৫) বিলিয়ার্ড খেলার বল, (৬) শোধক, (৭) পাতলা তিন-পরত তক্তা, (৮) নকল রেশম, (৯) ওষুধ, (১০) চশমার ফ্রেম, (১১) ছাতের টালি, (১২) ছাপার কাজ, (১৩) সাবান, (১৪) আগুন নিভাবার ওষুধ, (১৫) বারুদ,

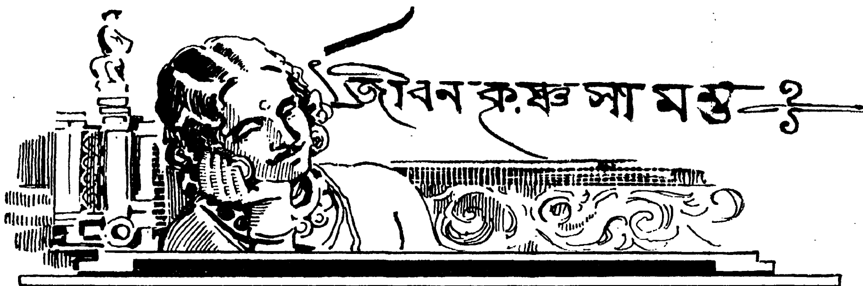
এখন দেখতে সুন্দর হয়েছে, মজবুতও হয়েছে খুবই। তা' ছাড়া, কৃত্রিম চামড়ার থান এক একটি ৩।৪ হাত চওড়া আর ১০০ গজ লম্বাও হয়। আসল চামড়া কখনও অত বড় হ'তে পারে না।

রবরের ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলায় কৃত্রিম রবর তৈয়ারী করার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা খুবই চেষ্টা করছেন। একজাতের গাছের রস থেকে রবর তৈয়ারী হয়, তা' বোধ হয় জান! পৃথিবীর নানা দেশ থেকে নানা জাতের গাছ এনে তা'র রস থেকে রবর জাতীয় জিনিষ তৈয়ারী করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তেল থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রবর তৈয়ারীর চেষ্টা কতকটা সফল হয়েছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই এ চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হবে।

রাসায়নিকের চেষ্টার শেষ নাই। খাবার জিনিষ কেমন ক'রে তাজা রাখা যায়, ফলের পচন কেমন ক'রে বন্ধ করা যায়, আবর্জ্জনা আর বাজে জিনিষের সদ্ব্যবহার কেমন ক'রে করা যায়, রোগের বীজ কেমন করে নষ্ট করা যায়, কৃত্রিম উপায়ে কেমন ক'রে নানান জিনিষ তৈয়ারী করা যায়—সেই সব চেষ্টায় পৃথিবীর নানা দেশে হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক দিনরাত রাসায়নিক পরীক্ষাগারে পরীক্ষায় লেগে আছেন।

এ সব বিষয়ে ভাল ক'রে লিখতে গেলে বিরাট বই হয়ে যায়। বাস্তবিক পক্ষে, এ সব বিষয়ে অনেক বই লেখাও হয়েছে। জার্ম্মাণ ভাষায়, শুধু 'রাস্তার আবর্জ্জনা কাজে লাগান' সম্বন্ধে প্রায় ১০০ বই আছে।

শুধু কাঠ থেকে কত রকমের কাজের জিনিষ হচ্ছে তা'র একটু আভাস দেবার জন্য একটি ছবি দিলাম। কাঠের আসবাব, দরজা, জানালা এ সব তো বহুকাল থেকে হচ্ছে; তা' ছাড়া, কাঠ থেকে নূতন কি কি জিনিষ বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক বা রাসায়নিকেরা তৈয়ারী করছেন তা'রই কতকটা আভাস পাওয়া যাবে এই ছবি থেকে।



পুন্যের হিসাব

শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায়

রাজা বিক্রমাদিত্য একদিন রাজসভায় বসে সকলকে এই প্রশ্ন কর্‌লেন—"আমি কোন্ পুণ্যবলে পৃথিবীর রাজা হয়েছি?" রাজমন্ত্রী, উজির, নাজির কেহই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। এমন কি, রাজার নবরত্ন পণ্ডিতেরাও চুপ ক'রে রইলেন। তখন বিক্রমাদিত্য দেশ বিদেশে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলেন যে "কোন্ পুণ্যের বলে আমি পৃথিবীর রাজা হয়েছি, যে এই কথার উত্তর দিতে পার্‌বে তাকে আমি পঞ্চাশ হাজার সুবর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দিব।" কিন্তু সপ্তাহ গেল, মাস গেল, বছরও পার হয়ে গেল তবুও রাজা প্রশ্নের উত্তর পেলেন না।

রাজার রাজ্যে এক গরীব ব্রাহ্মণ ছিল, ভিক্ষা করে অতি কষ্টে কোনও রকমে সে দিন কাটাত। ব্রাহ্মণ আর তার স্ত্রী, পরিবারে এই দুটি মাত্র প্রাণী—তারা ভারী দুঃখী। রাজার ঢেঁড়ার কথা ব্রাহ্মণীও শুনেছিল। সে একদিন বল্ল—"ওগো! আর ত আধ-পেটা খেয়ে খেয়ে দিন চলে না; যাওনা একবার রাজবাড়ীতে? গিয়ে বল যে তুমি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।" ব্রাহ্মণ বল্ল—"ব্রাহ্মণি! তুমি কি ক্ষেপেছ? কত মহা মহা পণ্ডিত যে কথার উত্তর দিতে

পারলেন না, আমি মূর্খ ব্রাহ্মণ কি ক'রে তার উত্তর দিব?" ব্রাহ্মণী—"আচ্ছা, একবার গিয়ে বলই না যে তুমি পারবে, তারপর সাত দিনের সময় চেয়ে নিও। বলো যে, 'মহারাজ! সাত দিন পরে নিশ্চয়ই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব; তবে কিনা, আমি নিতান্ত গরীব, খেতে পাই না, অনুগ্রহ করে যদি আমাকে পাঁচ শ' টাকা দেন তা' হলে এ সপ্তাহটা বেঁচে থাকতে পারি।' রাজা নিশ্চয়ই তোমাকে বিশ্বাস করে টাকা দেবেন, আমরাও কিছুকাল সুখে কাটাতে পারব—তারপর যা হয় দেখা যাবে এখন।"

ব্রাহ্মণীর উপদেশ মত ব্রাহ্মণ বিক্রমাদিত্যের সভায় গিয়ে সব কথা বল্ল। রাজা তার কথা বিশ্বাস করে সাত দিনের সময় দিলেন, পাঁচ শ' টাকাও দিলেন। টাকা নিয়ে ব্রাহ্মণ যখন বাড়ী ফিরে এল তখন ব্রাহ্মণী তো মহা খুসী। ব্রাহ্মণের তো বড়ই ভাবনা হ'লো—সাত দিনের সময় নিয়ে পাঁচ শ' টাকা এনেছে, এখন ত আর ফাঁকি দিলে চলবে না। ভেবে ভেবে ব্রাহ্মণ বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। এখানে সেখানে ঘুরে ফিরে একদিন দুপুর রোদে এক মাঠে গিয়ে উপস্থিত। বেজায় গরম, বাতাসের লেশ মাত্র নাই—গাছের একটি পাতাও নড়ে না। শ্রান্ত, ক্লান্ত ব্রাহ্মণ মাঠের মাঝখানে একটা বটগাছ দেখতে পেয়ে তার ছায়ায় গিয়ে বস্‌ল। সেখানে বসেও তার ভাবনা গেল না, উপরের দিকে চেয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখতে পেলে যে গাছের উঁচু ডালের তিনটে পাতা খুব নড়ছে। কোনও ডালের পাতা নড়ে না আর ঐ ডালটার শুধু তিনটে পাতা নড়ছে—এটা কেমনতর কথা? ব্রাহ্মণের হ'লো সন্দেহ। তখন খুব মন দিয়ে পাতা তিনটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে দেখ্‌ল যে তিনটা বিকটাকৃতি মানুষ পাতার উপর বসে রয়েছে।

গরীব হলেও ব্রাহ্মণের সাহস ছিল খুবই। সে তখনই জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"কে হে বাপু তোমরা পাতার উপর বসে রয়েছ?" তখন একজন বল্ল—"আমরা যমদূত।"

পুণ্যের হিসাব

শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায়

ব্রাহ্মণ—"তোমরা ওখানে ব'সে কি কর্‌ছ ?" বটগাছের কাছেই একটা লোক ক্ষেতে লাঙ্গল দিচ্ছিল, তাকে দেখিয়ে একজন যমদূত বল্ল—"ঐ লোকটাকে নিতে এসেছি।"

ব্রাহ্মণ—"সুস্থ সবল লোকটা ক্ষেতে হাল দিচ্ছে—তাকে নিতে এসেছ কি রকম ? সে ত মরে নি।"



যমদূত—"আরে ঠাকুর ! ব্যস্ত হও কেন ? দেখবে এখন, লোকটা যখন হাল চালিয়ে ক্ষেতের এ পাশে আসবে তখনি ধাঁ করে আমাদের একজন তার সাম্‌নে বেণাবন হয়ে পড়্‌বে আর একজন কেউটে সাপ হয়ে বেণাবন থেকে বেরিয়েই তাকে কামড়াবে। তখন আমিও তার আত্মাটা নিয়ে যম-রাজার কাছে চলে যাব।" যমদূতের কথায় ব্রাহ্মণের ত চক্ষুস্থির !

তারপর চাষা যখন হাল চালিয়ে ক্রমে ক্ষেতের এপাশে এসে উপস্থিত তখন সত্যি সত্যি তার সাম্‌নে হঠাৎ বেণাবন হয়ে পড়্‌ল আর তার ভিতর থেকে কেউটে সাপ

পুণ্যের হিসাব

শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায়

বেরিয়ে তাকে কামড়িয়ে—বাস্! তখনি তার মৃত্যু। তার পর তৃতীয় যমদূত চাষার আত্মা নিয়ে যমরাজার কাছে চল্ল দেখে ব্রাহ্মণ হাত জোড় করে, অনেক কাকুতি মিনতি করে তাকে বল্ল,—"ভাই! আমার একটি অনুরোধ —দোহাই তোমার! যমরাজাকে জিজ্ঞাসা করো, আমি তাঁকে শুধু একটি মাত্র প্রশ্ন করে চলে আস্ব—তিনি যদি দয়া করে আমাকে একবার যমপুরীতে যাবার অনুমতি দেন্।" ব্রাহ্মণের কথায় রাজি হয়ে দূত চাষার আত্মা নিয়ে চলে গেল।

দূত যমপুরীতে গিয়ে ব্রাহ্মণের অনুরোধের কথা বল্লে পর যমরাজা মহাব্যস্ত হয়ে বল্লেন—রক্ষা কর বাবা! আর জীয়ন্ত মানুষ যমপুরীতে এনে কাজ নেই। এখানে জীয়ন্ত মানুষ এনে একবার যা নাকালটা হয়েছিলাম—সে কথা কোন-দিনই আমি ভুল্ব না—অমন আহাম্মুকি কাজ কি আর করি!"

দূত—"কেন মহারাজ! ব্যাপারটা কি হয়েছিল? কৈ, আমি ত তার কিছু শুনি নি।"

যমরাজা—"আরে বাপু! সে অনেক আগেকার কথা। তখন তুমি আমার কাজে বহাল হওনি। ব্যাপারটা কি হয়েছিল জান? অনেক দিন আগে একবার আমার মা পৃথিবীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন; সেখানে গিয়ে দেখ্লেন রাস্তা দিয়ে একটা হাতী যাচ্ছে। হাতীটা চল্তে চল্তে ভারী দুষ্টুমি কর্ছিল, আবার তখনি মাহুতের অঙ্কুশের ঘা খেয়েই যেন নেহাৎ ভাল মানুষটি। এই দেখে মা হাতীটাকে বলেছিলেন—'আরে বোকা হাতী! পাহাড়ের মত তোমার দেহটা, আর তোমার গায়ে এত জোর, তবু কিনা তুমি একটা সামান্য মানুষের ভয়ে কাতর হও!' মায়ের কথা শুনে হাতী বল্ল—'আরে যমের মা বুড়ি! মানুষকে তুমি সামান্য বল্বে বৈ কি! তোমার ছেলে কিনা মরা মানুষ নিয়ে কারবার করে—একবার সে জীয়ন্ত মানুষের পাল্লায় পড়্লে মজাটা বুঝ্তে পার্ত।"

পুণ্যের হিসাব

শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায়

"হাতীর উত্তর শুনে মা ভারী অপমান বোধ ক'রে আমার কাছে এসে নালিশ কর্‌লেন। আমি তাঁকে অনেক বুঝিয়ে স্থঝিয়ে ঠাণ্ডা করে বল্লাম— 'আচ্ছা মা! একটা জীয়ন্ত মানুষ যমপুরীতে এনে একবার দেখ্‌বে তাকে জব্দ কর্‌তে পারি কিনা।' তখনই দূতেদের হুকুম কর্‌লাম—'যাও ত হে! একটা জীয়ন্ত মানুষ ধরে নিয়ে এস'।"

"আমার হুকুমে দূতেরা পৃথিবীতে এসে মহা বিপদে পড়ে গেল। হাটে, বাজারে, লোকের বাড়ীতে যেখানে হোক্ কাউকে গিয়ে যদি বলে— 'চলত হে! যমরাজার হুকুম, তোমাকে একবার যমপুরীতে যেতে হবে',— অম্‌নি সকলে মিলে দূতদের বেদম প্রহার দেয় আর বলে—'হতভাগা বেটারা! মরিনি তবু যমপুরীতে যেতে বল্‌ছ?' মার খেয়ে খেয়ে দূত বেচারিদের হাড্ডি নড়ে গেল, গায়ে ব্যথা ধর্‌ল। তখন সর্দ্দার বল্লে—'চুলোয় যাক্‌গে জীয়ন্ত মানুষ! যমরাজার যত স্থষ্টিছাড়া কাণ্ড! মরা নিয়ে যাদের কারবার তাদের কেন জীয়ন্ত মানুষ নেওয়া পোষাবে? চল ভাই, আর কাজ নেই—ঢের গুঁতো খেয়েছি, এখন ফিরে চল'।"

"ফিরবার পথে খানিক দূর গিয়েই তা'রা দেখ্‌ল কি, একজন কৃষক তার বাড়ীর সাম্‌নে গাছের ছায়ায় খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে। সর্দ্দার দূতের মাথায় তখন হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেল্‌ল—'আচ্ছা ভাই সকল! এ লোকটা ত নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে; চল না কেন খাটিয়া শুদ্ধ একে তুলে নিয়ে যাই?' সকলে দেখ্‌ল এটা অতি উত্তম পরামর্শ—বাস্, আর কথাটি নাই; তখনি ধরাধরি করে খাটিয়া শুদ্ধ নিয়ে রওয়ানা।"

"খানিক দূর গিয়ে ঝাঁকানির চোটে লোকটার ঘুম গেল ভেঙ্গে। ঘুম ভাঙ্গবামাত্র তড়াক্ করে খাটিয়ার উপর বসে কৃষক জিজ্ঞাসা কর্‌ল—'কে রে তোরা? আমাকে কোথা নিয়ে যাচ্ছিস্?' সর্দ্দার দূত বল্ল—'আরে ভাই!

পুণ্যের হিসাব

শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায়

চট কেন ? যমরাজা বলেছেন একটা জীয়ন্ত মানুষ নিয়ে যেতে, তাই তোমাকে আমরা যমপুরীতে নিয়ে যাচ্ছি। তা, তোমার যদি যেতে আপত্তি থাকে তা' হলে বল—এখনি আবার তোমাকে রেখে আস্‌ব'। কৃষক বল্ল—'যেতে আমার বিশেষ আপত্তি নেই, তবে কিনা যমরাজা যখন সিংহাসন ছেড়ে বাড়ীর ভিতর যাবেন, ঠিক সেই সময় তোমরা আমাকে পুরীর ভেতর নিয়ে যাবে—এইটে যদি তোমরা প্রতিজ্ঞা ক'রে বল তা' হলেই আমি যেতে রাজি আছি।' এতটা সহজে যে কৃষক যেতে সম্মত হবে দূতেরা তা' স্বপ্নেও ভাবেনি—সুতরাং তখনি তারা প্রতিজ্ঞা ক'রে কৃষককে নিয়ে চল্ল।"

যতদূতেরা বিলক্ষণ জানে রাজা কখন সিংহাসন থেকে নেমে অন্তঃপুরে যান, ঠিক সেই সময়ে কৃষককে নিয়ে তারা পুরীর ভিতরে গেল। ভিতরে গিয়ে কৃষক যাই দেখ্‌ল সিংহাসন শূন্য অমনি চক্ষের নিমিষে খাট্ থেকে লাফিয়ে পড়েই একদম সিংহাসনের উপরে। সিংহাসনে যে চড়ে সেই রাজা, কৃষকও রাজা হয়ে হুকুম কর্‌ল—'কে আছিস্! নিয়ে আয় পাপ পুণ্যের হিসাবের খাতা।' হুকুম মাত্র দূতেরা খাতা নিয়ে হাজির। খাতার মধ্যে কৃষক নিজের হাতে তার নাম লিখে সেই নামের পাশে বড় বড় অক্ষরে পৃথিবীর সমস্ত পুণ্য কাজের ফর্দ্দ লিখে রাখ্‌ল। তারপর হুকুম হ'লো—'নিয়ে এস যমকে হাত পা বেঁধে'।"

"যমদূতেরা ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বাড়ীর ভিতর গিয়ে আমাকে বল্ল—'মহারাজ! সর্ব্বনাশ হয়েছে! একটা জীয়ন্ত মানুষ ধরে এনেছিলাম, সে ত এসে শূন্য সিংহাসন দেখেই তার উপর চ'ড়ে ব'সে রাজা হয়ে হুকুম চালাতে আরম্ভ করেছে। পাপ পুণ্যের খাতা আনিয়ে তাতে নিজের নাম লিখে তার পাশে এত বড় পুণ্যের ফর্দ্দ! শুধু তাও নয়, এখন আবার হুকুম করেছে—ধরে নিয়ে আয় যমকে বেঁধে। মহারাজ! কি উপায় হবে'?"

পুণ্যের হিসাব

শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায়

"উপায় হবে মাথা আর মুণ্ডু! সংবাদ শুনে ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। তখন জানালা দিয়ে গলে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে একদম পিতামহ ব্রহ্মার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। হাঁপাতে হাঁপাতে বিপদের কথা সমস্ত জানিয়ে ব্রহ্মার পা জড়িয়ে বল্লাম—'দোহাই পিতামহ ঠাকুর! যমপুরীতে জীয়ন্ত মানুষ এনে মাটি খেয়েছি, এখন এ বিপদ থেকে আমায় উদ্ধার করুন'।"

"কথা শুনে ব্রহ্মার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি বল্লেন—'তাই ত! এখন উপায়। আমাদ্বারা ত এর কোন প্রতিকার হবে না—শীগ্‌গির চল বিষ্ণুর কাছে।' ব্রহ্মা আমাকে নিয়ে বিষ্ণুর কাছে গেলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে বিষ্ণু বল্লেন—'বিপদ ত নেহাৎ সহজ নয় দেখছি। এখন উপায়! লোকটা শিবের ভক্ত; এ কি সহজে আমার কথা শুন্‌বে? চল তা' হলে একবার শিবের কাছে যাই'।"

"আমরা শিবের কাছে গেলাম। শিব সব কথা শুনে আমাকে খুব গালাগালি ক'রে বল্লেন—'কেন হে বাপু! তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন হলো? মরা মানুষের সঙ্গে তোমার কারবার, তুমি কেন আবার জীয়ন্ত মানুষের সঙ্গে ঘাঁটাঘাঁটি কর্‌তে গিয়েছিলে? তোমার যেমন কাজ এখন তার ফল ভোগ কর'।"

"ব্রহ্মা, বিষ্ণু দুজনে মিলে তখন শিবকে অনেক স্তুতি মিনতি ক'রে সন্তুষ্ট কর্‌লে পর শিব বল্লেন—'আচ্ছা, তবে চল যাই, দেখি গিয়ে এর কোন উপায় কর্‌তে পারি কিনা'।"

"পথে যেতে যেতে মহাদেবের হঠাৎ একটা খেয়াল হলো; তিনি বল্লেন—'দেখ যম! তুমি এক কাজ কর। আমরা যমপুরীতে গেলেই কৃষক আমাদের দেখে সিংহাসন ছেড়ে এসে মাটিতে লম্বা হয়ে প্রণাম কর্‌বে। সেই মুহূর্ত্তে তুমিও চট্ ক'রে গিয়ে সিংহাসনে বসে প'ড়ো। সাবধান! ভুলে যদি যাও তা' হলে কিন্তু আর উপায় নাই'।"

পুণ্যের হিসাব

শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায়

"যমপুরীতে আমরা যখন গেলাম তখন মহাদেবকে দেখে কৃষক তাড়াতাড়ি সিংহাসন থেকে উঠে এসে ঢিপ ক'রে এক প্রণাম। সেই সময়ে আমিও গিয়ে সিংহাসনটি অধিকার ক'রে বস্‌লাম। কৃষক বেচারি সব বুঝ্‌তে পেরে মহা অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।"

"মহাদেব বল্‌লেন—'উপায় আর কি! সে যখন তার নামের পাশে পুণ্যের ফর্দ্দ লিখেছে তখন সে ফর্দ্দ পূরণ করেই দিতে হবে। এক কাজ করা যাক্—আমার কিছু পুণ্য আমি দিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণুও তাঁদের পুণ্যের ভাগ কিছু দিন্। আর যমরাজা, তুমিও তোমার কিছু পুণ্য দাও। এই রকমে কৃষকের ফর্দ্দ পূরণ কর—তা' ছাড়া আর উপায় নাই!' শিবের কথা অমান্য করে কাঁর সাধ্য! তখন সেইরূপেই কৃষকের পুণ্যের ফর্দ্দ পূরণ করে দেওয়া হ'লো।"

গল্প শেষ করে যমরাজ দূতকে বল্‌লেন—"এখন বুঝ্‌তে পার্‌লে ত কেন আমি জীয়ন্ত মানুষ যমপুরীতে আনার নামে এতটা আপত্তি কর্‌ছি?"

দূত বল্‌ল—"মহারাজ! এ ক্ষেত্রে আপনার ভয় পাবার কোনই কারণ নাই। আমি ব্রাহ্মণকে নিয়ে আস্‌ব, সে তার প্রশ্নের উত্তর পেলেই আমি নিয়ে তাকে আবার রেখে আস্‌ব—এতে আর গোলমাল হবার কারণ কি? দোহাই মহারাজ! ব্রাহ্মণের অনুরোধ শুনুন, আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন—আমি এর জন্য দায়ী রইলাম।"

যমরাজা দেখ্‌লেন দূত নাছোড়বান্দা—কিছুতেই সে মানে না। তখন তিনি রাজি হয়ে বল্‌লেন—"আচ্ছা! ব্রাহ্মণকে নিয়ে এস, কিন্তু খবরদার! আমি যখন সিংহাসনে বসে থাক্‌ব ঠিক তখনি কিন্তু তাকে আন্‌তে হবে।" দূত "যে আজ্ঞে মহারাজ!" ব'লে ব্রাহ্মণকে আন্‌তে চলে গেল।

খানিক পরেই দূত ব্রাহ্মণকে নিয়ে এসে উপস্থিত। যমরাজকে প্রণাম

করে ব্রাহ্মণ বল্ল—"প্রভু! রাজা বিক্রমাদিত্য কোন্ পুণ্য ফলে পৃথিবীর রাজা হয়েছেন, অনুগ্রহ ক'রে আপনি ইহার উত্তর বলে দিন্।"

যমরাজা বল্লেন,—"আমি ত বাপু এ প্রশ্নের উত্তর তোমায় বল্‌তে পারি না। তবে কিনা, যে এর উত্তর জানে আমি তার সন্ধান বলে দিচ্ছি। রাজবাড়ীর নিকটেই একজন কলু থাকে, তার ঘানিতে একটা কাণা এঁড়ে গরু আছে। বিক্রমাদিত্য যদি রাত দুপুরের সময় সেই কাণা গরুকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তা' হলেই তার উত্তর পাবেন।"



এরপর দূত ব্রাহ্মণকে নিয়ে গিয়ে সেই বটগাছের নীচে রেখে এল।

ব্রাহ্মণ তখনি চল্ল বিক্রমাদিত্যের সভায়। এদিকে সাতদিন পার হয়ে গিয়েছে তবু ব্রাহ্মণের উদ্দেশ নাই দেখে বিক্রমাদিত্য ভাবছিলেন—"তাইত!

ব্রাহ্মণ কি তা' হলে ফাঁকি দিল !" এমন সময় হঠাৎ ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত। তাঁকে দেখে রাজা ভারী খুসী হয়ে বল্‌লেন—"কি ঠাকুর ! আমার প্রশ্নের উত্তর কৈ ?" ব্রাহ্মণ বল্‌ল—"মহারাজ ! সাতদিন পার হয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু আমি প্রশ্নের উত্তর ঠিক করে এনেছি। আজ রাত দুপুরের সময় রাজবাড়ীর পাশেই যে কলু থাকে তার বাড়ীতে গিয়ে আপনি তার ঘানির কাণা এঁড়ে গরুটাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন এবং তা' হলেই তার উত্তর পাবেন।"

দুপুর রাত্রে বিক্রমাদিত্য কলুর বাড়ী গিয়ে কাণা এঁড়ে গরুটাকে প্রশ্ন কর্‌বা মাত্র সেটা ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে লাগ্‌ল। খুব খানিকক্ষণ কেঁদে গরুটা বল্ল—"মহারাজ ! আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পার্‌ব না। রাজবাড়ীর সাম্‌নে, প্রায় এক মাইল দূরে একটা বটগাছ আছে, সেই গাছের ডালে দেখ্‌তে পাবেন মাথা নীচের দিকে ক'রে একটা পেত্নী ঝুলে রয়েছে। সন্ধ্যার পর আপনি নিজে গিয়ে যদি পেত্নীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তা' হলে সে তার উত্তর দিবে।"

পরের দিন সন্ধ্যার পর বিক্রমাদিত্য সেই বটগাছের তলায় গিয়ে দেখলেন বাস্তবিকই মাথা নীচের দিকে দিয়ে একটা পেত্নী ঝুলে রয়েছে। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে পর সে বল্ল—"মহারাজ ! আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি জানি বটে, কিন্তু বল্‌তে পারব না। আপনার নবরত্নের পণ্ডিত যে বররুচি আছেন, তাঁর ছোট মেয়েকে গিয়ে প্রশ্ন করুন, সেই তার উত্তর দিবে।"

পরের দিন রাজা বররুচিকে ডেকে সব কথা বল্লেন। রাজার কথা শুনে তাঁর বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হ'লো। তাঁর মেয়ে এই প্রশ্নের উত্তর জানে সেটা তাঁর বিশ্বাসই হলো না। যা হোক্, বাড়ীতে গিয়ে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলে পর মেয়ে বল্‌ল—"হাঁ বাবা ! রাজা ঠিক কথাই বলেছেন—আমি তাঁর

পুণ্যের হিসাব

শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায়

প্রশ্নের উত্তর জানি। আচ্ছা, চলুন তা' হলে রাজার কাছে গিয়েই সব কথা খুলে বল্‌ছি।"

বররুচি তাঁর মেয়েকে রাজার নিকটে নিয়ে গেলে পর রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"হাঁ মা! তুমি নাকি আমার প্রশ্নের উত্তর জান?" মেয়ে বল্ল—"জানি মহারাজ! আমি তার উত্তর বল্‌ছি শুনুন—"

"বহুকাল পূর্ব্বে অতিশয় দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ, তাঁর স্ত্রী, তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ—পরিবারে এই চারটি প্রাণী। প্রতিদিন প্রায় অনাহারেই তাঁদের দিন কেটে যেত। ভিক্ষা করে প্রায়ই কিছু পেতেন না, যদি বা কখনও কিছু পেতেন তাও এত সামান্য হতো যে তাতে ভাল করে তাঁদের ক্ষুধাই দূর হতো না। এক সময়ে তাঁদের এমনই দূরবস্থা হলো যে ক্রমাগত পাঁচ দিন উপবাস করে রইলেন, এক মুঠা চালও সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌লেন না। ষষ্ঠ দিনে ভগবানের কৃপায় কিছু খাদ্যের যোগাড় হ'লো। ব্রাহ্মণী রান্না করে ভাত চার ভাগ কর্‌লেন। সকলে খেতে বস্‌বেন এমন সময় হঠাৎ এক অতিথি এসে উপস্থিত। অতিথি সাত দিন অনাহারে, গা তার ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে, মুখ দিয়ে তার কথা বেরুচ্ছে না। অতি কষ্টে অনেক মিনতি করে সে বল্লে—'দোহাই বাবা! আমি সাত দিন কিছু খেতে পাই নি, দয়া করে আমাকে দুটি খেতে দাও'।"

"অতিথির দুর্দ্দশা দেখে ব্রাহ্মণের বড়ই দয়া হলো; তিনি ব্রাহ্মণীকে বল্লেন—'আমরা পাঁচ দিন খাই নি আর এই বেচারি সাত দিন ধরে উপবাসী। শুধু আমার ভাগ দিলে ওর কিছু হবে না, ব্রাহ্মণী! তোমার ভাগটাও দাও। দুজনের ভাগ খেলে তবুও তার প্রাণ রক্ষা হবে'।"

"ব্রাহ্মণী গেলেন চটে। 'পাঁচ দিন পর এক মুঠো খেতে বসেছি তাও বল্‌ছ কিনা অতিথিকে দাও। তোমার ভাগ দিতে হয় তুমি দাও গিয়ে—আমি

পুণ্যের হিসাব

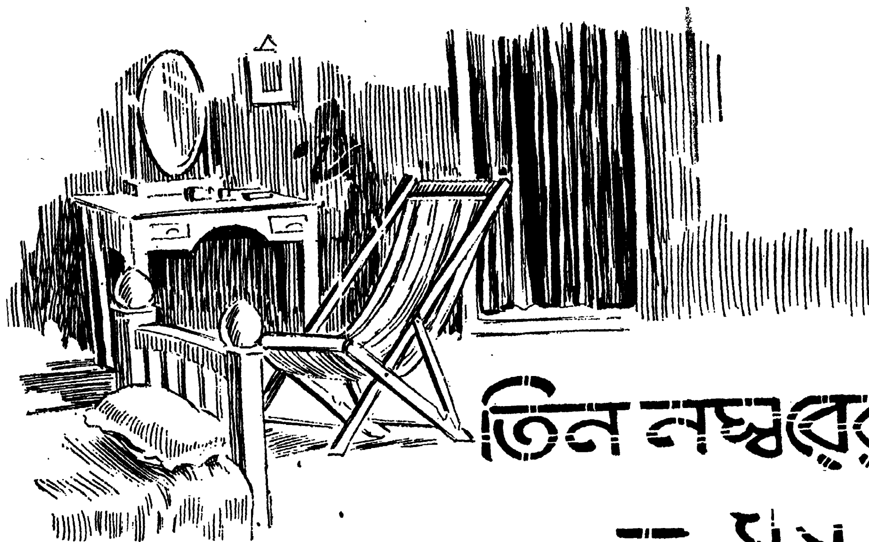
শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায়

আমার ভাগ দিচ্ছি না বাপু। অতিথি মরে মরুক, আমার তাতে বয়ে গেল—নিজের প্রাণটা ত আগে বাঁচাই।' এই বলে ব্রাহ্মণী খেতে আরম্ভ করে দিল। ব্রাহ্মণ পুত্রের ভাগ চাইলেন কিন্তু সেও অস্বীকার করল। তখন নিরুপায় হয়ে পুত্রবধূকে বল্লেন—'মা! তা হলে তোমার ভাগটা দিয়েই অতিথিকে বাঁচাও'।"

"পুত্রবধূটি নিতান্ত ভালমানুষ ছিল। অতিথি সৎকার না করলে শ্বশুরের পাপ হবে এটা তার বিলক্ষণ জানা ছিল। সে খুসী হয়ে তার ভাগটা দিল—ব্রাহ্মণও তাঁর নিজের ভাগ এবং পুত্রবধূর ভাগ দিয়ে অতিথিকে খাওয়ালেন।"

এই গল্প বলে বররুচির মেয়ে বল্ল—"মহারাজ! সেই ব্রাহ্মণ হচ্ছেন আপনি—নিজে উপবাসী থেকে অতিথি সৎকার করে যে পুণ্য করেছিলেন সেই পুণ্যের বলে এখন পৃথিবীর রাজা বিক্রমাদিত্য হয়েছেন। বটগাছের পেত্নী হচ্ছে ব্রাহ্মণের স্ত্রী সেই ব্রাহ্মণী; কলুর একচক্ষু এঁড়ে গরু হচ্ছে ব্রাহ্মণের পুত্র—আর আমি হচ্ছি আপনার পুত্রবধূ।"





তিন নম্বরের ঘর

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়

ক

বেড়াতে এসেছি। পুরী। আমি আর শচীন দুই বন্ধু।

সমুদ্রের ধারে একটি হোটেল ছিল—"সাগর-পুরী"। শচীন আগে আর একবার এই হোটেলে এসে উঠেছিল। এবারেও সে আমাকে নিয়ে সেইখানে গিয়ে হাজির হ'ল।

"সাগর-পুরী"র ম্যানেজার দুঃখপ্রকাশ ক'রে বললেন, তাঁর হোটেলের কোন ঘরই খালি নেই।

শচীন বললে, "মশাই, আমি আপনাদের পুরাণো খরিদ্দার। কিন্তু এখানে যখন ঠাঁই নেই, তখন আমাকে বাধ্য হয়ে অন্য হোটেলেই যেতে হবে।"

ম্যানেজার বললেন, "এবারকার পূজোর মর্সুমে পুরীর কোন হোটেলেই তিলধারণের ঠাঁই নেই। যাবেন কোথায়?"

শচীন হতাশ ভাবে বললে, "তাহ'লে উপায় ?"

ম্যানেজার খানিক ভেবে বললেন, "আপনি যখন আমাদের পুরাণো খদ্দের, তখন উপায় একটা করতে পারি। কিন্তু একটু কষ্ট হবে।"

শচীন বললে, "হোক্ কষ্ট। এই বিদেশ-বিভূঁয়ে চেনা জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে মন সরছে না।"

ম্যানেজার বললেন, "আমাদের রান্নাঘরের পাশে ছোট একখানা কুঠরী আছে। সেখানে থাকতে পারবেন ?"

শচীন বললে, "খুব পারব।"

ম্যানেজার বললেন, "তবে আসুন।"

একখানা কয়লা রাখবার কুঠরীর মত খুব ছোট্ট ঘর। সমুদ্রের ধারেও সেখানে আলো-হাওয়া ঢোকে না। তার বদলে সর্ব্বদাই সেখানে রান্নাঘরের নানা রকম গন্ধ, ধোঁয়া আর উত্তাপ এসে ঢোকে।

বৈকাল হ'তে না হ'তেই শচীনের সহ্যশক্তি নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল। মাথা নেড়ে বললে, "উঁহু, এ অসম্ভব! আমরা কেউ ইট কি পাথর নই। এখানে থাকলে মারা পড়ব।"

আমি বললুম, "তাহ'লে কোথায় যাবে ?"

শচীন বললে, "যেখানে মানুষ থাকে। গেল-বারে এই হোটেলের সবচেয়ে ভালো ঘরে আমি ছিলুম। এবারেও সেই ঘরে থাকতে সাধ হচ্ছে।"

আমি বললুম, "তোমার সাধ চাঁদ ধরবার সাধের মতন। এ সাধ মিট্‌বে না, কারণ সে ঘর এখন অন্য লোকের দখলে।"

শচীন মাথা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে বললে, "সেই তো হচ্ছে সমস্যা!"

তখন বেলা সাড়ে-পাঁচটা, উপর থেকে চা পান করবার জন্যে ঘণ্টার আওয়াজ এল।

শচীন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "চল, খানিকক্ষণ ভালো ঘরে গিয়ে গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে আসি।"



খাবার ঘরের জান্‌লা দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখি, আকাশে মেঘের পরে মেঘ জমেছে।

চা-পান শেষ হবার আগেই সারা আকাশ মেঘের কাজলে এমন কালো হয়ে গেল যে, তার ছায়ায় সমুদ্রের গায়ে নীল-রঙের একটুও চিহ্ন রইল না। চারিদিকে অকাল-সন্ধ্যা নেমে এল, তারপরেই বাজের বাজ্‌না আর বিজলীর রোশ্‌নাইয়ের সঙ্গে-সঙ্গে ঝম্‌-ঝম্‌ বৃষ্টি সুরু।

টেবিলের ধারে ব'সে যাঁরা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলেন, একে একে তাঁদের অনেকেই অদৃশ্য হলেন। আমরা দুজন ছাড়া আরো যে-তিনজন লোক তখনো স্থানত্যাগ করলেন না, তাঁদের একজন হচ্ছেন কলকাতার কোন সওদাগরী আপিসের মাঝবয়সী বড়বাবু, আর-একজন হচ্ছেন কল্‌কাতার কোন ইস্কুলের বুড়ো মাষ্টার-মশাই এবং আর-একজন হচ্ছেন কলকাতার কোন কলেজের নব্য ছাত্র।

জল-ঝরা অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি বললুম, "এম্‌নি বাদ্‌লার দিনে ভূতের গল্প বেশ জমে।"

নব্য ছাত্রটি নাক সিঁট্‌কে বললেন, "আমি ভূত মানি না।"

মাঝ-বয়সী বড়বাবু বললেন, "আমি ভূত মানি। ভূতকে ভয় করি। আমার বুকের ব্যামো আছে,—ভূতের গল্প শুনলে বুক ঢিপ্‌-ঢিপ্‌ করে।"

বুড়ো মাষ্টার-মশাই বললেন, "আমি ভূতের গল্প শুনতে খুব ভালোবাসি। কিন্তু সত্যি ভূতের গল্প।"

শচীন এতক্ষণ কি-যেন ভাবতে ভাবতে অপলক চোখে বড়বাবুর মুখের পানে তাকিয়ে ছিল। এখন হঠাৎ মুখ খুলে বললে, "আমি একটা খুব-সত্যি ভূতের গল্প বলতে পারি। এ ভূতটাকে আমি নিজের চোখে দেখেচি।" কিন্তু উনি যে ভূতকে ভয় করেন—তার ওপরে ওঁর নাকি আবার বুকের ব্যামো।"

বড়বাবু বুকে হাত দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, অনেক দিনের ব্যামো। সত্যি ভূতের গল্প শুনলে হয়তো ভিরমি যাব।"

নব্য ছাত্রটি বাঁকা চোখে বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি ভূত মানি না,—কিন্তু সময় কাটাবার জন্যে ভূতের গল্প শুনতে রাজি আছি।"

মাষ্টার-মশাই বললেন, "ভোটে গল্প শোনার লোকই বেশী হ'ল। আপনার সত্যি ভূতের গল্প বলুন।"

চাকর ঘরে আলো জেলে দিয়ে গেল। বড়বাবু হতাশ চোখে একবার সকলের মুখের পানে তাকিয়ে, চেয়ার টেনে একেবারে আলোর কাছে স'রে গিয়ে বস্‌লেন।

শচীন গল্প বলতে লাগল! আকাশও তখন মেঘ-বিদ্যুৎ-বৃষ্টির গল্প ভালো ক'রে জমিয়ে তুলেছে!

গ

"গল্পের নায়ক হচ্ছি আমি। কিন্তু গল্পের ঘটনাস্থলের নাম আমি বলব না। সত্যি ভূতের গল্পে ঘটনাস্থলের নাম বলতে নেই। তবে একটা কথা শুনে রাখুন, এই গল্পের ভূতটিকে দেখেছিলুম এই হোটেলেরই মতন আর একটা হোটেলে।"

বড়বাবু চম্‌কে উঠে বললেন, "তাই নাকি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। সেবারেও আমি পূজোর সময়ে বেড়াতে বেরিয়ে সেই হোটেলে গিয়ে উঠেছিলুম। আমি যে ঘরখানি পেলুম সেখানি বেশ বড়সড়।

তার পাঁচটা জান্‌লা আর দুটো দরজা। ঘরখানি হোটেলের দোতালায়, আর ঠিক সিঁড়ির ডান পাশে।"

বড়বাবু বিড়্‌ বিড়্‌ ক'রে বললেন, "হোটেলের দোতালায়, সিঁড়ির ডান-পাশের ঘর—"

—"হ্যাঁ। ঘরের ভিতরকার বর্ণনাও একটু দিতে হবে—সত্যি গল্প কি না! দক্ষিণ দিকে ছিল একখানা লোহার খাট। আর একদিকে দুটো দেয়াল-আল্‌মারি। আর-একদিকে ছিল চৌকো আয়না-বসানো একটা 'ড্রেসিং-টেবিল'। তার সামনে একখানা কাঠের চেয়ার। সে ঘরে একখানা ইজি-চেয়ারও ছিল। একটা দরজার মাথায় কুইন ভিক্টোরিয়ার ছবি ছাড়া আর কোথাও কোন ছবি ছিল না।"

মাষ্টার মশাই অধীর ভাবে বললেন, "ভূত কোথায় মশাই, ভূত কোথায়? এত ঘরের বর্ণনা কেন?"

—যদিও ঘটনাস্থলের নাম বললুম না, তবু ঘরের বর্ণনাটা শুনে রাখুন। বিদেশের কোন হোটেলে এ-রকম ঘর দেখলে আগে থাক্‌তেই সাবধান হ'তে পারবেন।.........এখন শুনুন। সে ঘরখানার ভিতরে দিনের বেলাটা আমার দিব্যি আরামে কেটে গেল। কিন্তু ঘরের ভিতরে যেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল,—অম্‌নি কেন জানিনা, আমার মনটা কেমন ছাঁৎ-ছাঁৎ করতে লাগল! সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা অজানা ভয় পা টিপে টিপে সেই ঘরের ভিতরে এসে ঢুকে পড়ল! যেন অদৃশ্য একটা বিভীষিকা ছায়ার মতন আমার পিছনে পিছনে ফিরতে লাগল। যেন দেখা যাচ্ছে না, এমন দুটো স্থির স্থির আড়ষ্ট চোখ ড্যাব্‌-ড্যাব্‌ ক'রে আমার পানে তাকিয়ে রইল তো তাকিয়েই রইল!

আমি ভীতু লোক নই, তবু কিছুতেই মন থেকে এই ভয়-ভয় ভাবটা তাড়াতে পারলুম না। মনকে অনেক প্রবোধ দিলুম, অন্যমনস্ক হবার জন্যে বার বার

চেঁচিয়ে গান গাইতে লাগলুম, কিন্তু মন আমার শান্ত হ'ল না। তখন তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে প'ড়ে এই অজ্ঞাত ভয়টাকে ভোলবার চেষ্টা করলুম।

ঘুম আমাকে সব ভুলিয়ে দিলে বটে—কিন্তু বেশীক্ষণের জন্যে নয়। গভীর অন্ধকারের ভিতরে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল! জেগে উঠেই বুঝলুম, আমার ঘুম স্বাভাবিক ভাবে ভাঙেনি। ঘরের ভিতরে একটা-কিছু বিপদ এসে উপস্থিত হয়েছে—এই কথাটাই তখনি আমার মনে হ'ল।"

শচীন এইখানে থামল। বাইরে তখন অবিরাম চলেছে বজ্রের হুঙ্কার, সমুদ্রের গর্জ্জন, বৃষ্টিধারার কান্না ও ঝোড়ো-হাওয়ার হাহাকার! দম্‌কা বাতাস মাঝে মাঝে ঘরের ভিতরেও এসে ঠাণ্ডা জলের ছিটে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে!

মাষ্টার-মশাই রুদ্ধশ্বাসে ব'লে উঠলেন, "ওকি মশাই, এমন জায়গায় এসে থাম্‌লেন কেন?"

বড়বাবু দুই চোখ মুদে বললেন, "আমার বুক টিপ্‌-টিপ্‌ করচে!"

ছাত্রটি বললেন, "আমি ভূত মানি না।"

শচীন আবার আরম্ভ করলে :—

"কোথাও একটি পাতা-নড়ার শব্দও নেই এবং রাত করছে ঝাঁ ঝাঁ! আগেই বলেছি, আমার ঘুম ভাঙল গভীর অন্ধকারের ভিতরে। কিন্তু আপনারা বললে বুঝতে পারবেন কিনা জানিনা। সে অন্ধকার কালো অন্ধকার নয়, সে যেন আলোময় অন্ধকার। কারণ ঘরে বাতি জ্বল্‌ছিল না, খোলা জান্‌লা দিয়ে একটুও চাঁদের কিরণ আসছিল না, তবুও অন্ধকারের ভিতরেই বায়স্কোপের ছবির মত স্পষ্ট হয়ে উঠল, ঘরের সেই ড্রেসিং-টেবিলটা! স্তম্ভিত ভাবে দেখলুম, টেবিলের আয়নার সামনে, আমার দিকে পিছন ফিরে চেয়ারের উপর ব'সে আছে একজন লোক! আয়নার ভিতরে তার মুখও আমি দেখতে পেলুম—সম্পূর্ণ

তিন-নম্বরের ঘর
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়

অচেনা মুখ! তার নাকের তলায় দুর্গা-ঠাকুরের অসুরের মতন মস্তবড় গোঁফ আর তার ভয়ঙ্কর দুটো চোখ যেন জ্বলন্ত ভাঁটার মত! তার ডানহাতে একখানা চক্‌চকে খুর,—আর সেই খুর দিয়ে নিজের গলা সে নিজেই কাটছে! হঠাৎ ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল—এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়ানক দৃশ্যটা আবার মিলিয়ে গেল! ঘর আবার অন্ধকার এবং সেই অন্ধকারে কার পায়ের শব্দ পেলুম। কে যেন ড্রেসিং-টেবিলের দিক থেকে আমার বিছানার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে! আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না, এক লাফে বিছানা ছেড়ে নেমে, কোন রকমে দরজা খুলে ঘরের বাইরে পালিয়ে গেলুম!"

পরের দিন সকালে খোঁজখবর নিয়ে জান্‌লুম, "সেই হোটেলের তিন-নম্বরের ঘরে একজন লোক আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু হোটেলের ম্যানেজার আমার কাছে কোনমতেই সে কথা স্বীকার করলে না।"

বড়বাবু হঠাৎ চেয়ারের উপরে আড় হয়ে প'ড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে চিঁ চিঁ ক'রে বললেন, "আমার বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করচে। আমি ভিরমি যাব।"

মাষ্টার-মশাই আর নব্য ছাত্রটি ব্যস্ত হয়ে তাঁর কাছে ছুটে গেলেন।

শচীন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "দেখচি ওঁর সাম্‌নে ভূতের গল্প বলা আমার উচিত হয় নি!"

৯

রাত তখন সাড়ে নয়টা। আমি আর শচীন আমাদের অন্ধকূপে ব'সে আছি, এমন সময়ে হোটেলের একটা চাকর এসে আমার হাতে এক টুকরো কাগজ দিয়ে বললে, "ম্যানেজার বাবু দিলেন।"

কাগজে ম্যানেজার বাবু লিখেছেন:

"হোটেলের তিন-নম্বরের ঘর হঠাৎ খালি হয়েছে। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন তাহ'লে তিন-নম্বরের ঘরে উঠে আসতে পারেন।"

শচীন দুষ্টুমির হাসি হাসতে হাসতে বললে, "এ আমি আগেই জানতুম!"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, "কেমন ক'রে?"

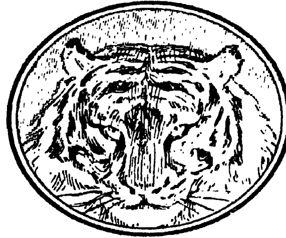
শচীন বললে, "হোটেলের দোতালায়, সিঁড়ির ডানপাশের ঐ তিন-নম্বরের চমৎকার ঘরখানিতে আমি গেল-বারে এসে থেকে গিয়েছি। আজ দুপুরেও ওঘরে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে এসেচি, ও-ঘরের আসবাবগুলো ঠিক আগেকার মতই সাজানো আছে। ঐ ঘরেই বড়বাবু ছিলেন।"

—"তার মানে?"

—"তার মানে, তুমি একটি আস্ত গাড়ল! এতক্ষণেও এটা বুঝলে না যে, বড়বাবুকে তাড়াবার জন্যেই আমার ভূতের গল্পে তিন-নম্বরের ঘরের বর্ণনা স্থান পেয়েছে?"

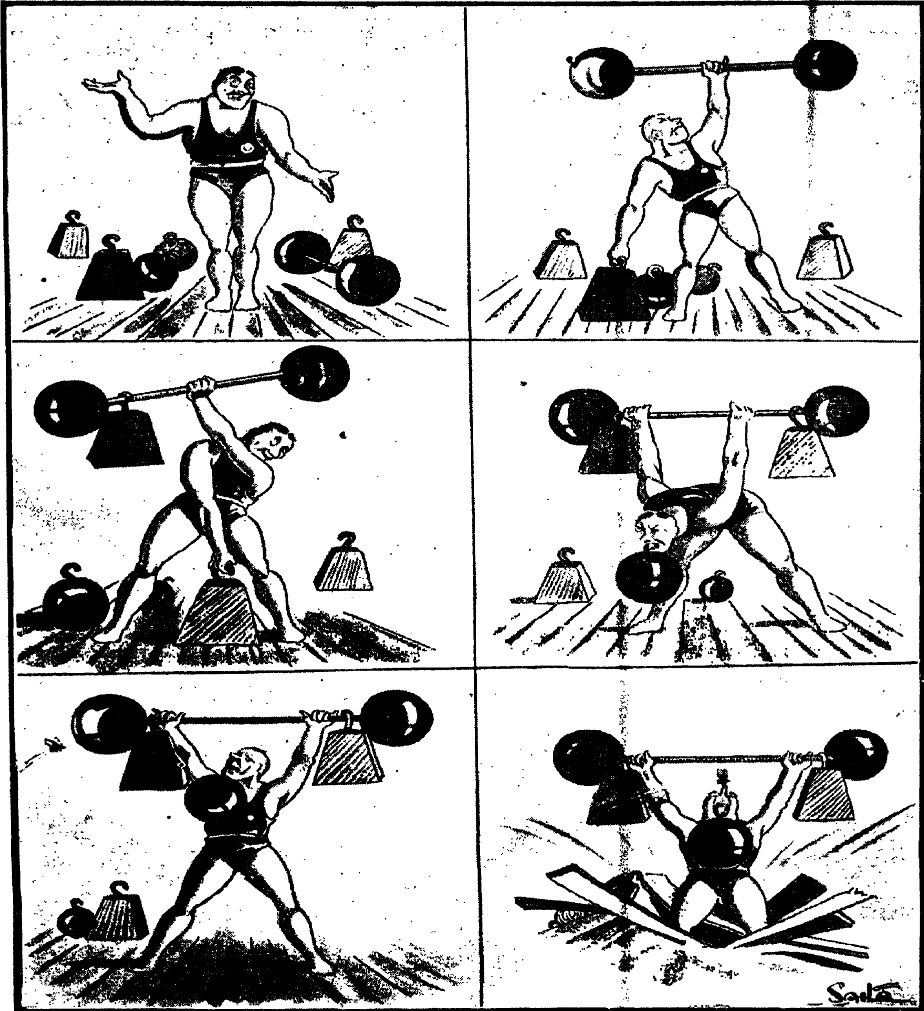
—"তাহ'লে তোমার সত্যি ভূতের গল্পটা—"

—"একেবারে গাঁজাখুরি।"*



* এই গল্পে বিদেশী গল্পের একটুখানি ভাব নেওয়া হয়েছে

—এক নিশ্বাসের গল্প—



অনায়াসে ভার তোলে, নাই কোন গোল তায়,
বিভ্রাট বাধা'ল যে, শুধু ঐ বোতলায়।

সাপের ওষুধ



শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়

হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের বোধহয় ইচ্ছা ছিল আমাদের সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ক'রে তোলেন। "কি ক'রে রেলের ইঞ্জিন্ চলে বল!" "মুর্‌গী কেন ডিমে তা দেয় জান কি?" "জোনাকি ধর্‌লে হাত পুড়ে যায় না কেন?" "মাছেরা জলে ডুবে নিঃশ্বাস নেয় কি ক'রে, আর খোলা বাতাসে খাবি খেয়েই বা মরে কেন?" আচ্ছা বাপু, অত খবরে আমাদের দরকার কি? মহা বিপদ! ক্লাসের পড়া কর্‌লেই নিস্তার নেই; দুনিয়ার সব খবর মাথায় বোঝাই করে বেড়াতে হবে।

ছেলেদের সঙ্গে থাক্‌লে তাদের বেশী উপকার হবে ভেবে হেড্‌মাষ্টার মহাশয় এসে আমাদের বোর্ডিংএ বাসা বাঁধ্‌লেন। সঙ্গে এল তাঁর ছেলে জনার্দ্দন। অমন সাংঘাতিক নাম রাখার কারণ, হেডমাষ্টার মহাশয়ের বিশ্বাস ছিল যে, মিষ্টি মিষ্টি নাম রাখ্‌লে ছেলেদের গায়ে জোর কম হয়, চোখে চশমা ওঠে আর তারা পাকা কুঁড়ে আর অকর্ম্মা হ'য়ে থাকে। জনার্দ্দনের কুচ্‌কুচে কালো রং, মাথার চুলে কদম ফুলের ছাঁট, চোখ একটু ট্যারা, আর কান দুটো দু'পাশে সাইন বোর্ডের মত বাইরে বের করা। হরিপদ বলেছিল যে, সে নাকি তাকে কান নেড়ে নাকের উপর থেকে মাছি তাড়াতে দেখেছে। কিছুই আশ্চর্য্য নয়! কিন্তু, জনার্দ্দন কথাটা শুনে খুব রাগ ক'রেছিল।

সাপের ওষুধ

শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়

জনার্দ্দন হেডমাষ্টার মহাশয়ের উপযুক্ত ছেলে। সে পৃথিবীর সব কিছুর মানে জানে। মানুষে নাক দিয়ে দেখ্‌তে পায় না কেন তা জনার্দ্দন ব'লে দিতে পারে। সে সব ফুলের নাম জানে; আমাদের গায়ে ক'টা হাড় আছে আর কোন্‌টা কি জন্যে আছে তাও সে জানে। ছেলেকে বিদ্যে দেখাবার সুবিধে করে দেবার জন্যেই বোধহয় মাষ্টার মহাশয়ের প্রশ্ন করার উৎসাহ হঠাৎ ভীষণ বেড়ে উঠ্‌ল। সে দিন কেলো, মোটরকার দম্‌ দিয়ে চালান হয় ব'লে জব্দ হয়ে গেল। জনার্দ্দন হেসে বল্লে, "দূর গাধা! পেট্রোল, কার্‌বুরেটার, সিলিণ্ডার, গিয়ার, গ্যাস্‌, স্পার্ক—" আরও দেড় লক্ষ নাম এক নিশ্বাসে ব'লে তবে সে থাম্‌ল! কেলো বেজায় রেগে তার কান ধরে দিল এক টান্‌। বল্লে, "থাক্‌ না! আমি নিজে দেখেছি সাম্‌নে একটা হাতল দিয়ে মোটরকারে দম দেয়। সেটা কি খেলা কর্‌বার জন্যে নাকি?" হেডমাষ্টার মহাশয় কেলোকে দিলেন বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে।—জনার্দ্দনটাকে জব্দ করতে হবে।

আজ ক'দিন থেকে হেড্‌মাষ্টার মহাশয় আমাদের ডাক্তারী শেখাচ্ছেন। সেদিন দু'ঘণ্টা ধরে (খেলার সময়) আমাদের যেখানে-সেখানে থুথু ফেলা, স্নান করা, দাঁত মাজা, আলু্‌ সেদ্ধ খাওয়া, নাক ঢেকে ঘুমান, পেট ভরে খাওয়া, বিছের কামড়, হাত ভাঙ্গা, নেউল, পোকা আরও কত কিছু নিয়ে বুঝিয়েছেন। শেষ অবধি আমাদের খেলা হ'ল না। এদিকে জনার্দ্দন দেওয়ালের উপর ব'সে আখ চিবাচ্ছিল। ওকে দেখে নেব!

পরশুদিন সারা সকাল সাপের কামড় নিয়ে এক বক্তৃতা শুনেছি। আমরা সব এখন এক একজন সাপের ওঝা বল্লেও চলে। সাপে কাম্‌ড়ালেই কি কর্‌তে হয় জান? খুব ক'সে কামড়ের কয়েক ইঞ্চি উপরে দু'তিনটে বাঁধন লাগাতে হয়। তারপর কামড়ের দাগ বরাবর ছুরি দিয়ে আচ্ছা ক'রে চিরে দিতে হয়। আর সেই চেরা যায়গায় বেশ ক'রে 'পোটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট' ব'লে এক

ওষুধ আছে, তাই লাগাতে হয়। আর রোগীকে খুব সজাগ রাখ্‌তে হয়। ঘুমলেই মরণ।

আজ ক'দিন থেকে জনার্দ্দনকে সিধে কর্‌ব ভাবছি, কিন্তু সেটা এমন ভীতু, না আসে অন্ধকারে ছাদের উপর, না খেলে কোন খেলা, যে কিছু একটা কর্‌ব। কিন্তু, কাল বিকেলে ওকে অনেক ব'লে ক'য়ে বাগানের দিকে নিয়ে গেলাম। আমরা চারজন ছিলাম ;— জনার্দ্দন, কেলো, ঝণ্টু আর আমি। কোথাও কিছু নেই কেলো খুব ভয় পাওয়ার মত গলা ক'রে ব'লে উঠ্‌ল, "এইরে! ঐ গাছটার উপর থেকে দুটো পেত্নীর ঠ্যাং ঝুল্‌ছে! ধর্‌লে বুঝি!"



ভোর চারটে অবধি জনার্দ্দনের শাস্তি চল্‌ল।

যেই না বলা, জনার্দ্দন অমনি বিকট চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল, "ওরে বাপরে! গেলাম, গেলাম! কামড়াল বুঝি!" আমরাও তক্ষুণি জনার্দ্দনকে চিৎ ক'রে ফেল্লাম। কেলো ওর মাথার উপর বস্‌ল, আর ঝণ্টু ওকে খুব ভীষণ কাতুকুতু দিতে লাগ্‌ল। একে ভূতের ভয়, তার উপর কাতুকুতু আর দম বন্ধ! জনার্দ্দন খুব বিশ্রী গোঁ গোঁ শব্দ কর্‌তে লাগ্‌ল।

সাপের ওষুধ

শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়

গোলমাল শুনে হেড্‌মাষ্টার মহাশয় তাঁর ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলেন। বেরতে গিয়ে, মালিদের একটা উপুড়-করা ঘড়ায় হোঁচট খেয়ে তাঁর ভীষণ রাগ চড়ে গেল। তিনি চীৎকার ক'রে বল্লেন, "কি হয়েছে, বাঁদর সব ?"

আমি ভয়ে বল্লাম, "আজ্ঞে, স্যার, জনার্দ্দন কেমন কর্‌ছে ; ওকে বোধহয় কিছুতে কাম্‌ড়িয়েছে।" জনার্দ্দন কি একটা তাড়াতাড়ি বল্‌তে গেল ; কিন্তু হেড্‌মাষ্টার মশায় তাকে ভয়ানক তাড়া দিয়ে বল্লেন, "চুপ করে থাক ! ন'ড়ো না ! আমি আস্‌ছি !"

তিনি দৌড়ে নিজের ঘরের ভিতর থেকে খানিকটা দড়ি, একটা ছুরি আর একটা বোতল নিয়ে এলেন। জনার্দ্দন তখনও ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে, আর কেলো ওর পেটের উপর হাঁটু দিয়ে বসে গুন্ গুন্ কি যেন গাইছে।

হেড্‌মাষ্টার মশায় আমাদের সকলকে তাড়া দিয়ে বল্লেন, "খুব ক'সে ওর পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেও।" আমরা ত তাই চাই। এইসান্ কসে বাঁধ্‌লাম যে, জনার্দ্দন হাঁউ মাঁউ করে কেঁদে উঠ্‌ল। ওর বাবা ওকে এক চড় মেরে বল্লেন, "থাম্ শীগ্গির, কাপুরুষ কোথাকার ! খবরদার ঘুমবে না। ঘুমলেই মর্‌বে।" এই বল্‌তে বল্‌তে তিনি জনার্দ্দনের পায়ে সাপের কামড়ের দাগ খুঁজ্‌তে লাগলেন। কিন্তু দাগ কোথায় ?

প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছেন, এমন সময় চোখে পড়্‌ল দুই আঁচড়ের মত দাগ। বোধ হয় আমাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তির ফলে আঁচ্‌ড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আর যায় কোথা ! সেই আঁচড়-বরাবর মাষ্টার মশায় দিলেন ছুরির টান। ছুরিটা আবার পোড়ান হয়েছিল এর মধ্যে। গরম ছুরির খোঁচা খেয়ে মাষ্টার মহাশয়ের পণ্ডিত ছেলের গলা সপ্তমে চড়ে গেল। তার উপরে আবার পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের ধাক্কা। জনার্দ্দন খুব লাফাল, কিন্তু ঝণ্টু তার জুল্‌পি ধ'রে ঝুলে পড়ায় হঠাৎ তার লাফ থেমে গেল।

সাপের ওষুধ

শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়

মাষ্টার মশায় ভাব্‌লেন সাপের বিষের ফল। আমাদের বল্লেন, "সারা রাত ওকে যেমন ক'রে হোক জাগিয়ে রাখ্‌তে হবে। আমরাও ত তাই চাই।

রাত সাড়ে আটটা থেকে ভোর চারটে অবধি জনার্দ্দনের শাস্তি চল্‌ল। সে যতই ঘুমতে চায়, আমরা ততই তাকে দৌড় করাই, চিম্‌টি কাটি আর চুল টেনে দিই।

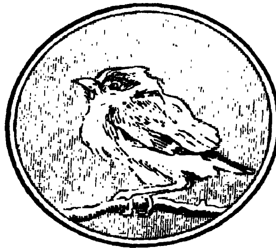
সকাল বেলা হেড্‌মাষ্টার মশায় এসে বল্লেন, "যাক্‌, এ যাত্রা বেঁচে গেলি তুই।" জনার্দ্দিন কেঁদে উঠে বলল, "হ্যাঁ—ভ্যাঁ—তাই বুঝি! আমায় ত সাপে কাম্‌ড়ায় নি!"

হেড্‌মাষ্টার মশায়ের মুখ সাদা হয়ে গেল, তিনি জিজ্ঞেস কর্‌লেন, "তবে অমন ক'রে চেঁচালি কেন?"

জনার্দ্দন বল্‌ল, "আমি ভূতের ভয় পেয়েছিলাম যে।"

মাষ্টার মশায় একেবারে চুপ্‌।

জনার্দ্দন আজ থেকে রোজ অন্ধকার ঘরে বন্ধ থাক্‌বে—ভূতের ভয় সারাবার জন্যে। কিন্তু আমাদের আজ সারাদিন হেড্‌মাষ্টার মশায় কোন প্রশ্ন করেন্‌ নি। এর পরে সম্ভবতঃ আমরা শুধু ক্লাসের পড়া পড়েই নিস্তার পাব।



জীবনের হিসাব

৺সুকুমার রায়চৌধুরী

বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই চড়ি সখের বোটে,
মাঝিরে ক'ন্ "বল্‌তে পারিস্ সূর্য্যি কেন ওঠে ?
চাঁদটা কেন বাড়ে কমে ? জোয়ার কেন আসে ?
বৃদ্ধ মাঝি অবাক হ'য়ে ফ্যাল্‌ফেলিয়ে হাসে।
বাবু বলেন, "সারা জনম মর্‌লিরে তুই খাটি,
জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি আনাই মাটি।"

খানিক বাদে কহেন বাবু, "বল্‌তো দেখি ভেবে,
নদীর ধারা কেম্‌নে আসে পাহাড় হ'তে নেবে ?
বল্‌ত কেন লবণপোরা সাগর ভরা পানি ?"
মাঝি সে কয় "আরে মশাই অত কি আর জানি ?"
বাবু বলেন "এই বয়সে জানিস্‌নেও তা' কি ?
জীবনটা তোর নেহাৎ খেলো, অষ্ট আনাই ফাঁকি।"

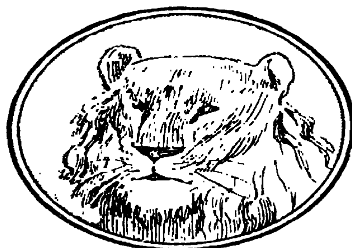
আবার ভেবে কহেন বাবু, "বল্‌ত ওরে বুড়ো,
কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের ঐ চূড়ো ?

জীবনের হিসাব

৺সুকুমার রায়চৌধুরী

বল্‌ত দেখি সূর্য্য চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন ?”
বৃদ্ধ বলে, “আমায় কেন লজ্জা দে’ছেন হেন ?”
বাবু বলেন, “বল্‌ব কি আর, বল্‌ব তোরে কি তা,—
দেখ্‌ছি এখন জীবনটা তোর বারো আনাই বৃথা।”

খানিক বাদে ঝড় উঠেছে, ঢেউ উঠেছে ফুলে,
বাবু দেখেন নৌকাখানি ডুব্‌ল বুঝি দুলে।
মাঝিরে ক’ন্‌ “একি আপদ! ওরে ও ভাই মাঝি,
ডুব্‌ল নাকি নৌকো এবার? মর্‌ব নাকি আজি ?”
মাঝি সুধায়, “সাঁতার জান ?” মাথা নাড়েন বাবু,-
মূর্খ মাঝি বলে, “মশাই, এখন কেন কাবু ?
বাঁচ্‌লে শেষে আমার কথা হিসেব ক’রো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোল আনাই মিছে।”





ভোম্বলদাসের উপাখ্যান

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্ এস্-সি

বাণী ভোম্বলকে বক দেখাইয়াছে। এ অপমান ভোম্বল কিছুতেই সহ্য করিবে না। হ্যাঁ, আপমান বই কি! বাণী যদি চিড়িয়াখানায় গিয়া সেখানে জলের ধারে সাদা সাদা বকদের বেড়াইতে দেখিয়া ভোম্বলকে বলিত, "দাদা, ঐ দেখ্ বক" তাহা হইলে ভোম্বলের কোনও আপত্তি ছিল না। এমন কি সে যদি বাগানে গিয়াও কোন বক ফুলের গাছের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া তার ফুলগুলির দিকে ভোম্বলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত তাহা হইলেও ভোম্বল কিছুমাত্র চটিত না। কিন্তু বাণী ঠিক তা করে নাই। সে চিড়িয়াখানায়ও যায় নাই, বাগানেও যায় নাই, একেবারে প্রকাশ্য দিবালোকে ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ডান হাতের কনুইএর নীচে বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলি সঙ্কুচিত করিয়া ছোঁয়াইয়াছে এবং ভোম্বলকে দেখাইয়া দেখাইয়া ডান হাতের তালু সাপের ফণার মত করিয়া ধরিয়া ইঙ্গিতে বকের চেহারার অনুকরণ করিয়াছে। বাণী ভোম্বলের চাইতে আড়াই বছরের ছোট, সুতরাং এ অপমান অসহ্য।

কিন্তু অপমানের কোনও প্রতিকার হইল না। বয়স অনুপাতে বাণী ভোম্বলের চেয়ে অনেক চালাক—ভোম্বলকে এক হাটে কিনিয়া আর এক হাটে সে বেচিয়া আসিতে পারে। বক দেখাইয়াই সে ঠাকুরমার নিরাপদ কোলে গিয়া লুকাইয়াছে। একমাত্র নাতনী হওয়ায় সেখান হইতে তাহাকে অপসারিত

করিবার সাধ্য ভোম্বলের কেন, ভোম্বলদের বাড়ীর কাহারও নাই। অতএব ঠাকুরমার আহ্নিকের সময় পর্য্যন্ত বাণী নিশ্চিন্ত। তার পর? তার পর এই 'বলকা-দর্শনের' স্মৃতি সম্ভবতঃ ভোম্বলের মনে থাকিবে না—ভোম্বলের যা ভোলা মন!

কিন্তু ভোম্বল আজ চটিয়াছে, বাস্তবিকই চটিয়াছে। এবং শুধু চটা নয়,



মনে মনে আজ সে অনেকগুলি সঙ্কল্পও করিয়া রাখিয়াছে, সেগুলি কাজে খাটাইতে পারিলে ব্যাপার নিশ্চয়ই খুব গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে। "কিন্তু বাণীটা—" ভোম্বল মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "ঐ তো চেহারা, জোরে একটা টিপি দিলেই যে চিঁড়ের মত চেপ্টা হইয়া যাইবে—তার সাহসটা দেখিয়াছ? আর এই

বাণীকেই কিনা সে সেদিনও তিনটা বড় বড় লজেঞ্চুষ ঘুষ দিয়াছে! আদরের নাতনী বলিয়া না হয় ঠাকুরমা বাণীর কথা একটু বেশী শুনেন, কিন্তু সেও তো নাতি, একেবারে ফেলনা সম্পর্ক নয়। নিজেও সে অনায়াসে যাইতে পারিত শুধু তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করিবার জন্যই না সে নিজে না গিয়া বাণীকে দিয়া কথাটা ঠাকুরমার কাছে পেশ করাইতে চাহিয়াছিল। আর ও কিনা অম্লান বদনে তার কাছে আরও তুই তুইটা লজেঞ্চুষ ঘুষ স্বরূপ চাহিয়া বসিল! এবং না দেওয়াতে অবশেষে বক দেখাইয়া অপমান করিল! ভুল—ভুল করিয়াছে সে। ভোম্বল মনে মনে ভাবিতে লাগিল; সেই তো বাণীকে ঘুষ দিয়া দিয়া তাকে মাথায় তুলিয়াছে—বাণীর লোভ বাড়াইয়া দিয়াছে সে-ই; বাণীর কি দোষ? এ তার নিজেরই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত।

বাস্তবিক এই ভুল জিনিষটাই তার জীবনের সুখ-শান্তি কাড়িয়া লইল। ভোম্বল ভাবিয়া দেখিল জীবনে সে প্রত্যেক পদে পদে ভুল করিয়া আসিতেছে এবং এজন্য তাকে দৈহিক, মানসিক, আর্থিক কত না যন্ত্রণা সহিতে হইতেছে। এই তো সেদিনকার একটা কথা ধর না। "ট্রেজার আইল্যাণ্ড" বইখানা কে না পড়িয়াছে? সেই যে যার মধ্যে আছে কোন্ এক ক্যাপ্‌টেন ডাকাতি করিয়া বহু ধনরত্ন উপার্জ্জন করে এবং সেগুলি রাখিবার জায়গা না পাইয়া অবশেষে এক নির্জ্জন দ্বীপে গিয়া ছয় জন সঙ্গীসহ এক জায়গায় গর্ত্ত খুঁড়িয়া পুঁতিয়া রাখিয়া আসে। সঙ্গীরা যাহাতে বিশ্বাসঘাতকতা না করিতে পারে সেজন্য সে আসিবার সময়ে সকলেরই মাথা সেই দ্বীপের এক কোণায় কাটিয়া রাখিয়া আসে। কী রোমাঞ্চকর গল্পটা! সেদিন ভোম্বল আর তার বন্ধু দাশু একত্র গল্পটি পড়িল। তার কয়েক দিন পরেই ভোম্বলের কয়েক আনা পয়সা লাভ (ডাকাতি করিয়া নয়, সাধু ভাবেই) হইল। কিন্তু পয়সাগুলি নিরাপদে রাখা যায় কোথায়? ভোম্বলের তো আলাদা বাক্স নাই—তা ছাড়া বাণী, নিমাই এদের জ্বালায় সে আল্‌গা

রাখিতেও সাহস পায় না। দাশুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া 'সেই ট্রেজার আইল্যাণ্ডে'র ক্যাপ্টেনের মত দু'জনে বাগানে গিয়া এক নির্জ্জন জায়গায় পয়সাগুলি পুঁতিয়া রাখিয়া আসিল। গল্পের মত সবই হইল শুধু একটা জায়গায় ভুল হইয়া গেল। ক্যাপ্টেনের মত ভোম্বল তার সঙ্গীর মাথাটা কাটিয়া রাখিয়া আসিতে ভুলিয়া গেল। ব্যস্, কয়েক দিন পরে কি একটা দরকারে পয়সা আনিতে গিয়া দেখে সেখানে কিছুই নাই! তখন ভোম্বলের খেয়াল হইল সত্য সত্যই মস্ত একটা ভুল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তখন 'টূ লেট'। মাঝখান হইতে দাশুর মত একজন 'করিৎ-কর্ম্মা' লোকের সঙ্গে বন্ধুবিচ্ছেদ হইয়া গেল।

শুধু কি এই একবার? অঙ্কের ভুলের জন্য প্রায়ই তো তাকে ক্লাসে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। বানান ভুলের জন্য প্রমোশন লইয়া টানাটানি বাধে, খেলিতে খেলিতে স্কুলে যাইবার কথা ভুলিয়া যাওয়ায় প্রায়ই হেড্মাষ্টার মশায়ের কাছ হইতে বাবার নামে বড় বড় চিঠি আসে। তারপর বাবা কোর্ট হইতে ফিরিবার সময়ে লুকাইয়া থাকিতে ভুল হইয়া যায় বলিয়া পিঠের উপর চড়চাপড়ও সহিতে হয় বিস্তর। কিন্তু তবুও যদি তার ভুল ভাঙ্গে! এমন ভাবে আর কতদিন চলিবে?

যাক্, ওসব পুরানো কথা টানিয়া আনিয়া লাভ নাই। কয়েক দিন পরের কথা বলি। রাত তখন ন'টা হইবে। দক্ষিণের বারান্দায় বাড়ীর ছেলে-বুড়ো সকলে একত্রে খাইতে বসিয়াছে। সকলে একত্রে খাওয়া এ বাড়ীর বরাবরকার নিয়ম। কিন্তু সকলের সঙ্গে একত্র ধীরেসুস্থে খাওয়া এবং আগে খাওয়া শেষ হইলে অপর সকলের খাওয়া না হওয়া পর্য্যন্ত ভরপেট লইয়া চুপ্টি করিয়া বসিয়া থাকাটাই যে সভ্য সমাজের নিয়ম ভোম্বলের সেটা প্রায়ই খেয়াল থাকে না। প্রায়ই সকলের আগে তার খাওয়া হইয়া যায় এবং খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র কৈ মাছের মত তিড়িং করিয়া সে পিঁড়ি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। ফলে ভাইবোনেরা

সমস্বরে 'অসামাজিক, অসামাজিক' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠে এবং অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠেরা আর এক ধাপ উপরে যান, তাদের প্রচণ্ড ধমকে বেচারা ভোম্বলের মুখটা এতটুকু হইয়া পড়ে।

আজও ভোম্বল বরাবরকার মত গোগ্রাসে ভাত গিলিতেছিল। ভোম্বলের বাবা ধমক দিয়া বলিলেন, "খাচ্ছে দেখ! খাচ্ছে না গিলছে। চেহারাও হচ্ছে তেমনি, দিনকে দিন প্যাঁকাটির মত। আরে, ওতে কি হজম হয়? জানিস্, ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ প্রত্যেকটি গ্রাস বত্রিশ বার ক'রে চিবিয়ে তবে গিলতেন। চেহারাও ছিল তেমনি—বিরাশী বছর বয়সেও অত বড় একটা রাজ্য চালাবার গুরুভার মাথায় নিয়েছিলেন।" ভোম্বল আপত্তি জানাইল। সে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে এক সজনে-ডাঁটা ছাড়া কোনও জিনিষ বত্রিশ বার চিবান যায় না, তার অনেক আগেই গলিয়া পেটের ভেতর চলিয়া যায়। গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের যদি বাস্তবিকই বত্রিশ বার করিয়া চিবাইবার অভ্যাস থাকিয়া থাকিত, তবে তিনি নিশ্চয়ই শুধু সজনে-ডাঁটা খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন।

ভোম্বলের বড়দা বিজয় বলিল, "ভোম্বলকে ভূপেন কাকার সঙ্গে খেতে বসিয়ে দিতে পারলে মজা হ'ত। ভোম্বলের খেতে লাগ্‌ত পাঁচ মিনিট, ভূপেন কাকার দেড় ঘণ্টা—এক ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট 'এন্‌ডিওরেন্স্ সিটিং'।" ভূপেন কাকার নাম করিতেই ভোম্বলের বাবা বলিয়া উঠিলেন, "আরে, তোদের বলতেই ভুলে গেছি। ভূপেন আসছে যে! বহুদিন দেখাসাক্ষাৎ হয় নি ওর সঙ্গে, তাই একবার ঘুরে যাবে লিখেছে। কিছুদিন থেকেও যাবে বোধহয়।" ছেলেদের খাওয়া সেদিন সেখানে বন্ধ হইয়া গেল।

তারপর কয়েক দিন ধরিয়া বাড়ীতে ছেলে-মহলে শুধু ভূপেন কাকার কথা ছাড়া অন্য আলোচনা নাই। ভোম্বল, বাণী প্রভৃতি বর্ত্তমান স্কুল-যাত্রী ছেলে-

ভোম্বলদাসের উপাখ্যান

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এম্, এস্-সি

মেয়েরা অবশ্য ভূপেন কাকাকে এ পর্য্যন্ত দেখে নাই, তবে শুনিয়াছে এবং অত্যন্ত ভীতিপূর্ণ চিত্তে শুনিয়াছে। ভোম্বলের বড়দা', মেজদা', বড়দি' প্রভৃতি যারা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক—অর্থাৎ কলেজ কিংবা বিবাহের বেড়া উত্তীর্ণ হইয়াছে—ভূপেন কাকার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় কেবল তাদেরই। উঃ, কী বেরসিক এই ভূপেন কাকাটি! যেমন চেহারা তেমনি স্বভাব। মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কোথাও এতটুকু রস-কষ নাই। কদম ফুলের মত চুল, ডাম্বেলের মত নাক, হিপোপটেমাসের মত গলা, কচ্ছপের মত পেট এবং কলাগাছের মত দুই ঠ্যাং। তাও যদি মেজাজটা একটু মোলায়েম হইত? ছেলেমহলে তিনি একটি মূর্ত্তিমান্ বিভীষিকা, ভোম্বলদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াও তাঁর কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না। প্রথম দিন আসিয়াই হয়তো তিনি ছেলেমেয়েদের একত্র ডাকিয়া পাঠান। কলিকাতা হইতে ভূপেন কাকা আসিয়াছেন—না জানি তাদের কি সব 'প্রেজেণ্ট' দিবার জন্য ডাকিতেছেন, ভাবিয়া তারা পুলকিত চিত্তে উঠি-পড়ি করিয়া ছুটিয়া আসে। কিন্তু ভূপেন কাকা প্রেজেণ্ট্-টেজেণ্ট্ কিছুই দেন না—দেন হয়তো 'ডিসিপ্লিন্' সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা। তার পর যে ক'দিন থাকেন বেচারাদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তোলেন। বড়দের তো যখন-তখন গল্পের বই পড়িতে বাধা নাই (থাকিবেই বা কেমন করিয়া, তাঁদের তো টেক্স্‌ট্ বুক্ বলিয়া কোনও বালাই নাই) কিন্তু ভূপেন কাকার হাতে কখনও কোন গল্পের বই এ পর্য্যন্ত কেউ দেখে নাই। বই যে থাকে না তা নয়, বই প্রায় সময়েই থাকে তবে সেগুলি হয় নেস্‌ফিল্ডের গ্রামার, নয় কে, পি, বোসের য়্যাল্‌জেব্রা কিংবা সত্যানন্দ সেনের 'আদর্শ চরিত্রগঠন'—ঐ জাতীয় কোনও বই। নিজের জন্য তিনি এসব বই ব্যবহার করেন না, তা বোধ হয় বুঝিয়াছ। যাদের জন্য করেন তাদের হয় প্রাণান্ত ব্যাপার। কাজেই ছেলেরা সহজে তাঁর ছায়া মাড়াইতে চায় না। গত দশ বছর নাকি ভূপেন কাকা এ বাড়ীতে আসেন নাই, কাজেই ভোম্বলের

ভোম্বলদাসের উপাখ্যান

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এম্ এস্-সি

দল এ পদার্থটি সম্বন্ধে বিভীষিকাপূর্ণ কাহিনী এ যাবৎ কাল শুধু বড়দের মুখে শুনিয়াই আসিয়াছে। হঠাৎ এই ভূপেন কাকার আগমন-আশঙ্কায় তাই ছেলে-মহলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

ভাবনা হইল ভোম্বলেরই বেশী। সে দিব্যচক্ষে দেখিল প্রত্যেক পদে পদে, প্রত্যেক কথায় কথায় সে এক-একটা ভুল করিয়া বসিতেছে আর ভূপেন কাকা টিকটিকির মত এক দৃষ্টিতে এবং রোষকষায়িত দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া আছেন। খাওয়ার সময়ে, নাওয়ার সময়ে, পড়িবার সময়ে, খেলিবার সময়ে, এমন কি ঘুমাইবার সময়ে পর্য্যন্ত ভোম্বলের চোখের সামনে ভূপেন কাকার বিভীষিকাময় মূর্ত্তি ভূতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। জলাতঙ্কের মত 'ভূপেন কাকাতঙ্ক' তা'কে পাইয়া বসিল। নাঃ, এর একটা বিহিত করিতেই হইবে।

রবিবার সকালে ভোম্বলের ঘুম ভাঙ্গিতে একটু দেরী হইয়া গিয়াছিল। ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখা হইল ভৃত্য মেঘুয়ার সহিত। সে কহিল, "ছোড়দাদাবাবু, এত্তো বেলা কেনো কোর্চ্ছেন? বাবু বোড়ো গোস্‌সা হইয়েছেন, আপনাকে এখোনই টিশন্ যেতে বল্লেন—আঠ্‌টার গাড়ীতে কোল্‌কাত্তাসে কোন্ বাবু আসবেন, তেহ্নাকে লিয়ে আসতে হোবে। যান্, আর দেরী কোরবেন না। ঘুমকে এসে চা পানি পিয়ে লেবেন। গাড়ীর কল তো খরাব হোয়ে গেছে, ভাড়া-গাড়ীতেই লিয়ে আসবেন।"

এই সারিয়াছে! প্রথম দিন হইতেই তার ঘাড়ে! মেঘুয়াটা ভারী অপয়া তো! কিন্তু সময় ছিল না, ভোম্বল তাড়াতাড়ি শার্ট্‌টা গায়ে দিয়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিল। আটটা বাজিতে তখন মোটে পাঁচ মিনিট বাকী।

পথে যাইতে যাইতে কিন্তু তার মাথায় এক চমৎকার প্ল্যান্ আসিয়া গেল। ভগবান্ যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। আজ যে বাড়ীতে এত লোক থাকিতে বাছিয়া বাছিয়া তাহাকেই ষ্টেশনে পাঠান হইল নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে বিধাতা-

পুরুষের কোন রকম "হিন্ট্" আছে। ভোম্বল বুঝিল এবং ঠিক করিল এ সুযোগের অপব্যবহার করা হইবে না।

ট্রেন্ প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে আগেই আসিয়া গিয়াছিল। যাত্রীর দলও ষ্টেশন্ হইতে বাহির হইয়া যে যার গন্তব্য পথে রওয়ানা হইয়াছে—প্লাট্‌ফর্ম্ম্ প্রায় ফাঁকা। ভোম্বল চাহিয়া দেখিল গেটের কাছে একজন আধাবয়সী ভদ্রলোক বিব্রত মুখে এদিক্ ওদিক্ তাকাইতেছেন। বেশ নাদুস-নুদুস চেহারার ভদ্রলোক—মাথার চুলগুলি খুব ছোট করিয়া ছাঁটা—পরণে গরদের কোট, চাদর এবং দামী পাম্পশু। ভোম্বল কাছে যাইতেই ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা, গিরীন বাবুর বাড়ী কোথায় জান? গিরীন্দ্রনাথ দাস—উকীল?" গিরীন বাবু ভোম্বলের বাবার নাম। ভোম্বল দ্বিধা না করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমি আপনার খোঁজেই আসছি। কিন্তু গিরীন বাবু তো এখানে নেই। তাঁর দেশে কার যেন খুব কঠিন অসুখ হয়েছে। কাল, তার পেয়ে তাঁরা বাড়ীশুদ্ধ সব্বাই দেশে চলে গেছেন। ফিরতে বোধ হয় কিছু দিন দেরীই হবে।" ভদ্রলোক রীতিমত আশ্চর্য্য এবং ততোধিক চিন্তিত হইয়া বলিলেন, "তবে উপায়? আমার যে এখানে কারও সঙ্গে চেনা নেই! কল্‌কাতায় ফিরবার ট্রেন্‌ও তো বুঝি সেই সন্ধ্যার আগে আর নেই? তুমি?"···"আমরা তাঁদের প্রতিবেশী। গিরীন বাবু আমার বাবাকে বলে গেছেন—তাঁদের একটা বাগানবাড়ী আছে সেখানে আপনি এবেলা থাকতে পারেন, সন্ধ্যার ট্রেনে না হয় ফিরে যাবেন—আসুন" বলিয়া ভোম্বল একটা ঠিকা গাড়ী ডাকিয়া ভদ্রলোকবেশী ভূপেন কাকাকে তার মধ্যে তুলিল, তারপর গাড়োয়ানকে বলিল, "হাঁকাও পাথরপট্টি।"

প্রায় ঘণ্টা খানেক চলিবার পর গাড়ী সহর ছাড়িয়া কয়েকটা মাঠ পার হইয়া একটা পুরানো একতালা বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। ভদ্রলোক অর্থাৎ ভোম্বলের ভূপেন কাকা অনেকক্ষণ হইতেই ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছিলেন,

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এম্ এস-সি

গাড়ী থামিলে নামিয়া বলিলেন, "বাপ্, এ কোথায় আন্‌লে খোকা? দরজাও দেখছি তালা বন্ধ!" ভোম্বল আশ্বাস দিল, ভাবনার কারণ নাই। নিজেদের বাড়ী, তালা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেই হইবে। খাবার-টাবারের ব্যবস্থা সে-ই লোক পাঠাইয়া করিয়া দিবে। দু'জনের চেষ্টায় তালা ভাঙ্গিলে ভূপেন কাকা ভিতরে ঢুকিলেন। "আপনি একটু জিরোন, আমি খাবারের আয়োজন করি গিয়ে" বলিয়া ভোম্বল বাহির হইয়া আসিল।



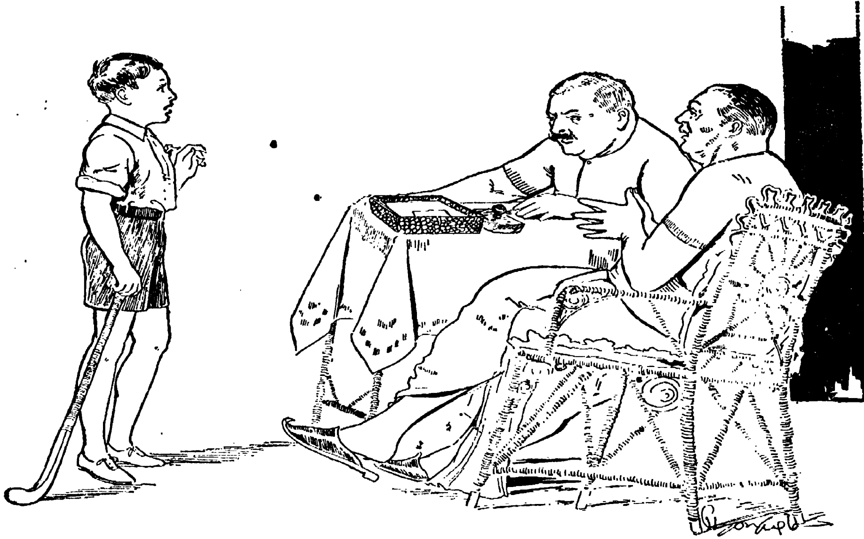
ভূপেন কাকাকে ভোম্বল যে বাড়ীতে তুলিয়া দিল সেটি এক জমিদারের কাছারী-বাড়ী। নায়েবের নিজের বাড়ী কাছেই থাকায় তিনি সব সময়ে—বিশেষতঃ ছুটীর দিন সকাল বেলা সেখানে থাকেন না। ভোম্বল সে খবর রাখিত। সে আর ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া নায়েবের কাছে গিয়া হাজির হইল। তারপর জানাইল—তাঁদের কাছারী বাড়ীতে একদল লোক তালা ভাঙ্গিয়া ঢুকিয়াছে এবং ভিতরের কাগজপত্র লইয়া ঘাঁটাঘাটি করিতেছে। লোকগুলির সঙ্গে বড় বড় লাঠি এবং একটা বন্দুকও আছে। শুনিয়া নায়েব মশাই উঠি-পড়ি করিয়া পাইক, বরকন্দাজ,

লাঠিয়াল সংগ্রহ করিতে ছুটিলেন। ভোম্বল গুটগুটি বাড়ীরদিকে রওনা হইল।

সারা দিন ভোম্বলের বড় স্ফূর্ত্তিতে কাটিল। যাক্ এত দিন পরে সে একটা কাজের মত কাজ করিয়াছে। ওঃ, কি ব্রেন্ তাহার! একচোখোরা কিনা বাণীকেই তার চেয়ে বেশী চালাক দেখে! বাণীর সাধ্যি ছিল এই রকম একটা কাজ করার?

সে দিনই সন্ধ্যা বেলা। ভোম্বলদের বাড়ীর বৈঠকখানায় বসিয়া ভোম্বলের বাবা এবং সকাল বেলার সেই ভদ্রলোকবেশী ভূপেন কাকার মধ্যে কথা বার্ত্তা হইতেছিল। ভোম্বলের বাবা বলিলেন, "তারপর? আশ্চর্য্য কাণ্ড তো! ছেলেটার অদ্ভুত সাহস যা হোক। কিন্তু এরকম করবার মানে? পাগল না তো?" ভূপেন কাকা বলিলেন, "তারপর আমি তো জামা টামা খুলে মুখ-হাত ধোবার জন্য স্যুট্‌কেস্ থেকে তোয়ালে বার করছি, হঠাৎ দেখি লাঠি সোঁটা নিয়ে এক পাল পাইক পেয়াদা এসে আমাকে ঘেরাও করেছে! সঙ্গে এক নায়েব—এই মারে তো এই মারে! তাদের বোঝান কি সহজ? শেষে সব শুনে এবং আমার আসল পরিচয় পেয়ে নায়েব খুব এক চোট হেসে নিলে, তারপর বল্লে, "এগারোটা বাজে, এখানে তো চট্‌ক'রে গাড়ী পাবেন না, খুঁজে এনে গিরীন বাবুর বাড়ী পৌঁছুতে সেই তিনটে। এবেলা আমার ওখানেই চার্‌টে আহারাদি করুন, বিকেলে লোক দিয়ে আপনাকে পাঠিয়ে দেব'খন।" ওঁর মনিব আবার আমাদের কুটুম্ব কিনা—আমাদের জমীদারীর পাশেই ওঁদের জমীদারী," গিরিন বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, আপনার মত তিনিও আমার একজন বড় মক্কেল। যাক্, যা হ'বার হয়ে গেছে। সকালে এলে সারাদিন ছুটী ছিল, মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র দেখে ফেলতে পারতাম—ওখানে কে রে? ভোম্বল নাকি? এদিকে শুনে যা তো?" ভোম্বল হকি খেলিয়া ফিরিতেছিল বাবার

ডাকে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। গিরীন বাবু বলিয়া চলিলেন, "তুই না সকালে এসে বল্‌লি আজকের ট্রেনে কল্‌কাতা থেকে কেউ আসেন নি—তুই তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখেছিস্! যাস্ নি বুঝি ষ্টেশনে—ভুলে গেছ্‌লি? এটি আমার ছোট ছেলে ভোম্বল—একেই ষ্টেশনে আপনাকে আন্‌বার জন্য পাঠিয়েছিলাম



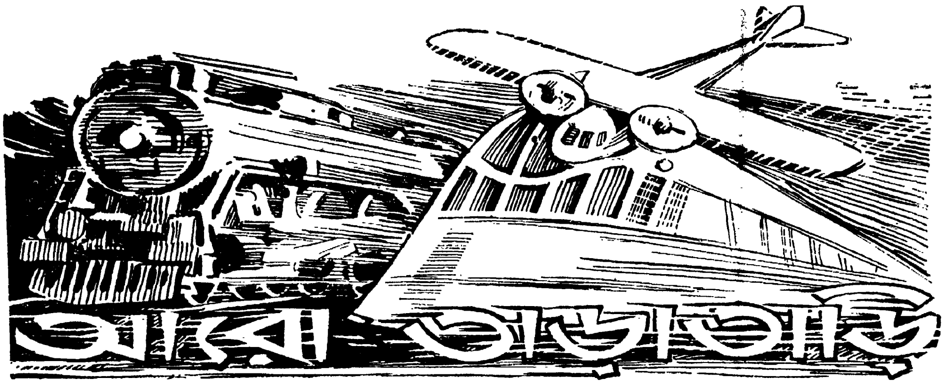
অমর বাবু, কিন্তু দেখছি হতভাগা যায় নি, আমার কাছে এসে মিছে কথা বলেছে

অমর বাবু—নামটা ভোম্বলের খুব অপরিচিত নয়। ইনি তার বাবার একজন পয়সাওয়ালা মক্কেল। এতক্ষণ সে তাঁর দিকে তাকায় নাই, নাম শুনিয়া

মুখ তুলিল। চারি চক্ষের মিলন হইল। অমর বাবু চমকাইয়া বলিলেন, "আপনার কি বল্লেন ? ছেলে !"

ভোম্বলের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। সে শুধু বলিল, "ভু-ভু-ভুল হয়েছিল, আ-আপনার না-নামটা জিজ্ঞাসা করা হয় নি"—বলিয়াই সে ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।





আরো তাড়াতাড়ি

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

চল্‌ত ঘণ্টায় ৪ মাইল; এখন চলে ঘণ্টায় ৪০ মাইল;—তবু তা'র সখ মিটে না। চল্লিশ মাইল কেন, ঘণ্টায় ১০০ মাইল গেলেও মানুষের সখ মিট্‌বে না।

কথাটা হয়তো তত পরিষ্কার হ'লো না;—তবে বুঝিয়েই বলি। আগে মানুষ পায়ে হেঁটেই চল্‌ত: তার পর গাড়ী তৈরী হ'লো; গরু বা ঘোড়ায় সেই গাড়ী টান্‌ত। তার পর এল রেলগাড়ী। প্রথম রেল খুব ছোট ছিল;—ঘণ্টায় আট দশ মাইলের বেশী চল্‌ত না। ক্রমে বড় এঞ্জিন তৈরী হ'লো; তার বেগও ক্রমে বেড়ে চল্‌ল। শেষটায় ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে রেল চলাচল কর্‌তে লাগ্‌ল। মানুষ তা'তেও সন্তুষ্ট নয়;—রেল আরো তাড়াতাড়ি চলা উচিত। কাজেই, রেলের উন্নতি হ'তে লাগ্‌ল।

ইতিমধ্যে মোটর গাড়ী এসে রেলের প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়াল। মোটরের ক্রমশঃ উন্নতি হ'য়ে শেষটায় রেলের চেয়ে অনেক বেশী বেগে চল্‌তে লাগ্‌ল;—তখন রেলের মালিক প্রমাদ গণ্‌ল। রেলের আরো উন্নতি হয়ে শেষটায় রেল ঘণ্টায় ৫০।৬০ মাইল পর্য্যন্ত চল্‌তে লাগ্‌ল। মোটর কিন্তু তা'র চেয়েও বেশী বেগে চলে।

আরো তাড়াতাড়ি

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

ইতিমধ্যে এরোপ্লেন এসে নূতন বিপদের সৃষ্টি করল। মোটর আর রেল রাস্তা দিয়ে চলে; নানা বাধাবিঘ্নের দরুণ তাদের গন্তব্য জায়গায় যেতে হলে আঁকা-বাঁকা উঁচু নীচু রাস্তা দিয়ে, সাঁকো পার হ'য়ে, সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়;—কিন্তু, এরোপ্লেন গন্তব্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে সোজা নাক-বরাবর রওয়ানা হ'য়ে উড়ে যায়। তা'র বেগও বড় কম নয়;—ঘণ্টায় ১০০ মাইল বেশ অনায়াসেই যেতে পারে। এরোপ্লেনে চলাচলের খরচ বড় বেশী—এই যা' রক্ষা।

মোটর, রেলগাড়ী, এরাও উঠে-পড়ে লেগে গেল। এরোপ্লেন যখন বেগে চলে, বাতাস তা'কে চারিদিক থেকে বাধা দেয়। কাজেই, কেমন ক'রে বাতাসের বাধা এড়ান যায়, সেই বিষয় নিয়ে পরীক্ষা চল্‌তে লাগ্‌ল। এরোপ্লেন, মোটর, রেল সবেরই আকার ক্রমশঃ বদ্‌লিয়ে গিয়ে অনেকটা ছুঁচালো-মুখ গোল-গা গোছের হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। এঞ্জিনের ধোঁয়া বের হবার চোঙা ক্রমশঃ ছোট হয়ে গেল—শেষটায় প্রায় মিলিয়েই গেল। চারিদিকের খোঁচ-খাঁচ সব মিলিয়ে দেওয়া হ'লো। তবু এঞ্জিন মোটরের সঙ্গে পেরে ওঠে না;—এরোপ্লেনের সঙ্গে পারা তো দূরের কথা।

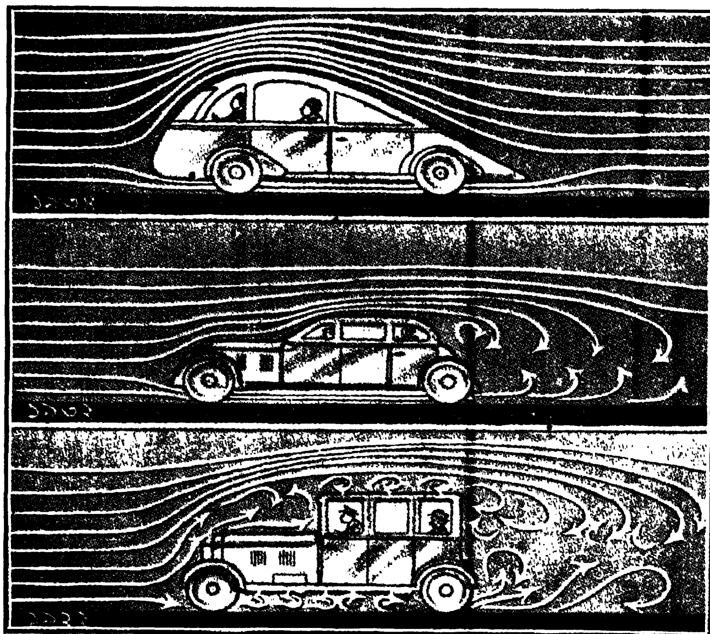
মোটরের চেহারাও ক্রমশঃ বদ্‌লিয়ে যেতে লাগ্‌ল। খাড়া জিনিষে বাতাস বেশী বাধা পায়, তাই মোটরের সাম্নেটা হেলান ক'রে দেওয়া হ'লো। এঞ্জিনের উপরের ঢাক্‌নি, মাডগার্ড, চালকের সাম্‌নের কাঁচ—সবই হেলান হয়ে গেল। পিছনের দিকটাও গোল ক'রে দেওয়া হ'লো। শেষটায় অনেকটা চম্‌চমের মতন চেহারা দাঁড়াল।

মোটরের দেখাদেখি রেলগাড়ীরও চেহারার পরিবর্ত্তন চল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু বিরাট বয়লার আর মোটা চোঙ্গা ইত্যাদি থাকায় চেহারাটা ইচ্ছামত বদল করা মুস্কিল। কাজেই, শেষটায় স্থির হ'লো বৈদ্যুতিক রেল বা পেট্রলে-চলা রেল তৈরী করাই ভাল।

আরো তাড়াতাড়ি

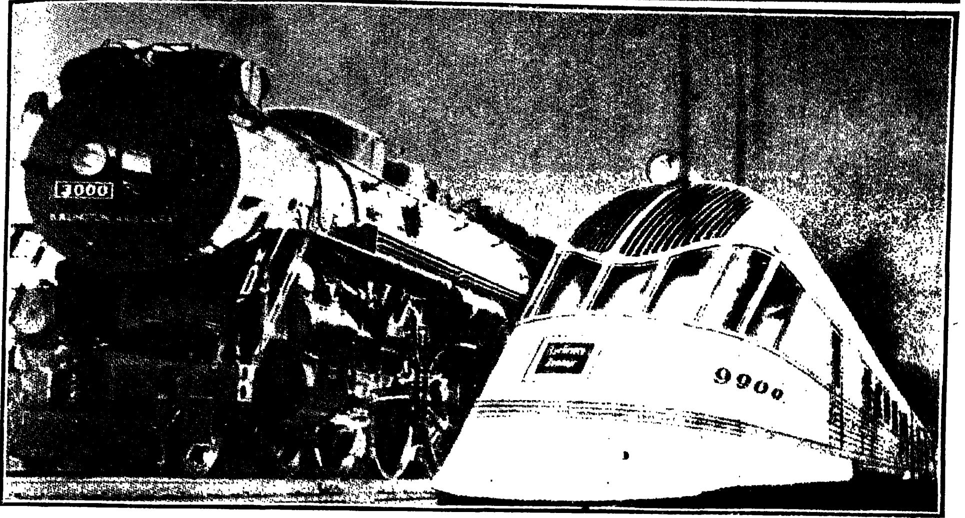
শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

যেমন ইচ্ছা তেমন কাজ। হাল্কা ধাতু দিয়ে, খুব মজবুত গড়নের পেট্রল-এঞ্জিনে-চলা এবং বৈদ্যুতিক-শক্তিতে-চলা রেল তৈরী হয়ে গেল। তা'র আকারও অনেকটা আধুনিক মোটরের মত—সব খোঁচ-খাঁচ গোল ক'রে দেওয়া হয়েছে। এই রেল চল্‌বার সময় দরজা জানালা সব শার্সি দিয়ে বন্ধ করা

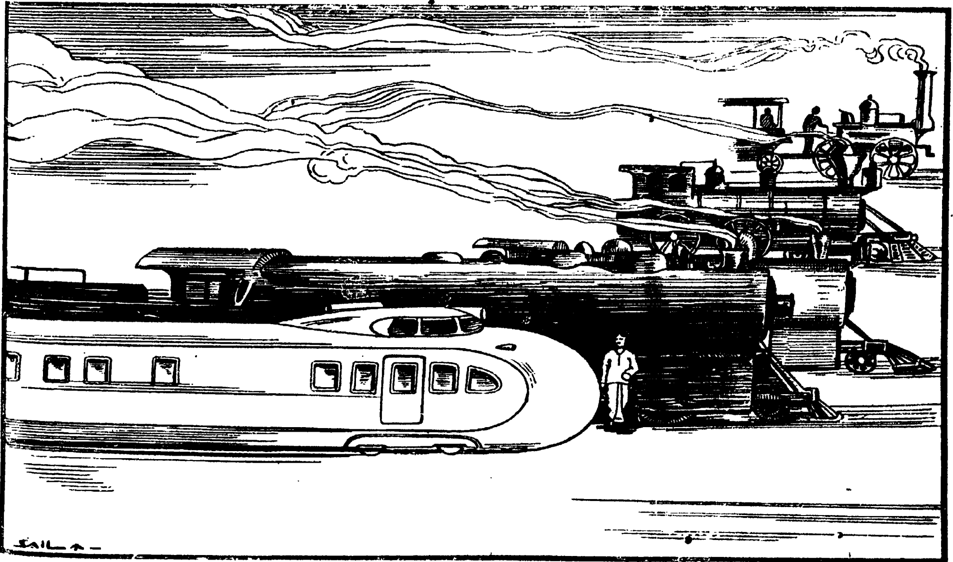


মোটরের চেহারার ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হয়ে (নীচে থেকে উপরে) বাতাসের বাধা কেমন ক'রে অতিক্রম করা হয়েছে, তা'ই দেখান হচ্ছে।

থাকে ;—কারণ, দারুণ বেগে চল্‌বার সময় বাইরে থেকে কোন জিনিষ (নিতান্ত ছোট হ'লেও) যদি কোন আরোহীর গায়ে এসে লাগে তা' হ'লে আরোহী জখম



বিরাট রেল-এঞ্জিনের পাশে আধুনিক হাল্কা ধাতুর বৈদ্যুতিক রেল



সকলের উপরে প্রথম এঞ্জিন। সকলের নীচে আধুনিক হাল্কা ধাতুর রেল্স

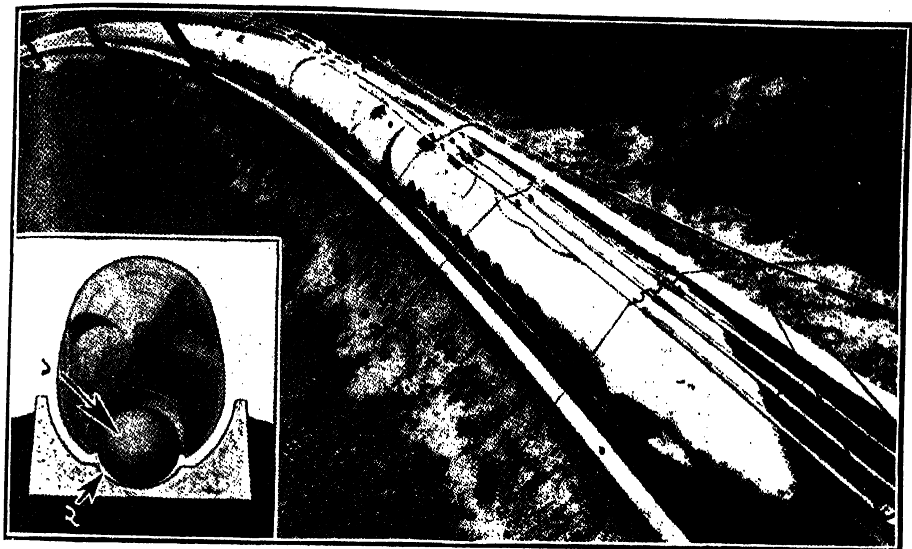
হবার সম্ভাবনা থাকে। এই রেল চল্‌বার সময় বাতাসের বাধা খুব কমই পায়; হাল্কা ধাতুর তৈরী ব'লে তাড়াতাড়ি চল্‌তে পারে এবং চলার আওয়াজও কম হয়। পরীক্ষায় এই রেল ঘণ্টায় ১২০ মাইল বেগে চলেছে। সাধারণ ষ্টিম-এঞ্জিনকেও এখন ধাতুর চাদর (বা পাত) দিয়ে ঢেকে তা'র চেহারা বদ্‌লিয়ে বাতাসের বাধা কাটা'বার উপযোগী করা হয়েছে। এই এঞ্জিনও খুব তাড়াতাড়ি চল্‌তে পারে।



বাতাসের বাধা কাটা'বার জন্য তৈয়ারী ষ্টিম-এঞ্জিন

প্রথম ষ্টিম-এঞ্জিন থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমশঃ কি ভাবে পরিবর্ত্তন হয়ে আধুনিক হাল্কা ধাতুর রেল্ এসেছে, আগের পৃষ্ঠার নীচের ছবিতে তাই দেখান হয়েছে। এর থেকে বিভিন্ন এঞ্জিন এবং রেলের আকারেরও কিছু আভাস পাওয়া যাবে। অবিশ্যি, আধুনিক রেলের এঞ্জিনের সঙ্গে আরোহীদের গাড়ী লাগানই থাকে; তার এঞ্জিনটি (বা মোটরটি) আসলে আকারে অনেক ছোট। এই রেলের শব্দ কমাবারও অনেক রকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চারিদিকে রবর লাগিয়ে, ভিতরে রবর, দরজায় রবর দিয়ে বাইরের শব্দ ভিতরে যা'ওয়া বন্ধ করা হয়েছে।

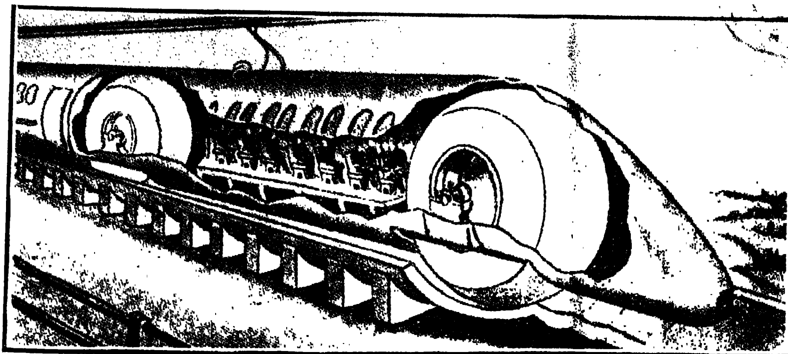
রুশিয়ার "সাপ-রেল" (Snake train) নামে একটি অদ্ভুত বৈদ্যুতিক রেল তৈয়ারী করা হয়েছে; তা'র গড়ন, ব্যবস্থা সবই নূতন রকমের। দূর থেকে এই রেলের চেহারাটি বাস্তবিকই সাপের মতন দেখায়। ছুঁচালো মুখ, সরু লম্বা,



"রুশিয়ার সাপ-রেল"

(কোণায়) সাপ-রেলের সম্মুখের চেহারা : (১) সাপ-রেলের গোলাকার চাকা

(২) সাপ-রেলের চলার পথ ।



এই ছবিতে "সাপ রেলের" চলার রাস্তা ও ভিতরের ব্যবস্থা দেখান হয়েছে

ছবি থেকে চাকার আকারেরও আভাষ পাওয়া যাবে ।

আরো তাড়াতাড়ি

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

গোল-গা রেল। চলে একটি সিমেণ্ট দিয়ে তৈরী রাস্তার উপর ;—রাস্তাটি যেন একটি নর্দ্দমা, অর্দ্ধ-বৃত্তের মতন। রেলের এক একটি চাকা আকারে প্রকাণ্ড—মানুষের আকারের চেয়ে বড়। চাকাটি একটি চ্যাপ্টা চক্রাকার জিনিষ না হয়ে, বানিয়েছে একটি বিরাট গোলার মতন। এই গোলার আকারের চাকা নর্দ্দমা—রাস্তার উপর বেশ সুন্দর ভাবে বসে। গাড়ী খুব জোরে চল্‌লেও এই বিরাট চাকা অপেক্ষাকৃত আস্তেই ঘোরে। গাড়ীর রাস্তার দু'পাশে উঁচু বাঁধ থাকায় নিরাপদে খুব বেগে গাড়ী চলে। এই রেল অনায়াসে ঘণ্টায় ১০০ মাইলের বেশী যায়। এর আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, এই গাড়ীতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নাই বল্‌লেই চলে।

রেলগাড়ী রাস্তা দিয়ে চলার সময় রাস্তার (বা লাইনের) সঙ্গে ঘষাঘষিতে তা'র বেগ অনেক ক'মে যায়—চাকাও সহজে গরম হ'য়ে যায়। যদি একটি সরু লাইনের উপর রেল চালান যায় তা' হ'লে এই বিষয়ে অনেক সুবিধা হ'তে পারে। বাইসাইকেল যেমন ক'রে চালান যায়, এক লাইনের রেলই বা সেই ভাবে চালান যাবে না কেন ? কিন্তু, অত বড় রেল তো আর মানুষের সাধ্যি নাই যে সাম্‌লায়। কাজেই তা'র একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

মানুষের বুদ্ধিতে ব্যবস্থাও হয়ে গেল। ব্রেনান নামে এক সাহেব এক বিরাট লাট্টু তৈরী ক'রে, তা'কে বন্‌বন্ ক'রে ঘুরিয়ে দেখ্‌লেন লাট্টু বেশ স্থির ভাবে থাকে। সেই লাট্টু একটা গাড়ীর ভিতরে বসিয়ে, সাম্নে পিছনে এক একটি চাকা গাড়ীতে লাগিয়ে, একটি লাইনের উপর গাড়ীটা বসান হ'লো আর গাড়ীর সঙ্গে ছোট এঞ্জিনও লাগান হ'লো। গাড়ীর লাট্টুটিকে বন্‌বন্ ক'রে ঘুরিয়ে দেখা হ'লো, গাড়ী একটি লাইনের উপর বেশ স্থির ভাবে থাকে। তখন গাড়ীকে চালিয়ে পরীক্ষা করা হ'লো—এক লাইনের উপর গাড়ী অনায়াসে চল্‌তে লাগ্‌ল।

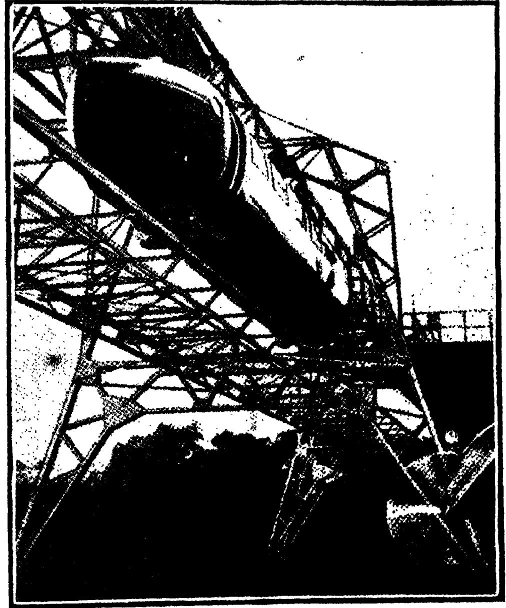
আজব বই

আরো তাড়াতাড়ি

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

ঐ যে লাট্টু, সেটা সাধারণ লাট্টুর মত নয়। ধাতুর তৈরী, বেশ ভারি জিনিষ, সহজেই ঘোরান যায় আর খুব জোরেও ঘোরান যায়। এই লাট্টুর নাম দেওয়া হয়েছে গাইরোস্কোপ (Gyroscope)। স্কটল্যাণ্ডে এই গাইরোস্কোপ-লাট্টু বসান একটি রেলের পরীক্ষাও হয়ে গেছে। এই রেল বৈদ্যুতিক শক্তিতে, একটি লাইনের উপর চলে। জার্ম্মেনীতেও এই রকমের রেল নিয়ে পরীক্ষা চল্‌ছে।

ভবিষ্যতের দ্রুতগামী রেল হয়তো এক লাইনের উপরই চল্‌বে। হাল্কা ধাতুর তৈরী ছুঁচালো মুখ বৈদ্যুতিক রেল, পিছনে বন্‌বন্‌ ক'রে পাখা ঘুরছে, ভিতরে দুটি গাইরো-স্কোপ্ লাট্টু বসান—এই রকমের রেল ঘণ্টায় ১৫০।২০০ মাইল অনায়াসে চল্‌বে। মাথার উপর উঁচুতে একটি লাইন বসিয়ে, সহরের ভিতর দিয়ে এই রেল চ'লে যাবে। এই রেলের কল্পনা ক'রে চিত্রকর একটি ছবিও এঁকেছেন।



গাইরোস্কোপ রেল

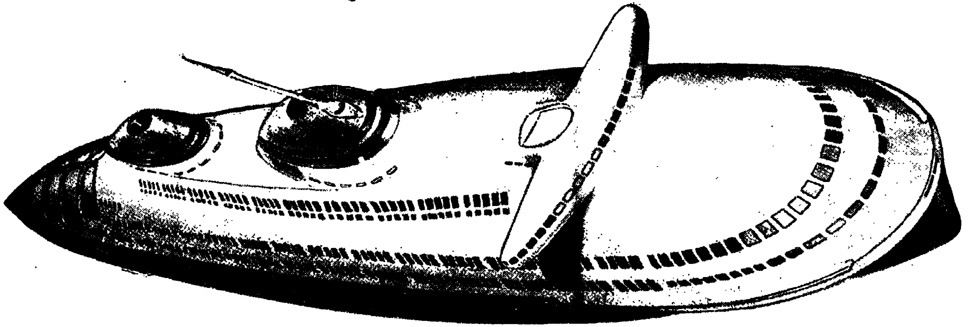
ভবিষ্যতে নাকি ডানাযুক্ত রেলও হবে। পাশে ডানা, পিছনে পাখা—জোরে

আরো তাড়াতাড়ি

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

চলার সময় রেল প্রায় শূন্যে উঠে পড়্বে ;—কাজেই রাস্তার বাধা বেশী কিছু থাক্‌বে না।

স্থলপথে মানুষ যেমন তাড়াতাড়ি চলাফিরার জন্য রেলের উন্নতি কর্‌ছে, জলপথেও তেম্নি জাহাজের উন্নতি চলেছে। সম্প্রতি একজন ইঞ্জিনিয়ার নূতন ধরণের জাহাজের নক্সা তৈরী করেছেন, যা'র চেহারা অনেকটা চমচমের মতন।

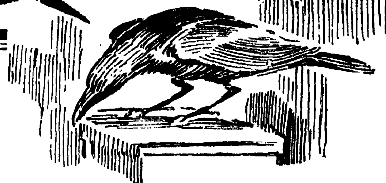


বাতাসের বাধা অতিক্রমকারী জাহাজের নক্সা

তার সব খোঁচ-খাঁচ গোল ক'রে দেওয়া হয়েছে, মুখ ছুঁচালো করা হয়েছে, ডেকের উপর সব ঢাকা। এ জাহাজ সাধারণ জাহাজের প্রায় দেড় গুণ বেশী বেগে যেতে পার্‌বে ব'লে আশা করা যায়। এই জাহাজের নক্সার একটা ছবিও উপরে দেওয়া হলো।

কিন্তু এত করার পরও হয়তো মানুষ বল্‌বে, "আরো তাড়াতাড়ি চলা দরকার।" তা'র কারণ, আকাশ পথে এরোপ্লেন আরো তাড়াতাড়ি চল্‌তে পারে। এখনই এরোপ্লেন ঘণ্টায় ২০০ মাইল বেগে চল্‌তে পারে ; ভবিষ্যতে কত বেগে চল্‌বে কে জানে ?

ড্যাংচু



৺সুকুমার রায়চৌধুরী

এক ছিল রাজা।

রাজা একদিন সভায় বসেছেন—চারিদিকে তাঁর পাত্রমিত্র আমীর ওমরা, সিপাই শান্ত্রী গিজ্ গিজ্ করছে—এমন সময় কোথা হ'তে একটা দাঁড় কাক উড়ে এসে সিংহাসনের ডান দিকে উঁচু থামের উপর ব'সে ঘাড় নীচু ক'রে চারদিকে তাকিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বল্ল—"কঃ"।

কথা নেই বার্ত্তা নেই হঠাৎ এরকম গম্ভীর শব্দ,—সভাশুদ্ধ সকলের চোখ এক সঙ্গে গোল হ'য়ে উঠ্‌ল—সকলে একেবারে এক সঙ্গে হাঁ ক'রে রইল। মন্ত্রী একতাড়া কাগজ নিয়ে কি যেন বোঝাতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বক্তৃতার খেই হারিয়ে তিনি বোকার মত তাকিয়ে রইলেন। দরজার কাছে একটা ছেলে বসে ছিল, সে হঠাৎ ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল; যে লোকটা চামর দোলাচ্ছিল, চামরটা তার হাত থেকে ঠাঁই ক'রে রাজার মাথার উপর প'ড়ে গেল। রাজা মশাইয়ের চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছিল, তিনি হঠাৎ জেগে উঠেই বল্লেন, "জল্লাদ ডাক"।

বল্‌তেই জল্লাদ এসে হাজির! রাজা মশাই বল্লেন, "মাথা কেটে ফেল।" সর্ব্বনাশ! কা'র মাথা কাট্‌তে বলে? সকলে ভয়ে ভয়ে নিজের নিজের মাথায় হাত বুলাতে লাগ্‌ল। রাজা মশাই খানিকক্ষণ ঝিমিয়ে আবার তাকিয়ে বল্লেন, "কই, মাথা কই?" জল্লাদ বেচারা হাতজোড় ক'রে বল্লে "আজ্ঞে মহারাজ, কার

মাথা ?" রাজা বল্লেন, "ব্যাটা গোমুখ্খু কোথাকার, কার মাথা কিরে ? যে ঐ রকম বিট্‌কেল শব্দ ক'রেছিল, তার মাথা।" শুনে সভাশুদ্ধ সকলে হাঁফ ছেড়ে এমন ভয়ানক নিঃশ্বাস ফেল্লে যে, কাকটা হঠাৎ ধড়ফড় ক'রে সেখান থেকে উড়ে পালাল।

তখন মন্ত্রীমশাই রাজাকে বুঝিয়ে বল্লেন যে ওই কাকটাই ওরকম আওয়াজ ক'রেছিল। তখন রাজা মশাই বল্লেন, "ডাক পণ্ডিতসভার যত পণ্ডিত, সবাইকে।" হুকুম হওয়া মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাজ্যের যত পণ্ডিত সব সভায় এসে হাজির।

তখন রাজা মশাই পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এই যে একটা কাক এসে আমার সভার মধ্যে আওয়াজ ক'রে এমন গোল বাধিয়ে গেল, এর কারণ কিছু বল্‌তে পার ?"

কাকে আওয়াজ কর্‌ল তার আবার কারণ কি ? পণ্ডিতেরা সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি কর্‌তে লাগলেন। একজন ছোকরা-মত পণ্ডিত খানিকক্ষণ কাঁচু-মাচু ক'রে জবাব দিল, "আজ্ঞে বোধ হয় তার খিদে পেয়েছিল।"

রাজা মশাই বল্লেন; "তোমার যেমন বুদ্ধি! খিদে পেয়েছিল, তা সভার মধ্যে আস্‌তে যাবে কেন ? এখানে কি মুড়ি মুড়কি বিক্রী হয়! মন্ত্রী, ওঁকে বিদেয় ক'রে দাও—" সকলে মহা তম্বী ক'রে বল্ল, "হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, ও'কে বিদেয় করুন।"

আর একজন পণ্ডিত বল্লেন, "মহারাজ, কার্য্য থাকলেই তার কারণ আছে ---বৃষ্টি হ'লেই বুঝ্‌বে মেঘ আছে, আলো দেখ্‌লেই বুঝ্‌বে প্রদীপ আছে ; সুতরাং বায়স পক্ষীর কণ্ঠনির্গত এই অপরূপ ধ্বনিরূপ কার্য্যের নিশ্চয়ই কোন কারণ থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি ?"

রাজা বল্লেন, "আশ্চর্য্য এই যে, তোমার মত মোটা-বুদ্ধি লোকেও এই

রকম আবোল-তাবোল ব'কে মোটা মোটা মাইনে পাও। মন্ত্রী, আজ থেকে এঁর মাইনে বন্ধ কর।" অমনি সকলে হাঁ হাঁ ক'রে উঠ্ল "মাইনে বন্ধ কর।"

দুই পণ্ডিতের এক রকম দুর্দ্দশা দেখে সবাই কেমন ঘাবড়ে গেল। মিনিটের পর মিনিট যায়, কেউ আর কথা কয় না। তখন রাজা মশাই দস্তুর মত খেপে গেলেন। তিনি হুকুম দিলেন, এর জবাব না পাওয়া পর্য্যন্ত কেউ যেন সভা ছেড়ে না ওঠে। রাজার হুকুম, সকলে আড়ষ্ট হ'য়ে ব'সে রইল। ভাবতে ভাবতে কেউ কেউ ঘেমে ঝোল হ'য়ে উঠ্লো, চুলকিয়ে চুলকিয়ে কারো কারো মাথায় প্রকাণ্ড টাক প'ড়ে গেল। ব'সে ব'সে সকলের খিদে বাড়্তে লাগ্ল— রাজামশায়ের খিদেও নাই বিশ্রামও নাই—তিনি ব'সে ব'সে ঝিমুতে লাগলেন।

সকলে যখন হতাশ হ'য়ে এসেছে, আর মনে মনে পণ্ডিতদের "মূর্খ, অপদার্থ, নিষ্কর্ম্মা" ব'লে গাল দিচ্ছে এমন সময় রোগা সুঁট্কো মত একজন লোক হঠাৎ বিকট চীৎকার ক'রে সভার মাঝখানে প'ড়ে গেল। রাজা মন্ত্রী পাত্র-মিত্র উজির-নাজির সবাই ব্যস্ত হ'য়ে বল্লেন, "কি হ'ল, কি হ'ল ?"

তখন অনেক জলের ছিটা, পাখার বাতাস আর বলা-কওয়ার পর লোকটা কাঁপতে কাঁপতে উঠে বল্লে, "মহারাজ, সেটা কি দাঁড়কাক ছিল ?" সকলে বল্ল, "হাঁ হাঁ হাঁ—কেন বল দেখি" ? লোকটা আবার বল্ল, "মহারাজ, সে কি ঐ মাথার উপর দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে বসেছিল—আর মাথা নীচু ক'রে ছিল, আর চোখ পাকিয়ে ছিল, আর "কঃ" ক'রে শব্দ ক'রেছিল ?" সকলে ভয়ানক ব্যস্ত হ'য়ে বল্ল, "হাঁ হাঁ—ঠিক ঐ রকম হ'য়েছিল।" তাই শুনে লোকটা আবার ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে লাগ্ল—আর বল্তে লাগ্ল, "হায় হায় ! সেই সময়ে কেউ আমায় খবর দিলে না কেন ?"

রাজা বল্লেন "তাই ত, একে তখন তোমরা খবর দেওনি কেন ?" লোক-

টাকে কেউই চেনে না ; তবু কেউ সে কথা বল্‌তে সাহস পেল না ; সবাই বল্ল "হ্যাঁ, ওকে খবরটা দেওয়া উচিত ছিল"—যদিও কেন তাকে খবর দেবে, আর কি খবর দেবে, একথা কেউ বুঝ্‌তে পারল না। লোকটা তখন খুব খানিকটা কেঁদে তারপর মুখ বিকৃতি ক'রে বল্ল, "দ্রিঘাংচু"। সে আবার কি ! সবাই ভাব্‌ল, লোকটা খেপে গেছে।

মন্ত্রী বল্লেন, "দিঘাঙ্কু কি হে" ? লোকটা বল্‌ল, "দিঘাঙ্কু নয়, দ্রিঘাংচু।" কেউ কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ল না—তবু সবাই মাথা নেড়ে বল্‌ল, "ও !" তখন রাজা মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কি রকম হে ?" লোকটা বল্‌ল, "আজ্ঞে আমি মূর্খ মানুষ, আমি কি অত খবর রাখি ? ছেলেবেলা থেকে দ্রিঘাংচু শুনে আস্‌ছি —তাই জানি দ্রিঘাংচু যখন রাজার সাম্‌নে আসে, তখন তা'কে দেখ্‌তে দেখায় দাঁড় কাকের মত। সে যখন সভায় ঢোকে তখন সিংহাসনের ডান দিকে থামের উপর বসে, মাথা নীচু ক'রে দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে চোখ পাকিয়ে "কঃ" ব'লে শব্দ করে। আমি ত আর কিছু জানি না—তবে পণ্ডিতেরা যদি জানেন"— পণ্ডিতেরা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হ'য়ে বল্লেন, "না, না, ওর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নি।"

রাজা বল্লেন, "তোমায় খবর দেয়নি ব'লে কাঁদছিলে, তুমি থাক্‌লে কর্‌তে কি ?" লোকটা বল্‌ল, "মহারাজ, সে কথা বল্‌লে যদি লোকে বিশ্বাস না করে তাই বল্‌তে সাহস হয় না।"

রাজা বল্লেন, "যে বিশ্বাস করবে না তার মাথা কাটা যাবে—তুমি নির্ভয়ে ব'লে ফেল।" সভাশুদ্ধ লোক তা'তে হাঁ হাঁ করে সায় দিয়ে উঠ্‌ল।

লোকটা তখন বল্ল, "মহারাজ আমি একটা মন্ত্র জানি ; আমি যুগজন্ম ধ'রে বসে আছি দ্রিঘাংচুর দেখা পেলে সেই মন্ত্র তাকে যদি বল্‌তে পারতাম তা হ'লে কি যে আশ্চর্য্য কাণ্ড হ'ত তা কেউ জানেনা। কারণ, তার কথা কোন বইয়ে

লেখেনি। হায় রে হায়, এমন সুযোগ কি আর পাব?" রাজা বল্লেন, "মন্ত্রটা আমায় বলত।" লোকটা বল্ল, "সর্ব্বনাশ! সে মন্ত্র ড্রিঘাংচুর সাম্‌নে ছাড়া কারুর কাছে উচ্চারণ কর্‌তে নেই।" আমি একটা কাগজে লিখে দিচ্ছি—আপনি দুদিন উপোস ক'রে তিন দিনের দিন সকালে উঠে সেটা পড়ে দেখ্‌বেন। আপনার সাম্‌নে দাঁড় কাক দেখলে তাকে আপনি মন্ত্র শোনাতে পারেন, কিন্তু খবরদার আর কেউ যেন তা না শোনে—কারণ দাঁড়কাক যদি ড্রিঘাংচু না হয়, আর তাকে মন্ত্র বলতে গিয়ে অন্য লোকে শুনে ফেলে, তা হ'লেই সর্ব্বনাশ!"



··লোকজন সব তাড়িয়ে...মন্ত্র শোনাতেন

তখন সভা ভঙ্গ হ'ল. সভার সকলে এতক্ষণ হাঁ ক'রে শুন্‌ছিল; তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌ল; সকলে ড্রিঘাংচুর কথা, মন্ত্রের কথা আর আশ্চর্য্য ফল পাওয়ার কথা, বলাবলি করতে করতে বাড়ী চলে' গেল।

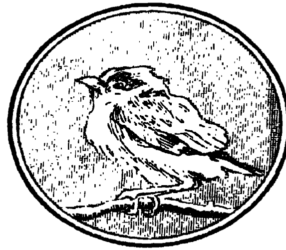
ড্রিঘাংচু

৺সুকুমার রায়চৌধুরী

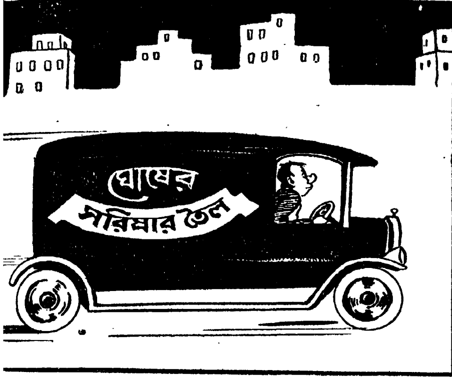
তারপর রাজা মশাই দু'দিন উপোস ক'রে তিন দিনের দিন সকাল বেলা সেই লোকটার লেখা কাগজখানা খুলে পড়লেন। তাতে লেখা আছে—

"হল্‌দে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁট পাটকেল চিৎ পটাং
মুস্কিল আসান উড়ে মালী
ধর্ম্মতলা কর্ম্মখালি।"

রাজা মশাই গম্ভীর ভাবে এটা মুখস্থ করে নিলেন। তারপর থেকে তিনি দাঁড়কাক দেখলেই লোকজন সব তাড়িয়ে তাকে মন্ত্র শোনাতেন, আর চেয়ে দেখতেন কোন রকম আশ্চর্য্য কিছু হয় কি না! কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তিনি ড্রিঘাংচুর কোন সন্ধান পা'ন নি।



—এক নিঃশ্বাসের গল্প—





লাগে ধাক্কা—





কাজ পাকা।

আকাশের আতঙ্ক



শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র

আজকালকার খবরের কাগজের দিনে আমরা নিত্যনূতন বিস্ময়কর খবর শুনতে শুনতে কিরকম মিথ্যা উত্তেজনার মধ্যে যে বাস করি,—একদিন যে খবর আমাদের অবাক করে দেয়, পরের দিন আরো বিস্ময়কর ঘটনায় সে খবর কেমন অনায়াসে আমাদের মনে চাপা পড়ে যায়, তার প্রমাণের অভাব নেই।

বেশীদূর যেতে হবে না। ১৯—সালের বৈশাখ মাসের কথা। খবরের কাগজগুলো একদিন সার চিরঞ্জীব রায়ের অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর খুনের মামলা নিয়ে তুমুল হৈ চৈ বাধিয়ে তুলেছিল। হপ্তাখানেক ধরে খবরের কাগজে আর অন্য কথাই বুঝি ছিল না। সোজা কথা ত নয়। স্বয়ং সার চিরঞ্জীবের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ। সার চিরঞ্জীব ইদানীং একটু যেন কেমন অবশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে মস্তিষ্ক-বিকৃতির একটা গুজব চারিধারে শোনা যেতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তা' বলে এতটা কেউ কি কল্পনাও করতে পারে! তাঁর পূর্ব্ব কীর্ত্তির কথা তখনও ত লোকে ভোলে নি। সার উপাধির দ্বারা ত তাঁর পরিচয় নয়, তাঁর পরিচয় বাঙ্গলার বরপুত্র ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একজন

বৈজ্ঞানিক হিসাবে। পৃথিবীর শৈশবাবস্থার সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর কঙ্কালের খোঁজে মধ্য এসিয়ায় তিনি যে বৈজ্ঞানিক অভিযানের নেতৃত্ব করেন, সে অভিযানের অসামান্য সার্থকতায় সমস্ত পৃথিবীর কাছে বাঙ্গলার মুখ উজ্জ্বল হয়েছিল। বাঙ্গলা দেশ থেকে এরকম অভিযান যে হতে পারে তা কেউ আগে ভাবতে পারেনি। তাঁর দ্বিতীয় অভিযান প্রাণীতত্ত্ববিষয়ক গবেষণার জন্যে নিউ-গিনীর অনাবিষ্কৃত প্রদেশে। সে অভিযানের ফলে প্রাণীবিদ্যা আশাতীতভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল বটে কিন্তু তারপর থেকেই তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ বুঝি দেখা দেয়। তাঁর অদ্ভুত সব নতুন মতামত শুনে বৈজ্ঞানিক সমাজ তাঁর মাথা ঠিক আছে কিনা সন্দেহ প্রকাশ করে। সার চিরঞ্জীব চিরদিন অত্যন্ত অহঙ্কারী প্রকৃতির। খ্যাতির শিখরে যতদিন তিনি ছিলেন ততদিন তার প্রতিভার খাতিরে এ অহঙ্কার সকলে নিঃশব্দে সহ্য করেছে, কিন্তু তাঁর মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচয় যেদিন তাঁর অদ্ভুত কথাবার্ত্তা ও মতামতের মধ্যে পাওয়া যেতে লাগল, সে দিন কেউ কেউ যে আগেকার আক্রোশের শোধ নিতে ছাড়লে না একথা বলাই বাহুল্য। কাগজে তাঁকে নিষ্ঠুর ভাবে ব্যঙ্গ করে অনেক প্রবন্ধও বেরুল। প্রাচীন যুগের বিলুপ্ত এক ডাইনোসরের পিঠে চড়ে সার চিরঞ্জীব সহরের পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এই ব্যঙ্গ চিত্রটি তখনকার দিনে বিশেষ হাসির খোরাক জুগিয়েছিল। ব্যঙ্গ চিত্রটি অকারণে আঁকা হয়নি। বুদ্ধি ভ্রংশের সঙ্গে সার চিরঞ্জীবের অদ্ভুত এক ধারণা হয়েছিল যে, মেসোজোইক যুগের সরীসৃপের কঙ্কাল বলে বৈজ্ঞা-নিকেরা যেগুলি লক্ষাধিক বছরের পুরাণ মনে করেন সেগুলি নাকি অত পুরাণ মোটেই নয়। তিনি নাকি এমন সব ডাইনোসরের হাড় পেয়েছেন যেগুলিকে আধুনিক কালের বলে নিশ্চিৎ বোঝা যায়। তা ছাড়া তাঁর মতে সরীসৃপ বংশ নাকি এখনো একেবারে লুপ্ত হয়নি।

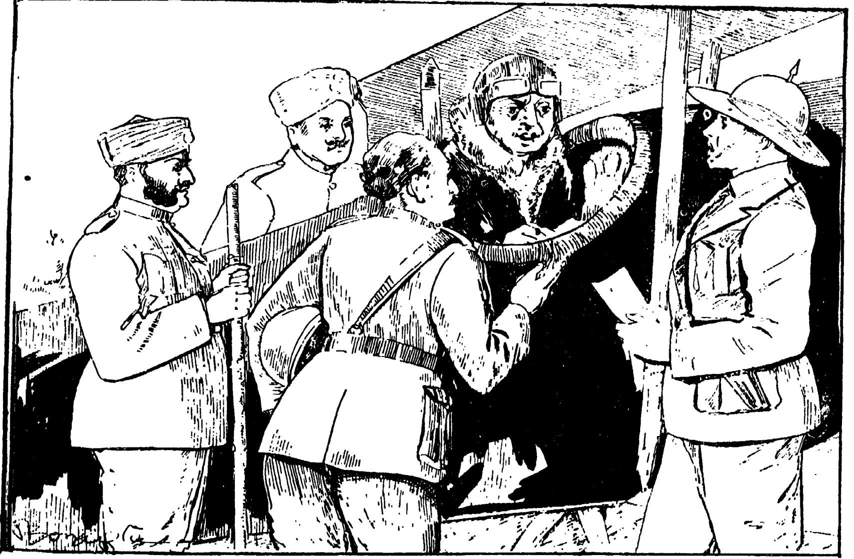
নানা দিক থেকে আঘাত খেয়ে, আহত অভিমানের জন্যেই কিনা বলা

যায় না সার চিরঞ্জীব শেষাশেষি একেবারে নিঃসঙ্গই থাকতে আরম্ভ করেছিলেন। সহরের সীমা ছাড়িয়ে তাঁর নির্জ্জন বিশাল বাড়ীর পরীক্ষাগারের বাইরে তাঁর আর দেখাই পাওয়া যেত না। নিজেকে যেন তিনি সেখানে জীয়ন্তে কবর দিয়ে ছিলেন। মাঝে মাঝে কোন কাগজ মজা করবার জন্য বা অনুগ্রহ করে তাঁর যে দু' একটা লেখা ছাপত তাতেই তাঁর অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যেত। সে সমস্ত লেখায় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যে মানসিক বিকৃতির লক্ষণ দেখা যেত তাতে শত্রুপক্ষ হাসলেও অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক সমাজ এত বড় মনিষীর এমন পতনে বেদনাই অনুভব করতেন। কিন্তু ঘরে বসে আজগুবি সব ধারণা নিয়ে প্রবন্ধ লেখা এক কথা আর মানুষ খুনের দায়ে আসামী হওয়া আরেক কথা। একথা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

সে ঘটনার কথা মনে করলেও গা শিউরে ওঠে। শুধু সাধারণ হত্যা সেত নয়, তার ভেতর যে উন্মত্ত পৈশাচিকতার পরিচয় ছিল তাতেই সকলে বেশী স্তম্ভিত হয়ে গেছল। সার চিরঞ্জীবের নির্জ্জন বাগান বাড়ীতে হঠাৎ একদিন তাঁর একটি ভৃত্যকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। সাধারণ ভাবে সে খুন হয়নি। বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া অমন নৃশংস ভাবে নর-হত্যা কেউ করতে পারে না। চাকরটির দুটি চোখ ওপড়ান এবং তার সর্ব্বাঙ্গের আঘাত দেখে মনে হয়, ধারাল অস্ত্র দিয়ে কেউ যেন তার সারা গায়ের মাংস উন্মত্ত ভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে।

সার চিরঞ্জীবের বিরুদ্ধে এ সম্পর্কে সব চেয়ে সন্দেহের কারণ এই যে, তাঁকে যখন ধরা হয় তখন তিনি দমদম থেকে একটা এরোপ্লেন ভাড়া করে পালাবার চেষ্টা করছেন। পুলিশ খুব তৎপরতার সঙ্গে কাজ না করলে তাঁকে ধরতেই পারত না। এরোপ্লেনে তিনি উঠে বসে চালাবার উদ্যোগ করেছেন, এমন সময়ে পুলিশ দ্রুতগামী মোটরে গিয়ে তাঁকে ধরে। পুলিশের আদেশেও প্রথম তিনি নামতে রাজী হন নি, এবং তাদের সামনেই প্রপেলার চালিয়ে দিয়ে

উড়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। বাধ্য হয়ে পুলিশ অফিসার তখন গুলি করে তাঁর প্রপেলার ভেঙ্গে দিয়ে তাঁকে থামায়। এরোপ্লেনে তাঁর সঙ্গে একটি বন্দুকও পাওয়া গেছল।



এরোপ্লেন থেকে নামবার পরও তাঁর রোক কমেনি। পুলিশের লোককে যা নয় তাই বলে গাল দিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে ছেড়ে দেবার জন্যে জেদ করেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলে কিছুই বলতে চান না। তাঁর চাকরের হত্যা সম্বন্ধেও তাঁকে জিজ্ঞাসা করে কোন উত্তর পাওয়া যায় না।

মস্তিষ্ক-বিকৃতির পর তাঁর অহঙ্কারী প্রকৃতি যেন আরো উগ্র হয়ে উঠেছিল। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন যে, তাঁকে যখন অকারণে ধরে অপমান করা হয়েছে তখন তাদের কোন কথার আর তিনি জবাব দেবেন না।

এই বিখ্যাত নর-হত্যার মামলা আদালতে ওঠার পর কয়েক দিন পর্য্যন্ত খবরের কাগজগুলির উত্তেজনার আর অবধি ছিল না। মানুষের মুখে মুখেও এই উন্মাদ বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে নানান অতিরঞ্জিত আজগুবি খবর তখন ফিরেছে!

তারপর এই রোমাঞ্চকর হত্যার খবর কোথায় যে গেল তলিয়ে কেউ সন্ধানও রাখলে না। দার্জ্জিলিংয়ের বিমান-ডাকের ভয়ঙ্কর রহস্য তখন মানুষের মন ও সংবাদপত্রের পাতা জুড়ে বসেছে। তখন সবে কল্‌কাতা থেকে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত এরোপ্লেনে ডাক পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই ডাকবাহী বিমানপোত আশ্চর্য্য ভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল একদিন। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর ঘন টেরাইএর জঙ্গলে ভাঙ্গা এরোপ্লেনটির সন্ধান যদিবা মিলল তার চালকের কোন পাত্তা নেই। কেমন করে যে এরোপ্লেনটি ধ্বংস হল তারও কোন সন্তোষজনক মীমাংসা হল না।

শুধু এই ব্যাপারেই শেষ হ'লে হয়ত সাধারণের আতঙ্ক এত বেশী হত' না। কিন্তু এ ব্যাপারের রহস্য আরো গভীর হয়ে উঠল পরের ঘটনায়। একজন ইংরাজ বিমানবীর জলপাইগুড়ি থেকে এরোপ্লেনে কলকাতা আসছিলেন তারপরের দিন ভোরের বেলা। কিন্তু যাত্রা করবার খানিক বাদেই তাঁর এরোপ্লেনটিও অদ্ভুত ভাবে ভেঙ্গে পড়ে তিস্তা নদীর ওপর। তিস্তার অনেক জেলে নৌকো থেকে তাঁর পড়ার দৃশ্য দেখেছিল। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানা যায় যে, ভোরের আগে আবছা অন্ধকারে তারা চোখে ভাল না দেখতে পেলেও এরোপ্লেনের আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল। হঠাৎ

আকাশের আতঙ্ক
শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঊর্দ্ধ আকাশ থেকে কি রকম বেয়াড়া ভাবে এরোপ্লেনটি মাতালের মত পাক খেতে খেতে নামতে থাকে। নীচে নেমেও এরোপ্লেনটি আর একবার ওপরে গোঁত্তা খাওয়া ঘুড়ির মত উঠেছিল; কিন্তু বেশী দূর নয়। তারপর সশব্দে তিস্তার জলে সেটি ভীষণ বেগে এসে পড়ে। এবারে এরোপ্লেনের ভেতর ইংরাজ চালকের মৃতদেহ পাওয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তার সমস্ত মুখ ক্ষত বিক্ষত এবং একটি চোখ খোবলান।

এই ভয়ঙ্কর খবর বাসি হতে না হতেই পরের দিন সংবাদ পাওয়া যায় যে, দার্জ্জিলিং থেকে সন্ধ্যায় ফেরার সময় আরেকটি ডাকবাহী বিমানপোত টেরাই জঙ্গলের ওপর পূব দিকের আকাশপ্রান্তে দুটি অদ্ভুত আকারের বিমানপোত দেখেছে। ভাল করে লক্ষ্য করবার আগেই সেগুলি সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে যায়।

এই রহস্যময় দুটি অজানা বিমানপোতের খবরে এবার দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত সাড়া পড়ে গেল। ভাল করে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে আই, এন, এ অর্থাৎ 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল এয়ারওয়েজে'র জানিত কোন এরোপ্লেন সেদিন ওদিকে যায় নি। তা ছাড়া বিমান ডাকের চালক যে রকম বর্ণনা দিয়েছিল সে ধরণের বিমানপোত ভারতের কোথাও নেই।

নূতন এই আতঙ্কের হুজুগে সার চিরঞ্জীব রায়ের মামলা কোথায় যে চাপা পড়ে গেল কে জানে। খবরের কাগজের কোণে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লোকের বোধ হয় আর চোখেও পড়ে না।

প্রত্যেকে আমরা তখন খবরের কাগজ খুলেই এরোপ্লেন-রহস্যের সংবাদ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়তে আরম্ভ করি; প্রতিদিন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি এ রহস্যের ওপর নতুন কোন আলোকসম্পাত হ'ল কিনা তা জানার আশায়!

হাজার রকমের গুজব ও আলোচনা চারিধারে চলতে থাকে। এ অদ্ভুত

আকাশের আতঙ্ক

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র

অজানা বিমানপোত দুটি কাদের? যে দুটি এরোপ্লেন আশ্চর্য্য ভাবে ধ্বংস হয়েছে তাদের ভেঙে পড়ার সঙ্গে এদের সম্পর্ক আছে কিনা? আপাততঃ কোন দেশের সঙ্গে যখন আমাদের কিম্বা কারুর যুদ্ধ বা বিরোধ নেই, তখন এমন ভাবে কারা নিরীহ আকাশ-পথের যাত্রীদের আক্রমণ করছে, তাদের উদ্দেশ্যই বা কি? এ সমস্ত প্রশ্নের কোন উত্তরই কেউ দিতে পারলে না। শুধু চারিধারে আতঙ্কই বেড়ে যেতে লাগল।

আই, এন, এ, বাধ্য হয়ে বাঙ্গলার উত্তরাঞ্চলে রাত্রে এরোপ্লেন চালান নিষেধ করে দিলে, কারণ দেখা গেল যে বেশীর ভাগ দুর্ঘটনা রাত্রে ওই অঞ্চলেই ঘটছে। ডাকবাহী বিমানপোত ও ইংরাজ চালকের এরোপ্লেনের পর আরো তিনটি এরোপ্লেন ওই অঞ্চলে রাত্রে ভেঙে পড়ে। অধিকাংশ আরোহীর পাত্তা পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেলেও দেখা গেছল তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন।

শুধু আকাশ পথের এরোপ্লেনই নয় সাধারণ লোকও আক্রান্ত হয় কেউ কেউ। রঙ্গপুরের একটি গ্রামের রাস্তায় একদিন সকালে একজন চাষীর ক্ষত বিক্ষত দেহ দেখতে পাওয়া যায়। সে তার হারান বলদের খোঁজে রাত্রে বাইরে বেরিয়েছিল। অনেকে অবশ্য এ ব্যাপারটির সঙ্গে রহস্যময় এরোপ্লেন দুটির কোন সংশ্রব আছে তা স্বীকার করতে চান না। কিন্তু সেই গ্রামের একজন বৃদ্ধ বলে যে সেদিন রাত্রে আকাশে অদ্ভুত একরকম আওয়াজ সে শুনেছিল।

সত্য মিথ্যা নানা রকম খবর এইবার রটতে থাকে। হুজুকের দিনে খবরের কাগজগুলি বাচবিচার না করে তার সবগুলিকেই প্রায় স্থান দেয় নিজের পাতায়। আমাদের কাগজের মফঃস্বল বার্ত্তাগুলি একেই যত গাঁজাখুরী সংবাদের ডিপো। মফঃস্বলের প্রতিনিধিরা সুযোগ পেয়ে যা খুসী আষাঢ়ে-গল্প সেখানে চালাতে লাগল। কোথায় জলপাইগুড়ি অঞ্চলের এক গাঁয়ে এক

আকাশের আতঙ্ক
শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র

বুড়ির একটা বাছুর হারিয়েছে। মফঃস্বল বার্ত্তার তার খবরের সঙ্গেও বেরোল যে সে বুড়ি নাকি দেখেছে আকাশ থেকে প্রকাণ্ড একটা কি জিনিষ নেমে তার বাছুরকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে।

বন্ধু অশোক রায়ের বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম সেদিন সকালবেলা। এই খবরটা হঠাৎ চোখে পড়ায় হেসে উঠে অশোককে বল্লাম,—"খবরটা দেখেছো। এরপর কোনদিন শুনব আকাশ থেকে কি একটা নেমে কার হেঁসেল থেকে মাছ ভাজা চুরি করে নিয়ে গেছে। আমাদের দেশে একটা কিছু হুজুগ হলেই হ'ল।"

অশোক রায় কাগজটা আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে, খবরটার ওপর চোখ বুলিয়ে কিন্তু গম্ভীর মুখেই বল্লে,—হুঁ; আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি শুধু আই, এন, এ, বা আর কেউ এ সম্বন্ধে কিছু এখনো করছে না দেখে।

ঠাট্টা করেই বল্লাম—"বেশ ত তোমার ত নিজের প্লেন রয়েছে। তুমিই এ আজগুবি এরোপ্লেনের রহস্য ভেদ করবার জন্য লাগোনা?"

ঠাট্টা করে যে কথা বলেছিলাম, অশোক অত্যন্ত গম্ভীর মুখে তার যা উত্তর দিলে তা শুনে প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

অশোক বল্লে—"লাগবোই ত ঠিক করেছি।"

খানিকক্ষণ আমার মুখ দিয়ে সত্যিই কথা বেরুল না: তারপর অস্ফুট স্বরে বল্লাম—"তুমি পরিহাস করছ নিশ্চয়ই?"

"না পরিহাস নয়, সত্যিই আমি যাবো ঠিক করেছি এবং আজই।"

আমি এবার ব্যাকুল স্বরে বল্লাম—"কিন্তু তুমি সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে দেখেছ? এ পর্য্যন্ত কতজন বৈমানিক মারা গেছে জানো! তাদের মধ্যে ওস্তাদ সমস্ত বিমানবীরও ছিল। তুমি ত সবে সেদিন 'বি' সার্টিফিকেট

পেয়েচ। তা ছাড়া তোমার প্লেনও ডাকের উড়ো-জাহাজগুলির তুলনায় অনেক খারাপ।

অশোক বল্লে—"বিপদ আছে জেনেই ত যাচ্ছি।"

আমি আর একবার তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম—"বিপদ যে কতখানি তা কিন্তু তুমি বোধ হয় বুঝতে পারছ না। এই রহস্যময় এরোপ্লেনগুলি যারা চালাচ্ছে তারা যেমন পৈশাচিক ভাবে নিষ্ঠুর তেমনি ধূর্ত্ত ও শক্তিমান। আই, এম, এ, কিছু করছে না এমন ত নয়; তারা দল বেঁধেও কিছু করতে পারছে না এদের বিরুদ্ধে। তারা যেখানে অক্ষম তুমি সেখানে একলা কি করতে পার!"

অশোককে কিন্তু নিরস্ত করা গেল না, সে শুধু অদ্ভুত এক উত্তর দিলে—. "হয়ত আই, এন, এর চেয়ে আমি এ ব্যাপারের মর্ম্ম বেশী বুঝি। অন্ততঃ কোথায় তাদের দেখা পাব তা আমি জানি।"

তার কাছ থেকে আর কোন কথা না বার করতে পেরে আমি অবশেষে হতাশ হয়ে বল্লাম—"নেহাতই যখন যাবে তখন আমি তোমার সঙ্গ ছাড়ছিনে।"

অশোক খানিকক্ষণ আমার দিকে নীরবে চেয়ে থেকে বল্লে, "এ প্রস্তাব তোমার কাছ থেকে আমি আশা করছিলাম।"

সেই দিন দুপুরেই অশোকের প্লেনে আমরা কলকাতা থেকে রওনা হলাম। অশোকের প্লেনটি খুব দামী নয় কিন্তু বেশ মজবুত। টেনে টুনে তাকে ঘণ্টায় ১৭৫ মাইলও চালান যায়। সামনে অশোকের ও পেছনে আমার সীট। অশোকের অনুরোধে একটি রাইফেল ও একটি রিভলবার নিয়ে আমায় উঠতে হয়েছে। এ ছাড়া আরেকটি জিনিষ সে যে কেন সঙ্গে আনতে বলেছিল কিছুই বুঝতে পারিনি। সেটি একটি লোহার শিরস্ত্রাণ, মধ্য যুগের ধরণে তৈরী। আই, এন, এ রাত্রে এরোপ্লেন চালান নিষিদ্ধ করে দিয়েছে সেই জন্যে আমরা ঠিক করেছিলাম—প্রথমে গন্তব্য স্থানে দিনের বেলা পৌঁছে, গোপনে রাত্রে কাজ আরম্ভ করব।

আকাশের আতঙ্ক

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র

গন্তব্য স্থান অবশ্য আমার জানা ছিল না। উত্তর দিকে যাত্রা করে ঘণ্টা কয়েক বাদে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকোটায় পৌঁছে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এত জায়গা থাকতে এই সহরটিকে অশোকের বেছে নেবার কারণ তখনও আমি বুঝতে পারিনি।

কিন্তু নাগরাকোটার প্রধান অসুবিধা হল এরোপ্লেন নামাবার জায়গা নিয়ে। দিনের বেলা নগরের বাইরে যে ফুটবলের মাঠে আমরা নেমেছিলাম রাত্রে অন্ধকারে তাতে অবতরণ করা অসম্ভব। অনেক খোঁজা খুঁজির পর দূরের একটি গাঁয়ের ধারে প্রকাণ্ড একটা বাঁজা মাঠ পাওয়া গেল, কিন্তু জোরালো আলোর বন্দোবস্ত না করতে পারার দরুণ প্রথম রাত্রে আমাদের কিছু করা আর হল না। দ্বিতীয় রাত্রে যথাসম্ভব জোরালো দুটি পেট্রলের আলো মাঠের দুধারে চিহ্ন হিসাবে রেখে মাঝ-রাত্রে আমরা আকাশে উঠলাম।

সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির কথা কোন দিন বোধ হয় ভুলতে পারব না। উত্তেজনার ঝোঁকে এতদূর এগিয়ে এলেও সেই সময়ে মনে যে একটু দ্বিধা না হয়েছিল এমন নয়। যে রহস্যময় শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা অভিযান করছি, তাদের নৃশংসতার ও শক্তির পরিমাণ আমাদের অজানা নয়। নিজেদের সামান্য শক্তি নিয়ে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কি করতে পারব! মনে হচ্ছিল এশুধু গোঁয়ার্ত্তুমি করে মৃত্যুকে ডেকে আনা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তখন আর পেছুবার সময় নেই।

জয়ষ্টিক টেনে ধরার সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জন করে এরোপ্লেন তখন মাটি ছাড়িয়ে উঠেছে। একটি মাত্র ক্ষীণ আশা তখনও মনের মধ্যে আছে,—হয়ত সত্যিই আমরা কোন কিছুর দেখা নাও পেতে পারি। কিন্তু সে আশাও সফল হবার নয়।

দেখতে দেখতে এরোপ্লেন কয়েকবার পাক খেয়ে অনেক উর্দ্ধে উঠে পড়ল। নাগরাকোটা সহরের ক্ষীণ আলো দূরে থাক আমাদের নামবার

আকাশের আতঙ্ক

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র

মাঠের চড়া আলোও তখন প্রায় অস্পষ্ট হয়ে গেছে। যা কিছু আলো আমাদের মাথার ওপর। সেখানে তারায় ভরা আকাশ ঝলমল করছে। শুক্ল পক্ষের দশমী না একাদশী তিথির ভাঙা চাঁদের সামান্য একটু লালচে রেখা পশ্চিমের দিগন্তে দেখা যাচ্ছিল। মাটির ওপর থেকে সে চাঁদ অনেক আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমরা অনেক উঁচুতে উঠেছিলাম বলে এখনো তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। সে রেখাও খানিক বাদে মুছে গেল। তারাগুলির আলো ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। নীচে সমস্ত পৃথিবীর ওপর গাঢ় কালীর ছোপ। সে ছোপ কোথাও কোথাও বেশী গাঢ় কোথাও বা একটু ফিকে। সেই সামান্য একটু রঙের তারতম্য থেকেই আমরা মাঠ গ্রাম ও জঙ্গলকে যথা সম্ভব আলাদা করে ধরতে পারছিলাম।

সহরের ওপর কয়েকবার চক্কর দিয়ে অশোক উত্তরের জঙ্গলের ওপর প্লেন চালিয়ে এনেছিল। আমাদের গতি তখন খুব বেশী নয় ঘণ্টায় আন্দাজ আশী মাইল বেগে মাটি থেকে হাজার তিনেক ফিট ওপরে আমরা বিশাল বৃত্তাকারে জঙ্গলের ওপর পাক খাচ্ছিলাম। গ্রীষ্মকালে, উপযুক্ত বৈমানিকের পোষাক থাকা সত্বেও, ঝড়ের মত যে হাওয়া আমাদের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল তাতে শীত করছিল। মোটরের গর্জ্জন ছাড়া আর কিছু শব্দ নেই; তারা খচিত অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখবার নেই।

খানিকক্ষণ বাদে এই একঘেয়েমিতে যেন বিরক্তি ধরে গেল। মোটরের আওয়াজের ভেতর কথা কইবার সুবিধের জন্যে অশোকের ও আমার বসবার জায়গার মধ্যে দুটো চোঙ্ লাগান রবারের নল আমরা লাগিয়ে নিয়েছিলাম। সেই চোঙের ভেতর দিয়ে বল্লাম—"এ রকম ভাবে কতক্ষণ ঘুরবে! এতে লাভই বা কি!"

অশোক চোঙের ভেতর দিয়ে উত্তর দিলে—"অত অধীর হোয়ো না। রাত্রে ওড়ার একটা আনন্দও ত আছে।"

আকাশের আতঙ্ক
শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র

আমার কিন্তু এটাকে ঠিক আনন্দ বলে মনে হচ্ছিল না। যাই হোক এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা বলে চুপ করে গেলাম। তারপর কতক্ষণ যে আমরা সেই এক ভাবে চক্কর দিয়েছিলাম তা বলতে পারিনা। পূবের আকাশ যখন একটু ফিকে হয়ে আসছে প্রভাতের সূচনায় তখন আমার খেয়াল হল। আবার চোঙ্গের ভেতর দিয়ে বল্লাম—"সকাল ত হতে চলল। আর কতক্ষণ ঘুরবে এমন করে?

চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব এল,—"শীগ্‌গীর তোমার শিরস্ত্রাণ পরে ফেলে প্রস্তুত হয়ে বস।"

সত্যি সত্যিই সেই কথায় একটা ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত যেন সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে বয়ে শিউরে দিয়ে গেল।

কম্পিত স্বরে বল্লাম—"দেখতে পেয়েছ।"

"হ্যাঁ আমাদের দক্ষিণে চেয়ে দেখ। আমি এরোপ্লেনের বেগ বাড়িয়ে আরো ওপরে উঠছি। সেখান থেকে ওদের ওপর ছোঁ মেরে পড়তে চাই—অবশ্য যদি ওদের বেগ আমাদের চেয়ে বেশী না হয়।"

এরোপ্লেন হঠাৎ কার্ণিক খেয়ে ওপর দিকে নাক তুলে প্রচণ্ড বেগে ঊর্দ্ধে উঠতে লাগল সেই মুহূর্ত্তে আমিও দেখতে পেলাম। অন্ধকার তখনও বেশ গাঢ় কিন্তু তারই ভেতর দুটি বিশাল আবছায়া অদ্ভুত মূর্ত্তি বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল।

কিন্তু এগুলি কি ধরণের এরোপ্লেন। আমি এ রকম এরোপ্লেনের কথা কখন শুনি নি। সামনে তার কোন প্রপেলার আছে কি না বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু অনেকটা বাদুড়ের ধরণে তাদের দুধারে ডানা যে ওঠা-নামা করছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ পদ্ধতিতে কোন এরোপ্লেন নির্ম্মিত হতে পারে তা আমার জানা ছিল না।

আকাশের আতঙ্ক

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র

এরোপ্লেন দুটির আকৃতিও অদ্ভুত। অস্পষ্টভাবে যেটুকু দেখতে পাচ্ছিলাম তাতে মনে হল কোন সাধারণ প্লেনের সঙ্গে তাঁদের কোন মিল নাই।

তাদের বেগ বেশী হোক বা না হোক, আশ্চর্য্য তাদের ঘোরা ফেরার কৌশল। সাধারণ এরোপ্লেনকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে মোড় ফিরতে হয় কিন্তু এরা যেন যে কোন জায়গা থেকে যেদিকে খুশী হঠাৎ বাঁক নিতে পারে। সামনে যেতে যেতে হঠাৎ ডিগবাজি খেয়ে সোজা পেছন দিকে যাওয়া এদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ।

সবেগে এরোপ্লেন চালিয়েও এই কৌশলের জন্যেই কিছুতেই আমরা তাদের বিরুদ্ধে সুবিধা করতে পারছিলাম না। ওপর থেকে তাদের কাছ দিয়ে চিলের মত ছোঁ মেরে নামবার আগেই তারা অদ্ভুত কৌশলে আমাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছিল। গুলি করবার মত নাগালের মধ্যে তাদের কিছুতেই পাচ্ছিলাম না।

প্রথমে ভেবেছিলাম তারাও বুঝি দূর থেকে আমাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে পারে। কিন্তু সেরকম কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তারা যেন শুধু কোন রকমে আমাদের প্লেনের ল্যাজের দিকটা আক্রমণ করবার ফিকির খুঁজছে মনে হল।

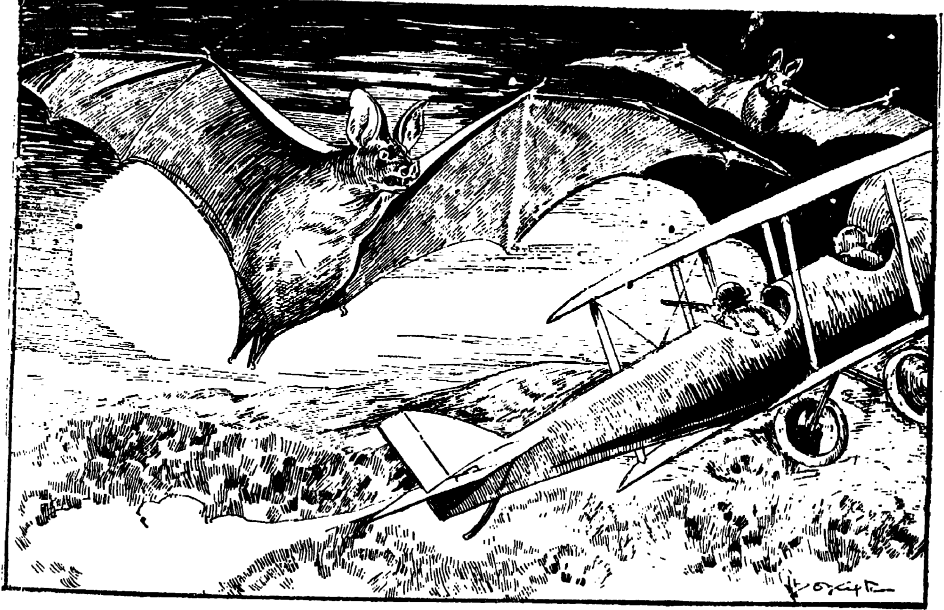
বন্দুক বা কোন অস্ত্র তারা কেন যে ব্যবহার করে নি তা অবিলম্বেই বুঝলাম, এবং সেই সঙ্গে সত্যই আতঙ্কে ওই ঝোড়ো হাওয়ার ভেতরেও আমি এতক্ষণে ঘেমে উঠলাম।

পূবের আকাশ ফিকে হ'তে হ'তে তখন বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আকাশের তারা ম্লান আর নীচের মাঠ গ্রাম জঙ্গল স্পষ্ট হয়ে আসছে। এমন সময় আমাদের প্লেন তাদের শ' দুয়েক গজের মধ্য দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম— যাদের এরোপ্লেন ভেবেছিলাম তারা মানুষের

আকাশের আতঙ্ক

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র

তৈরী কোনপ্রকার যন্ত্র নয়, কল্পনাতীত একরকম প্রাণী, অতি বড় দুঃস্বপ্নেও যাদের রূপ ভাবা যায় না। আবছা অন্ধকারে তাদের অতিকায় বাদুড়ের মত দেহ ও



হিংস্র দাঁতাল মুখের যে আভাষ আমি পেয়েছিলাম, তার সঙ্গে অতীত বা বর্ত্তমানের কোন প্রাণীরই মিল নেই।

নিজের চোখকে প্রথমটা বিশ্বাস করা শক্ত হলেও খানিকক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম, ভুল আমার হয় নি। যতই অবিশ্বাস্য হোক সত্যই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর দুটি প্রাণীর সঙ্গে আমাদের আকাশ-যুদ্ধে নামতে হয়েছে।

আকাশের আতঙ্ক

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র

অশোক নলের ভেতর দিয়ে উত্তেজিত স্বরে বল্লে—"কার সঙ্গে লড়তে হবে এবার বুঝতে পেরেছ !"

আমি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি কি আগেই জানতে ?"

উত্তর এল—"না ঠিক জানতাম না, কিন্তু একটু আঁচ করেছিলাম।"

আর আমাদের কোন কথা হল না। কথা কইবার আর সময়ও ছিল না। অন্ধকার কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শত্রুদের চেহারা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। পরস্পরকে বাগে পাওয়ার জন্যে তখন আকাশে তাদের সঙ্গে আমাদের প্লেনের অদ্ভুত প্রতিযোগিতা চলেছে। কিন্তু সে প্রতিযোগিতায় আমরাই যেন ক্রমশঃ বেকায়দায় পড়ছিলাম মনে হচ্ছিল।

আমাদের এরোপ্লেনের, গতি হয়ত তাদের চেয়ে বেশী কিন্তু তাদের ওড়বার কৌশল আমাদের চেয়ে ভালো। আমি এর মধ্যে কয়েকবার দূর থেকে বন্দুক চালিয়েছি। কিন্তু তাতে কিছু সুবিধে হয় নি। পাখার নানারকম কায়দায় উল্টেপাল্টে তারা শুধু আমাদের এড়িয়েই যাচ্ছিল না, দুটোতে আমাদের দুপাশে সরে গিয়ে আমাদের পেছন দিকে আক্রমণ করবার সুযোগও করে নিচ্ছিল।

কিন্তু আক্রমণের কৌশল যে তাদের অমন হবে, আক্রান্ত হবার আগের মুহূর্ত্ত পর্যন্ত্য আমরা ভাবতে পারিনি। খানিক আগেই একবার সুবিধে পেয়ে আমি তাদের একটির পাৎলা চামড়ার ডানা গুলিতে ফুটো করে দিয়েছিলাম। তাতে সে খুব বেশী জখম হয়নি কিন্তু যে ভয়ঙ্কর চীৎকার ছেড়েছে, আমাদের মোটরের গর্জ্জন ছাপিয়েও তীক্ষ্ণ ভাবে তা আমাদের কাণে এসে বিঁধেছে। আমাদের প্লেন একটিকে পাশে রেখে তাদের আরেকটির শ'দুএক ফুট তলা দিয়ে এখন যাচ্ছিল। আমি ওপর দিকে লক্ষ্য রেখে বন্দুকও ছুড়েছিলাম। হঠাৎ ভয়ঙ্কর ভাবে আমাদের প্লেন দুলে উঠে পাক খেতে খেতে নীচের দিকে

প্রচণ্ড বেগে পড়তে সুরু করল। প্লেনের সীটের ধারটা সজোরে সে সময়ে ধরে না ফেললে আমি বোধহয় ছিটকেই পড়ে যেতাম।

হল কি? কি আর হবে। শকুনেরা যেমন করে উঁচু থেকে নামবার সময় পাখা মুড়ে ভারী জিনিষের মত অনেকদূর দ্রুতবেগে পড়ে যায় ঠিক তেমনি ভাবে সেই বিশাল প্রাণীটি আমাদের পেছনের পাখার ওপর এসে পড়েছে। এই সুযোগেরই সে অপেক্ষা করছিল।

প্রথমটা সত্যই আমি বিমূঢ় হয়ে গেছলাম, এই আক্রমণের আকস্মিকতায় ও বিপদের ভীষণতায়। হাতের বন্দুকটা তুলে ধরবার কথাও আমার মনে ছিল না। প্লেন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল বিদ্যুৎ বেগে নীচের মাঠ ঘাট জঙ্গল আমাদের দিকে ছুটে আসছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মাটিতে আছাড় খেয়ে যখন মরতেই হবে তখন আর বন্দুক ছুঁড়ে লাভ কি।

কিন্তু সে বিমূঢ়তা আমার কেটে গেল অশোকের কথায়। সে তাহলে মাথা ঠিক রেখেছে এত বিপদের ভেতরেও। চোঙের ভেতর দিয়ে সে চীৎকার দিয়ে বল্লে,—"দেখছ কি? গুলি কর, আমি প্লেন সামলে নিচ্ছি।"

এইবার সামনে আমি ভাল করে চেয়ে দেখলাম। সে দিকে চেয়ে অবশ্য মাথা ঠিক রাখা শক্ত। সামনের ও পেছনের পায়ের হিংস্র নখরে আমাদের প্লেনের পেছনের দিকটা আঁকড়ে ধরে একটু একটু করে সেই ভয়ঙ্কর প্রাণী আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার হিংস্র দাঁতাল মুখ একেবারে আমার সামনে। জানোয়ারটিকে বর্ণনা করা কঠিন। অতিকায় একটা গোসাপের সামনের পা দুটো থেকে বাদুড়ের মত পাৎলা চামড়ার ডানা বেরিয়েছে বল্লে তার খানিকটা বর্ণনা হয় কিন্তু তার হিংস্র মুখের ও সাপের মত কুটিল ভয়ঙ্কর চোখের ভীষণতা বোঝান যায় না।

অশোক সামলাবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তখন আমাদের প্লেন পেছনের

ল্যাজের ভারে টাল হারিয়ে একেবারে মাটির কাছাকাছি এসে পড়েছে। সেই সময়ে দাঁতে দাঁত চেপে সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে আমি বন্দুকের নলটা সেই হিংস্র প্রাণীর একেবারে দাঁতাল মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম, এবং তারপরই দুটো ঘোড়াই দিলাম পর পর টিপে।

আর কিছু দরকার হল না। প্লেনের ওপর একবার একটু নড়ে উঠেই জানোয়ারটা গড়িয়ে পড়ে গেল নীচে। আমাদের বিমানপোতও মাটিতে আছাড় খেতে খেতে হঠাৎ তীরের মত ওপরে উঠে গেল ভার মুক্ত হয়ে।

পূবের আকাশ তখন লাল হয়ে উঠেছে। কপালের ঘাম মুছে আমি চোঙের ভেতর দিয়ে বল্লাম, "এবার ত নামতে হয়!"

অশোক বল্লে—"না আরেকটা যে এখানো বেঁচে আছে।"

"—কিন্তু আমার বন্দুক সে জানোয়ারটার সঙ্গে পড়ে গেছে।"

"বন্দুক পড়ে গেছে।"—সবিস্ময়ে চীৎকার করে উঠে অশোক খানিক চুপ করে রইল, তার পর আবার বল্লে,—"তাহলেও ফেরা যায় না। এমন সুযোগ আর কখন পাব কি না সন্দেহ। এ ভীষণ জানোয়ার বেঁচে থাকলে আরো কত সর্ব্বনাশ করবে কে জানে! তুমি প্যারাসুট দিয়ে নামবার জন্যে প্রস্তুত থাক।"

সে যে কি করতে চায় কিছুই বুঝতে না পেরে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আর একটি জানোয়ারের নাগাল আমরা তখন প্রায় ধরে ফেলেছি। চারিদিক আলোকিত হয়ে ওঠার দরুণ কিম্বা, তার সঙ্গীর মৃত্যু টের পেয়ে ভয় পেয়ে কি না বলা যায় না, সে তখন আক্রমণের বদলে পালাবার ফিকিরই খুঁজছে। বিশাল পাখাগুলো সবেগে আন্দোলিত ক'রে পশ্চিম দিকের ঘন জঙ্গলের দিকেই সে যাবার চেষ্টা করছে মনে হল।

অশোক হঠাৎ চোঙের ভেতর দিয়ে বল্লে,—"লাফিয়ে পড় এইবার।"

কিন্তু লাফাব কি, আমি তখন অশোকের কাণ্ড দেখে বিমূঢ় হয়ে গেছি। আমাদের প্লেন সোজা সেই জানোয়ারটির দিকে বন্দুকের গুলির মত ছুটে চলেছে। যন্ত্রপাতি সব ঠিক করে রেখে অশোক তার বসবার খোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এবার শুধু সীটের ধারটুকু ধরে বাইরে ঝুলে পড়ল, তার ইঙ্গিতে আমিও তখন তাই করছি। তারপর একটি দুটি তিনটি সেকেণ্ড। তার ইসারায় এবার হাত ছেড়ে দিয়ে শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। প্যারাসুটের বোতাম টেপবার আগেই শুনতে পেলাম, ওপরে ভয়ঙ্কর সঙ্ঘর্ষের আওয়াজ। আমাদের এরোপ্লেন প্রচণ্ড বেগে গিয়ে জানোয়ারটিকে আঘাত করেছে।

আমাদের প্যারাসুট খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একরকম গায়ের পাশ দিয়েই সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীটির মৃতদেহ সশব্দে মাটিতে গিয়ে পড়ল, আমাদের এরোপ্লেনটি মাতালের মত তখনও পড়তে পড়তে পাক খাচ্ছে।

নাগরাকোটা থেকে ট্রেণে কলকাতায় পৌঁছাবার আগেই আমাদের খবর কি রকমভাবে সেখানে পৌঁছে গেছল। এই আশ্চর্য্য জানোয়ারের মৃত্যুর খবরে সেখানে কিরকম চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল ; আই, এন, এ থেকে আমাদের বিশেষতঃ অশোককে কি রকম সম্মান করা হয়েছিল সে সব খবর অনেকেরই জানা।

এখানে শুধু আমাদের এই অভিযানের অদ্ভুত পরিণতির কথা বলব।

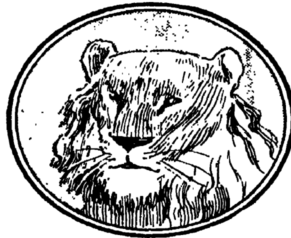
সে পরিণতি সার চিরঞ্জীবের মুক্তি। শুধু মুক্তি নয় বৈজ্ঞানিক হিসাবে এই ব্যাপারে তাঁহার খ্যাতির পুনরুদ্ধারও হয়ে গেল। প্রাচীন যুগের সরীসৃপ বংশ যে লোপ পায়নি তার চাক্ষুষ প্রমাণ আমরাই পেয়েছি।

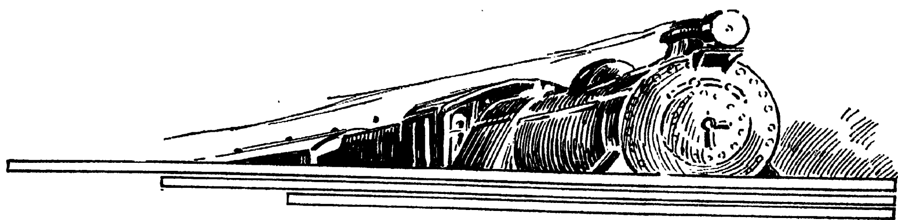
যে ভয়ঙ্কর প্রাণীদুটিকে আমরা মেরেছিলাম সার চিরঞ্জীব নিউগিনী অভিযান থেকে তাদের ডিম এনে কৃত্রিম উপায়ে অদ্ভুত কৌশলে তাঁর পরীক্ষাগারে ফুটিয়ে তাদের ছানাগুলিকে পালন করছিলেন, একদিন বৈজ্ঞানিক জগৎকে দেখিয়ে

স্তম্ভিত করে দেবেন বলে। সেগুলি নাকি প্রাচীনযুগের 'টেরোড্যাক্টিলের'ই সুদূর বংশধর—আরো হিংস্র, আরো বিশালকায়। কিন্তু জানোয়ারগুলি আশাতিরিক্ত ভাবে বেড়ে উঠে একদিন হঠাৎ তাঁর চাকরের অসাবধানতায় তাদের খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়ে বলেই বিপদ হয়। চাকরটিকে অমন নৃশংস ভাবে তারাই হত্যা করেছিল।

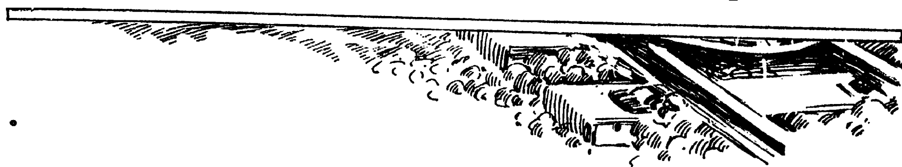
তারা ছাড়া পেয়ে কি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ করতে পারে তা বুঝেই সার চিরঞ্জীব বন্দুক নিয়ে এরোপ্লেনে তাদের মারবার জন্য বেরুচ্ছিলেন। পুলিশ তাঁকে সেই অবস্থায় বাধা দেওয়ায় অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে তিনি একেবারে মৌন হয়ে যান।

খবরের কাগজে যে সংবাদ একদম চাপা পড়ে গিয়েছিল অশোক সার চিরঞ্জীবের সেই খুনের রহস্যের সঙ্গে এই বিমান-ডাকের রহস্যের যোগসূত্র হঠাৎ একদিন আশ্চর্য্যভাবে আবিষ্কার না করলে অবশ্য সব দিক দিয়েই সর্ব্বনাশ হয়ে যেত। আর মফঃস্বল সংবাদে বুড়ির বাছুর চুরির যে খবর গাঁজাখুরী বলে' আমি পরিহাস করেছিলাম, তাই থেকেই কিন্তু জানোয়ার দুটিকে কোথায় সন্ধান করতে হবে, অশোক তার আভাষ পায়। নইলে নাগরাকোটার নামও সে জানত না দুদিন আগে।





মামলা



শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু

রামলালের মামলা ?···কেন সে করেছে কি ? খুন-জখম ?···চুরি-ডাকাতি ? ?···দাঙ্গা-হাঙ্গামা ? ? ?···জাল-জুয়াচুরি ? ? ? ?···

—না, কিছুই সে করে নি !

—তবে, কোন্ অপরাধে সে আবার মাম্‌লার ফ্যাসাদে পড়ে গেল ? নিরীহ, গোবেচারা, শাদাসিধে, ভালোমানুষ রামলাল,—সে আবার কিসের দায়ে ধরা পড়ল ?···

—রামলাল রেলগাড়ীতে ধরা পড়েছে,—

—ওঃ, কি অন্যায়,—নিশ্চয় সে বিনা টিকিটে যাচ্ছিল।

—উঁহু,—সে দস্তুরমত সেকেণ্ড্ ক্লাশের টিকিট কিনে গাড়ীতে চড়েছিল।

—তবে ?···

—শোনো সেই কথাই বল্‌ছি,—

রামলাল চলেছিল তার ব্যবসাসংক্রান্ত কোনো কাজে পাট্‌না।

রামলালের মাম্‌লা

শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু

তার শালা লম্বোদরকে তো চেন—? সেই লম্বোদরও ছিল মধুপুর পর্য্যন্ত রামলালের সঙ্গী।

দুইজন প্রায় একই বয়সী।

গাড়ী একদম খালি,—শালা আর ভগ্নীপতি দু'জনে দু'টো বেঞ্চে সটান্ টান্ হয়ে শুয়ে পড়ল।

রামলাল বল্লে, "ওহে লম্বোদর, লম্বা হয়ে শুয়ে তো পড়লে—গাড়ী কিন্তু মধুপুর পৌঁছায় শেষ রাত্রে,—দেখো আবার 'ওভার ক্যারেড্' হয়ে যেও না।"

লম্বোদর মুচ্‌কি হেসে উত্তর দিল—"না হে, কোনো ভয় নাই, তোমার মত কুম্ভকর্ণের ঘুম আমার নয়,—ট্রেণে আমার ভালো ঘুম হয় না। বরং তুমি দেখো আবার পাট্‌না ছাড়িয়ে মোগলসরাই চলে যেও না,—তোমার ঘুম ভাঙ্‌তে তো বেলা দশটা।"

রামলালের ততক্ষণ ঘুম এসে গেছে। ধরা গলায় বল্লে—"মধুপুর গাড়ী পৌঁছুলে—যদি দ্যাখো আমি ঘুমিয়ে আছি,—আমাকে আর জাগিও না,—চুপ্‌চাপ্ নেবে যেও।—ফিরবার পথে আমি মধুপুর হয়ে, তোমার সঙ্গে দেখা করে' বাড়ী ফিরব।"

গভীর গর্জ্জনে রামলাল নাক ডাকাতে সুরু করল।

কার্ত্তিক মাসের শেষ, একটু একটু শীত পড়তে আরম্ভ করেছে।

রামলাল আর লম্বোদর দু'জনে দু'টো কম্বল জড়িয়ে শুয়েছে।

ট্রেণ যত জোরে ছুট্‌ছে রামলালের ঘুমও যেন ততই জাঁকিয়ে আস্‌ছে।

কম্বলের ভিতর থেকে লম্বোদর গুণ গুণ করে' গান ধরল —

"শীতের হাওয়ায় লাগ্‌ল কাঁপন"—

লম্বোদরের হাড়ে হাড়ে"—

রামলালের মাম্‌লা

শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু

শেষ রাত্রে রামলালের ঘুম ভাঙ্‌লো। ঘড়িতে দেখ্‌ল রাত প্রায় তিনটা। ট্রেণটা একটা ব্রিজের উপর দিয়ে ঝুশ্‌-ঝুশ্‌ করে' ছুটে চলেছে,—বাইরে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার।

কামরার মধ্যে মিট্‌মিটে আলো জ্বল্‌ছে।

রামলাল উঠে বস্‌ল,—একবার আড়মোড়া ভেঙ্গে হাই তুল্ল। ছারপোকার কামড়ে ভালো ঘুম হয় নাই।

লম্বোদরটা ওধারের বেঞ্চে পড়ে' খুব ঘুম দিচ্ছে। তাদের কামরায় অন্য কোন লোক ওঠে নাই।

মধুপুরের বোধহয় বেশী দেরী নাই,—লম্বোদরকে এখন জাগাতে হয়।



"হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো—"

রামলালের মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি জেগে উঠ্‌ল।—রামলালের কড়া

মাদ্রাজী নস্য নেবার অভ্যাস আছে,—লম্বোদর আবার নস্যটা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারত না।

রামলাল মনে মনে ভাব্‌লে—দাঁড়াও বাছাধন, তোমার সাধের ঘুমের দফা আমি রফা করছি।

পা টিপে টিপে সে লম্বোদরের দিকে এগিয়ে গেল।

মাথার কম্বলটা সরিয়ে—তার নাকের ফুটো হাতড়ে দিল খানিকটা কড়া নস্য গুঁজে।

হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো—

লম্বোদর তড়াক্ করে' লাফিয়ে উঠে বস্‌ল।

একি!—লম্বোদরের তো এ রকম আব্‌লুশের মত কালো রং নয়!!—আর সে এত মোটাই বা হোলো কি করে!! নাকের নীচে উঃ, কী প্রকাণ্ড জাদ্‌রেল গোঁফের জঙ্গল—লম্বোদর তো মাকুন্দা, সারা মুখে গোঁফ দাড়ির রেখা নাই। আরে, এ আবার কে? লম্বোদর গেল কোথায়!!

একি ভেল্‌কী নাকি!!!···তবে কি গাড়ী মধুপুর ছাড়িয়ে এসেছে? মধুপুরে লম্বোদর নেবে গেছে আর তার জায়গা নিশ্চয়ই এসে দখল্ করেছে এই লোকটা। ওহো বড্ড ভুল হয়ে গেছে।···

রামলালের মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে' উঠ্‌ল।

হাঁচির ভাবটা ততক্ষণ অনেকটা কমে এসেছে,—সেই মোটা লোকটা গর্জ্জন করে' রামলালের দিকে তেড়ে এলো—

"চালাকি পেয়েছ—লোক চেন না? দারোগা পঞ্চাননের সঙ্গে প্রবঞ্চনা, কেউটের গর্ত্তে হাত?"

নেহাৎ অপ্রস্তুত হয়ে রামলাল বল্লে—"আজ্ঞে মাপ্ করবেন,—আমি ভেবেছিলাম আমার শালা লম্বোদর"—

রামলালের মাম্‌লা

শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু

লোকটি আরো খাপ্পা হয়ে বল্লে—"হুঁ, আর শালা লম্বোদর হয়ে গেল দারোগা পঞ্চানন, ছিল পাঁতি হাঁসের ডিম—বেরুলো গোখ্‌রো সাপের বাচ্ছা, ইয়ার্কির আর জায়গা পাও নাই, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি ?"

রামলাল বল্লে "আমার কোনো বদ্‌ মত্‌লব ছিল না।"

লোকটি হুঙ্কার করে' উঠ্‌ল—"না, মত্‌লব আর বদ্‌ থাক্‌বে কেন, গভীর রাত্রে ঘুমন্ত যাত্রীর নাকে বিষের গুঁড়ো দিয়ে অজ্ঞান করবার ফন্দি—মত্‌লবটা খুবই ভালো।—এসব বুঝ্‌তে পঞ্চাননের দেরী হয় না। পঞ্চানন ঘাস খেয়ে দারোগাগিরি করে না। পকেটে হাজার টাকার নোট, হুম্‌ বাবা, গ্যাঁড়া দিয়েছিল আর কি !"

রামলাল আম্‌তা আম্‌তা করে' বল্লে—"দেখছেন তো আমি ভদ্রলোক—মিছে অন্যায় সন্দেহ করছেন—"

লোকটি ঠোঁট্‌ উল্টে বি‌শেষ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিল—"ও রকম ঢের ঢের ভদ্রবেশী গুণ্ডা, ছদ্মবেশী ডাকাতকে দারোগা পঞ্চানন গুলে খেয়েছে।—ও সব ধাপ্পাবাজিতে লম্বোদর ভোলে—পঞ্চানন ভোলে না।"

ট্রেণ একটা ষ্টেশনে এসে থামতেই দারোগা পঞ্চানন জানালার ধারে এসে ডাক্‌ল—"পুলিশ, পুলিশ ! !"

জশিদি ষ্টেশনে রামলালকে গ্রেপ্তার করা হোলো। তার কোনো কৈফিয়ৎই পুলিশ মান্‌তে চাইল না।

গাড়ী শুদ্ধ লোক নেমে এলো এই ভদ্রবেশী ডাকাতকে দেখ্‌তে।—তাদের টিকা টিপ্পনিতে রামলালের যে কি অবস্থা—তা আর ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ওঃ, মধুপুরে নাব্‌বার সময় যদি হতভাগা লম্বোদরটা তাকে একবার জানিয়ে যেত !!···

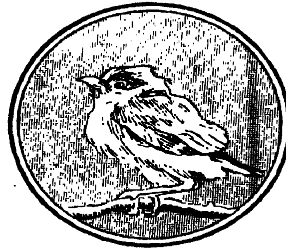
রামলালের মাম্‌লা

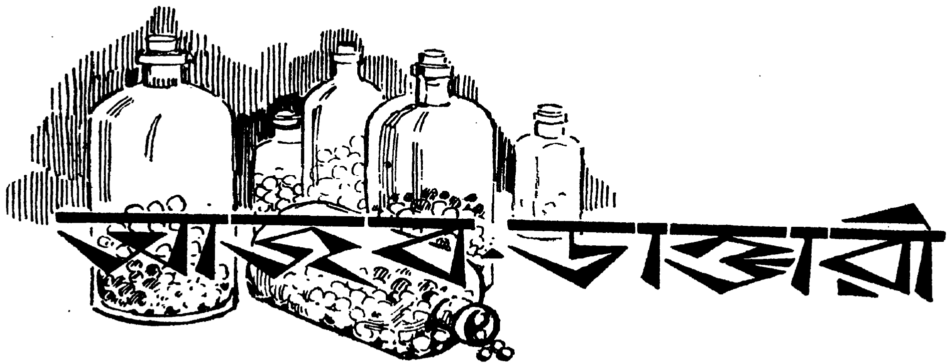
শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু

কাল রামলালের মাম্‌লা। কল্‌কাতা থেকে অনেক উকীল, ব্যারিষ্টার যাচ্ছে রামলালের পক্ষ সমর্থন করতে।

সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী—কি যেন তা'র নাম! আসামী পক্ষের সাক্ষী লম্বোদর।

ছাখা যাক্—কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়!





শ্রীযুক্ত শৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, বি, এস-সি

কাগজেতে প্যাঙ্গারাম প'ড়ে দেখে ফর্দ্দ,
তিন শত পিলে রোগী, ছোট আর মর্দ্দ ;
সাত শত হাঁপানিতে, পাঁচ শত যক্ষ্মা,
ছ' হাজার কালাজ্বরে পেয়ে গেছে অক্কা।
শত শত কুপোকাৎ, ভুগে ভুগে হদ্দ,
যমের দুয়ার থেকে ফিরে এসে সদ্য।
"বাংলায় রোগী মরে, হয় না যে সহ্য,
ডাকে না কো প্যাঙ্গারামে, বড় আশ্চর্য্য!
ডাক্তারে বলে, 'এতে নাই কোন সন্দ,
চেঞ্জেতে গেলে পরে জ্বর হবে বন্ধ।'
চেঞ্জের জলহাওয়া এনে দেয় স্বাস্থ্য,
নইলে কি পশ্চিমে এত লোক আস্‌ত?
কিন্তু যে রেলট্রেন বড় দামী পথ্য,
বুঝিয়ে কি দিতে হবে এই সোজা সত্য?
রেলে কম হাঙ্গাম, জানে সবে পষ্ট,
বোঁচ্‌কা ও পুঁটুলির বাঁধাবাঁধি কষ্ট।

আজব-ডাক্তারী

শ্রীযুক্ত শৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, বি, এস্-সি

ঝঞ্ঝাট কত শত, ঠেলাঠেলি দ্বন্দ্ব,
গুম্‌সুনি গরমেতে, দম হয় বন্ধ।
পশ্চিমা পেশোয়ারী, টিকি আর দাড়ীতে,
কেন বাবা মারা যাবে, জান্‌বে না বাড়ীতে ?
তার চেয়ে এস হেথা দেখে যাও চক্ষে,
হাতে হাতে ফল পাবে, রোগী পাবে রক্ষে।
আলমারী ঠাসা ঐ শিশি ভরা সাজানো,
কত বায়ু, জল, মাটি, যত কিছু না জানো।
কেউ পুরী, কেউ রাঁচি, দেওঘর কেউ বা,
চেঞ্জের জল, হাওয়া, সাগরের ঢেউ বা।
অম্বুলে রোগী তুমি, ভুট্‌ভাট পেটে,
'মধুপুর' তিন ফোঁটা খাও দেখি চেটে !
ভুগে ভুগে ক্ষয়কাশে গেলে বুঝি ম'রে ?
নাকে ধ'রে 'পুরী' শিশি টান দেখি জোরে !
ও কে এলে কালাজ্বর, পেটজোড়া পিলে,
দার্জ্জিলিং ফোঁটা দুই খাও দেখি গিলে।
কা'রও যদি গেঁটে বাতে চোঁয়া-ঢেক থাক্‌তো,
'চুনারের' জল দিয়ে 'মুঙ্গের' চাখ্‌তো।

হাত গেছে ভেঙ্গে কার ঠ্যাং গেছে ছিট্‌কে,
'কাটোয়ার' জল খেয়ে থাকো দেখি সিঁট্‌কে !
যত সব হাঁদা যায় পশ্চিমে বেড়াতে,
মোর ফন্দিতে পারে সে খরচ এড়াতে।

আজব-ডাক্তারী

শ্রীযুক্ত শৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, বি, এস-সি



ধড়ে যদি মুড়ো থাকে, আর থাকে প্রাণটা,
বাঁচ্‌বেই দুই ডোজে,—হোক্ নাড়ী ঠাণ্ডা।
এসে চেখে দেখে যাও, হয় যদি সন্দ',
ঘুচে যাক্ চক্ষু ও কর্ণের দ্বন্দ্ব।"



শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী

খোকা। ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনেছি—ফুল-পরীরা রোজ রাত্তিরে এই ফুল-বাগানে বেড়াতে আসে! চুপ্‌টি করে লুকিয়ে থাকি—

[পাখীরা শীষ দিয়া গান গাহিতে লাগিল।—দূর হইতে ফুলপরীদের গান ভাসিয়া আসিতে লাগিল]

খোকা। ঐ ওরা আস্‌ছে না?

[পরীদের গান]

ফুল—ফুল—ফুল!
ফুল-দলে দুলি মোরা দুল্—দুল্—দুল্!
ফুল-মধু করি পান
ফুরফুরে গাই গান
শিশিরেতে দুল্ দোলে—টুল্—টুল্—টুল্!

ফুল-পরী

শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী

খোকা। দাঁড়াও একটি পরীকে আমি ধরবো—

[আস্তে আস্তে অগ্রসর হওয়ার শব্দ] এই যে আমি ধরে ফেলেছি·



মানুষের সাড়া পাইয়া সব পরীর দল রুণু ঝুণু শব্দ করিয়া পাখায় ভর দিয়া উড়িয়া পালাইল]

ফুলপরী ছাড়—ছাড়—আমায় ছেড়ে দাও—

[পরীর গান]

আমি উড়ে যাব পরীর দেশে—
ঊষার লালিমা যেথায় সাঁঝের তারায় মেশে !
বিছানা বিছায় চাঁদের জ্যোছনা—
ঘুমায় পরীরা—হরিণ লোচনা
সাথী-হারা হয়ে কোন কূলে একা চলিব ভেসে ?

ফুল-পরী

শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী

[খোকার গান]

ফুল-পরী গো, করবো তোমায় খেলার সাথী—
নীল গগনে পাখ্‌না মেলে চল্‌বে খেলা দিবস রাতি!
ছুট্‌বো দুজন ফুল-বাগানে—
গাইবো যে গান প্রাণ-জাগানে—
দোয়েল-শ্যামা শীষ দেবে গো,—সন্ধ্যাতারা থাক্‌বে সাথী।

পরী। কিন্তু ভাই—তিনটি বোন যে আমার পথ চেয়ে বসে থাক্‌বে!

খোকা। আচ্ছা, তোমায় আমি ছেড়ে দিতে পারি—কিন্তু—

পরী। কিন্তু—?

খোকা। এক সর্ত্তে—

পরী। বল—

খোকা। এক দিনের জন্যে তোমার পাখা দুটো আমায় দিতে হবে।

পরী। বেশ! একদিন আমি এই ফুলবনে লুকিয়ে থাক্‌বো। নাও পাখা—এই পাখা পরলে কেউ আর তোমায় দেখ্‌তে পাবে না—

খোকা। বটে! কি মজা! কি মজা! তুমি বোন ফুলের পাপ্‌ড়ির ভেতর লুকিয়ে থাকো। ক্ষিধে পেলে—মধু খেয়ো। আমি কাল সন্ধ্যে বেলা পাখা দুটো তোমায় ফিরিয়ে দেবো।

দ্বিতীয় খণ্ড

খোকা। পরী বলেছে—পাখা লাগালে কেউ আমায় দেখ্‌তে পাবে না!—কি মজা!

সন্দেশ-ওয়ালা। চাই সন্দেশ—ভালো টাট্‌কা সন্দেশ—

খোকা। তাইত! সন্দেশ নিয়ে ফিরিওয়ালা এই দিকেই আস্‌ছে।—লুকিয়ে খেতে হ'বে—

[পাখার শব্দ হইতে লাগিল]

সন্দেশ-ওয়ালা। আরে—আরে—আরে—একি! ওগো—কে কোথায় আছ—শীগ্‌গীর এসো—

১ম পথিক। কি হ'ল—কি হ'ল?

২য় পথিক। এমন ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাচ্ছ কেন?

সন্দেশ-ওয়ালা। আমার হাঁড়ি থেকে সন্দেশ উড়ে যাচ্ছে যে—

১ম পথিক। সন্দেশ উড়ছে?

২য় পথিক। আরে হ্যাঁ—তাইত—তাইত! সন্দেশ উড়ছে—

সকলে। পালালো—ধর—ধর—

[কোলাহল]

খোকা। যাক্‌। অনেকগুলি সন্দেশ খেয়ে নিয়েছি।······ত্যাঁ! ঐ যে কিপ্টে দামোদর বৈরাগী আস্‌ছে না? লোকের কাছ থেকে সুদ আদায় করে ফিরছে। সঙ্গে—এক থলে টাকা! দাঁড়াও মজা করতে হ'বে!

বৈরাগী। রাধাকৃষ্ণ বল মন! আজ্‌কে আদায়টা ভালোই হ'য়েছে। সব সিন্দুকে পুরে তবে নিশ্চিন্দি! যে চোর ডাকাতের ভয়!

[খোকার হাসি শোনা গেল]

ফুল-পরী

শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী

বৈরাগী। কি সর্ব্বনাশ !···টাকার থলিটা হাত থেকে উড়ে যাচ্ছে যে—! ওরে কে কোথায় আছিস্ আমার সর্ব্বস্ব গেল—সর্ব্বস্ব গেল !

ছেলের দল। কি বৈরাগী ঠাকুর এত চ্যাচাচ্ছ কেন ? একটু রাধাকৃষ্ণের নাম কর না—

বৈরাগী। ধুত্তোর—তোর রাধা-কৃষ্ণের নিকুচি করেছে ! আমার টাকার থলি যে উড়ল !

ছেলের দল। ওরে তাঁইত রে ! থলি উড়ছে·····ছোট্—ছোট্—

[রাস্তায় টাকা পড়ার শব্দ ও খোকার হাসি]



বৈরাগী। হায় হায় আমার সব গেলরে সব গেল—

ছেলের দল। ওরে টাকার হরির লুট হচ্ছে—কুড়িয়ে নে—কুড়িয়ে নে—

[টাকার শব্দ ও ছেলেদের কোলাহল]

বৈরাগী। আমি ধনে-প্রাণে মারা গেলুম রে—-ধনে-প্রাণে মারা গেলুম—

[কপাল চাপ্ড়ানোর শব্দ]

খোকা। কিপ্‌টে বৈরাগীটা খুব জব্দ হ'য়েছে। আরে ! পণ্ডিত মশাই আস্‌ছেন যে ! সর্ব্বনাশ ! কাল যে আমাদের পরীক্ষা ! ভুলেই গিয়েছিলাম।

রোসো —পণ্ডিত মশায়ের পকেটে পরীক্ষার প্রশ্ন আছে—ওটা তুলে নিয়ে লুকা'তে হ'বে।

পণ্ডিত। কে—রে—কে—রে—আমার পকেট থেকে কাগজ তুলে নিলে? ভূতোটা বোধ হয়?



নাঃ—কেউ নেই ত!...

[খোকার হাসি]

ওরে বাবারে—ভূত—ভূত—ভূত!—ঘাড় মট্‌কালে রে—! রাম! রাম! রাম! রাম!

[ছুটিয়া প্রস্থান]

খোকা। এইবার ফুল বাগানে বসে একটু জিরোনো যাক্—

পরী। ভাই খোকা—

ফুল-পরী

শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী

খোকা। আরে ফুল-পরী তুমি !

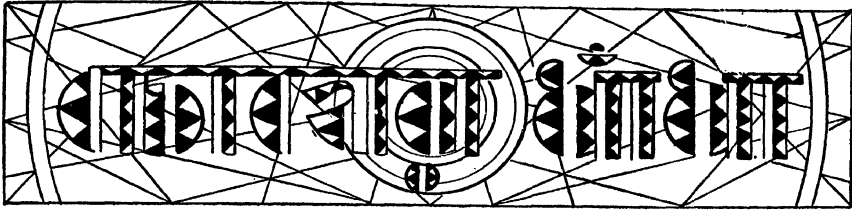
পরী। হ্যাঁ। ভাই আমি। এইবার ত' সন্ধ্যে হ'ল—আমায় পরীদের দেশে ফিরে যেতে হ'বে—বোনেরা সব আমার জন্যে কাঁদছে—

খোকা। আচ্ছা, তা হ'লে আর তোমায় ধরে রাখ্‌বো না—এই নাও তোমার পাখা—

[পরীর গান]

ফুলপরী ঘুরি মোরা ফুর্‌ ফুর্‌ ফুর্‌—
নেচে চলি ফুলবাসে ভুর্‌—ভুর্‌—ভুর্‌ !
পরি কপালেতে টীপ্‌—
তারা দল ধরে দীপ্‌—
পরীদের দেশে চলি দূর—দূর—দূর—





শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

আমরা চোখের ধাঁধার জগতে বাস করছি। প্রতিদিন আমাদের চোখ ভুলাবার জন্য চারিদিকে কত আয়োজন চ'লেছে। শুধু মানুষের চেষ্টা নয়, প্রকৃতির খেলাও আমাদের চোখকে পদে পদে ভুলিয়ে দিচ্ছে। মরুভূমির মরীচিকা, আকাশে ছায়া, দূরের পাহাড়কে পরিষ্কার দিনে অতি নিকট মনে হওয়া, চাঁদ প্রথম উঠার সময় বড় দেখান, তা'র পর ক্রমশঃ ছোট হ'য়ে যাওয়া —এই রকম ধাঁধা প্রতিদিন আমাদের চোখ ভুলায়।

চোখের ধাঁধাকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে ;— (১) যা' সত্যি ক'রে চোখের সাম্নে উপস্থিত নাই সেই জিনিষটি দেখ্ছি ব'লে ধারণা হওয়া ; (২) জিনিষের প্রকৃত আকার সম্বন্ধে চোখের ভুল ধারণা হওয়া।

প্রথম শ্রেণীর ধাঁধা আমরা অনেক সময়েই দেখে থাকি। উজ্জ্বল আলোর দিকে একটুখানি তাকিয়ে অন্য যে দিকেই তাকাও, সেই আলোর আকারটি যেন চোখের সাম্নে ভাস্তে থাকে। টকটকে লাল কোনও জিনিষের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে, চট্ ক'রে চোখ ফিরিয়ে সাদা দেয়ালের দিকে চাইলে চোখের সাম্নে লাল জিনিষটির আকার ভাস্ছে দেখ্বে—কিন্তু তা'র রংটি সবুজ। যে-কোন কুচ্কুচে কালো জিনিষের দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে তাকিয়ে হঠাৎ সাদা দেয়ালের দিকে চোখ ফিরা'লে সেই জিনিষটির আকার চোখের সাম্নে ভাস্তে দেখ্বে। মজা এই যে, দেয়াল যত দূরে থাক্বে—অর্থাৎ যতদূরে দৃষ্টি ফেল্বে জিনিষের

আকার (ছায়ার মত) ততই বড় দেখ্‌বে। এইভাবেই 'ভূত' দেখার সৃষ্টি হয়। তবু লোকে বল্‌বে—"আলবাৎ ভূত দেখেছি!"

দ্বিতীয় শ্রেণীর ধাঁধা তো দিনরাতই চোখের সাম্নে দেখতে পাচ্ছি। লম্বা গাছ খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে যত লম্বা দেখায়, কেটে ফেলে দিলে তার চেয়ে কম লম্বা মনে হয়; বাড়ীর ভিত্তি গাঁথা হবার সময় ঘরগুলি যত ছোট দেখায়, ঘর তৈয়ারী হ'য়ে গেলে তত ছোট দেখায় না; বেঁটে মানুষ যদি খাড়া ডোরাদার কোট-প্যাণ্ট পরে, তা'কে একটু লম্বা দেখায়; আবার যদি শোয়ানো-ভাবের (=) ডোরাওয়ালা কোট-প্যাণ্ট পরে, তা'কে যেন আরো বেঁটে দেখায়। একটি উজ্জ্বল জিনিষ, ঠিক সেই মাপেরই একটি অনুজ্জ্বল জিনিষের চেয়ে বড় দেখায়; একটি লাল জিনিষ ঠিক সেই মাপেরই একটি অন্য রঙের জিনিষের চেয়ে বড় দেখায়। বড় থামের মাথায় সোজা খিলান দেখ্‌লে অনেক সময় ধারণা হয় যে খিলানের মাঝখানটা একটু ঝুলে পড়েছে; সে জন্য, আগেকার দিনের অনেক বড় দালানের খিলানের



সাম্নের লোকটি কত লম্বা দেখ! মাঝের লোকটিও খুব লম্বা—তবে, সাম্নের লোকটির মত নয়। কাছের লোকটি সব চেয়ে কম লম্বা ব'লে মনে হচ্ছে। একবার মেপে দেখতো! দেখ্‌বে তিন জনেই সমান লম্বা।

চোখের ধাঁধা

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

মাঝখানটা উপরের দিকে একটু উঁচু ক'রে তৈরী করা হ'তো (অর্থাৎ, মাঝখানটা ধনুকের মত একটু উপরের দিকে বাঁকা)।

যাদুকরের "ম্যাজিক" চোখের ধাঁধা বৈ আর কিছুই নয়। চোখকে ভুলাতে না পার্‌লে তো ম্যাজিকই মাটি। কাটামুণ্ডুর সঙ্গে কথা বলা, মানুষকে কেটে ফেলে আবার জোড়া লাগান, শূন্যে মানুষ ভাসান—এ সবই নিছক চোখের ধাঁধা। যন্ত্রপাতি, হাত-সাফাই, আলো, ছায়া, আয়না এই সবের সাহায্যে চোখকে ভুলিয়ে আশ্চর্য্য এবং অসম্ভব জিনিষ দেখানই যাদুকরের ম্যাজিক।

চোখের ভুল-দেখাকে অনেক সময় কাজেও লাগান হয়ে থাকে। বায়োস্কোপের ছবিই তা'র একটি দৃস্টান্ত। চলন্ত জিনিষের আল্‌গা আল্‌গা অনেকগুলি ফটো পর-পর দেখিয়ে চোখের ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া হয় যে চলন্ত ছবি দেখান হচ্ছে। দেখাবার যন্ত্রপাতির ফলে চোখের ভুলটাও আমরা বুঝতে পারি না;—দেখাবার সময় একেবারে ভুলে যাই যে আল্‌গা ছবির সমষ্টিতে চোখের উপর চলন্ত ছবির এমন সুন্দর ধাঁধার সৃষ্টি হচ্ছে।

গত মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধজাহাজের গায়ে চিত্র-বিচিত্র রং লাগিয়ে দেওয়া হ'তো সেই রংএর দরুণ জাহাজ চল্‌বার সময় চোখে ধাঁধা লেগে যেত। চলন্ত জাহাজটি ঝাপসা দেখা যেত; কাজেই তা'কে টর্পেডো বা গুলি মেরে কাবু করা কঠিন হ'তো।

ব্যবসাদারেরা চোখকে ভুলাবার জন্য রাতদিনই মাথা ঘামান্। ফটোগ্রাফার পিছনের 'ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড' একটু ছোট ক'রে আঁকিয়ে তা'র সাম্নে লোক বসিয়ে ছবি তুলে বেঁটে লোককে লম্বা দেখান্, দোকানের পিছন দিকে আয়না লাগিয়ে ছোট দোকানকে প্রকাণ্ড দেখান্, মোটরগাড়ীর গড়ন এমন ভাবে করেন যে গাড়ীটি আসলে যত বড় দেখতে তা'র চেয়ে বড় ব'লে মনে হয়;—এ রকমের আরো কতজনে কত রকমে চোখের ধাঁধা লাগাবার চেষ্টা করছেন। তা' ছাড়া,

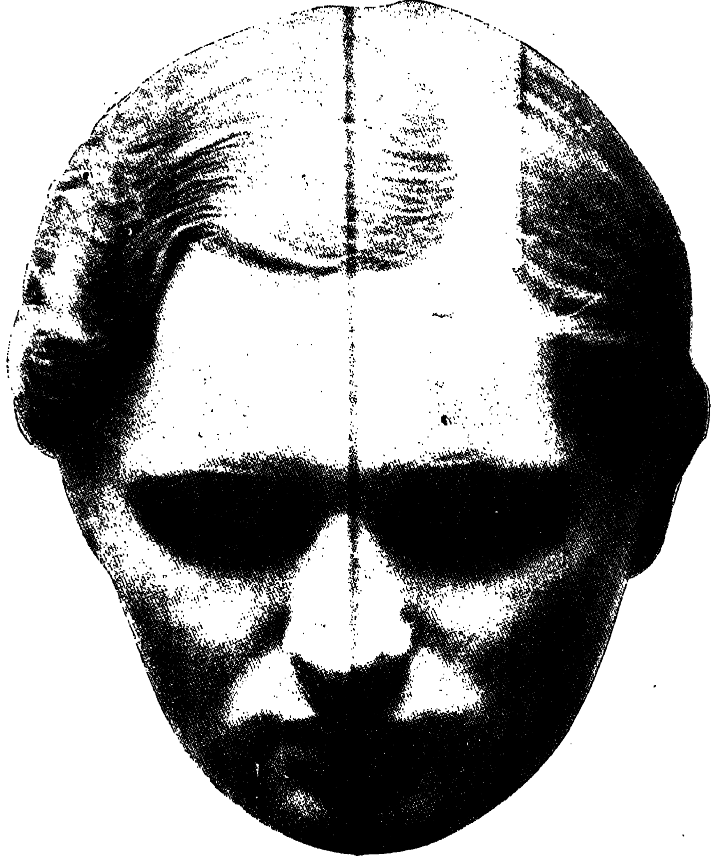
চোখের ধাঁধা

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

নূতন ধরণের কত চোখের ধাঁধা তৈরী ক'রে পত্রিকায় ছাপান হচ্ছে, কত ধাঁধার খেলানা বিক্রী হচ্ছে।

এই সঙ্গে নানা ধরণের চোখের ধাঁধা কয়েকটি দিলাম। এই সব দেখে তোমরাও ধাঁধা বানাতে পার্বে ব'লে আশা করি।

চোখের ধাঁধা

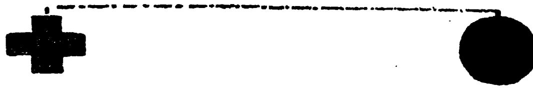


ইনি চোখ বুজে রয়েছেন কেন? —ভাল ক'রে চেয়ে দেখ তো; সত্যিই কি চোখ বুজে আছেন?

চোখের ধাঁধা

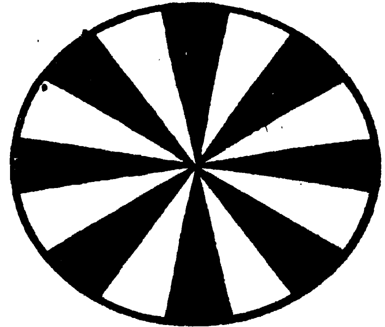
শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

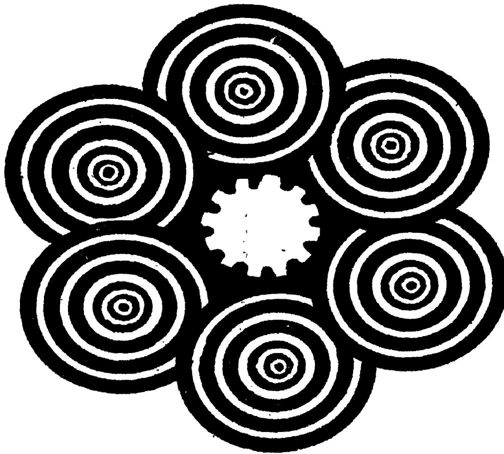
বাঁ দিকের + চিহ্নটির দিকে ডান চোখ রাখ। কাগজটিকে চোখ থেকে একটু দূরে রেখে (হাত দেড়েক) আস্তে আস্তে কাছে আন্‌তে থাক।



প্রথমে ডানদিকের গোল জিনিষটি দেখ্‌তে পাবে। এক জায়গায় এসে সেটা আর দেখ্‌বে না। আবার আরো কাছে আন্‌লে দেখতে পাবে। চোখের একটি 'অন্ধ' জায়গা আছে।

এই চাকার মত জিনিষটিকে দেখ। কাগজটিকে যদি ঘোরাবার মতন ক'রে নাড়াও তা' হ'লে দেখ্‌বে এই চাকাটির মাঝখানে যেন একটি আধুলির মতন জিনিষ দেখা যাবে।





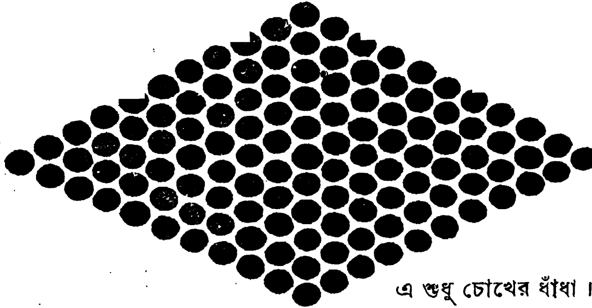
এই যে ছয়টি গোল গোল চক্কর আছে, কাগজটি ঘোরা'লে এগুলি কেমন বন্ বন্ ক'রে ঘোরে একবার দেখ।

চোখের ধাঁধা

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

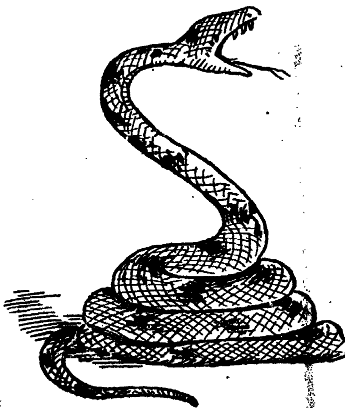


এই কালো কঙ্কাল-মুণ্ডটির দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে সাদা দেয়ালের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ ;—দেখ্‌বে, এই জিনিষটি চোখের সাম্নে ভাস্‌ছে।



এই যে মৌচাকের মতন গোল ফুকৃটিওয়ালা জিনিষটি দেখ্‌ছ, এর ফুট্‌কির মাঝে মাঝে যেন কালো কিসের দাগ দেখা যাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখ, এ শুধু চোখের ধাঁধা।

সাপ আর পাখীর মাঝখানে যে লাইন রয়েছে, তা'র উপর খাড়াভাবে একটি কার্ড রাখ। তারপর, বাঁ চোখ সাপের উপর আর ডান চোখ পাখীর উপর রেখে মাথাটা কাগজের দিকে এগিয়ে আন। দেখ্‌বে, সাপটার মুখের দিকে পাখী যেন এগিয়ে যাচ্ছে।

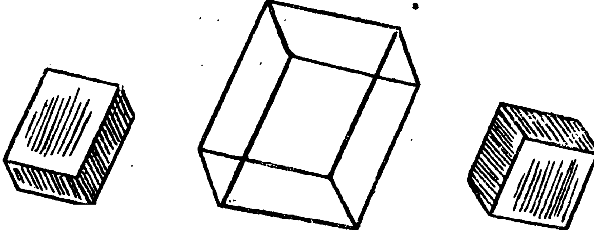


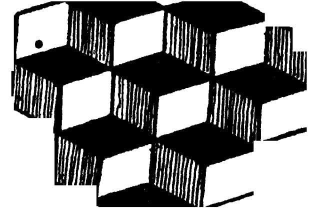


চোখের ধাঁধা

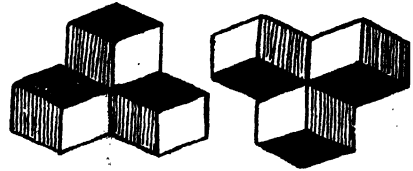
শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

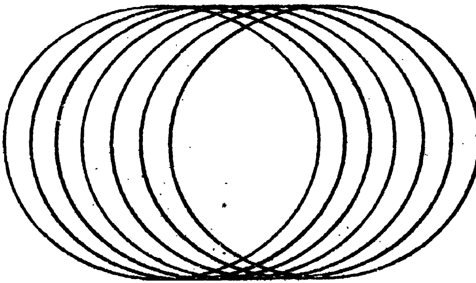
দুটি ইঁটের মাঝখানে একটি স্বচ্ছ ইঁট যেন আঁকা হয়েছে। বাঁদিকের ইঁটের দিকে চেয়ে মাঝের ইঁটটি দেখ—দেখ্‌বে, যেন ইঁটের উপরটা দেখা যাচ্ছে। আবার ডানদিকের ইঁটের দিকে চেয়ে মাঝের ইঁটটি দেখ—এবার তলাটা যেন দেখা যাচ্ছে।





এই ছবিটিতেও আগের ছবির মতন চোখের ভুল হয়। নীচের বাঁ-দিকের ছবিটি দেখে উপরের ছবিটি দেখ—যেন কয়টি চৌখোপীর উপরের দিকটা দেখ্‌ছ মনে হবে। আবার ডানদিকের ছবিটি দেখে উপরের ছবিটি দেখ ;—মনে হবে, উপরের চৌখোপীগুলির তলার দিকটা দেখা যাচ্ছে।

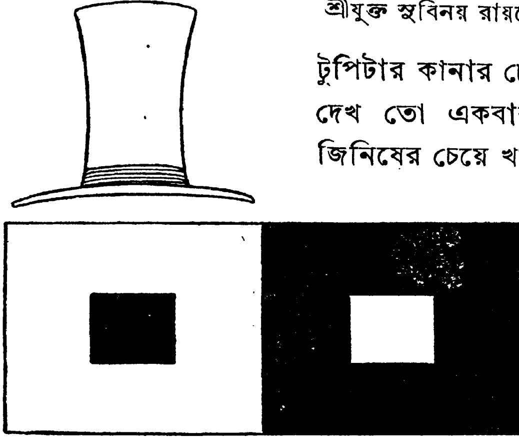




এই ছবিটির দিকে একবার দেখ। একটা চোঙার মতন জিনিষ, তা'র দুটি মুখ খোলা। একবার মনে হবে এটির মুখ ডানদিকে ; আবার খানিক পরে মনে হবে মুখটা যেন বাঁ-দিকে।

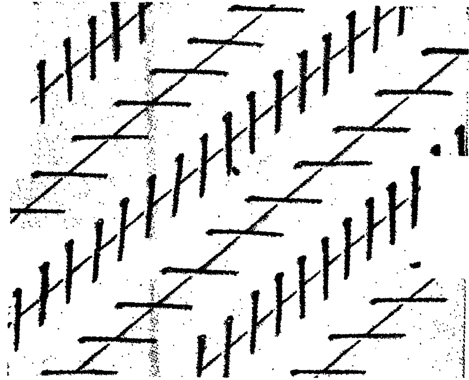
চোখের ধাঁধা

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

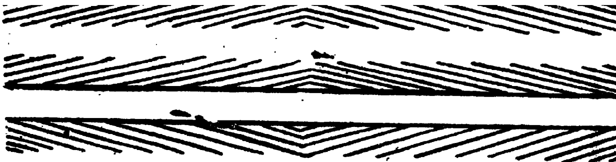


টুপিটার কানার চেয়ে উপরটা কত লম্বা দেখ ! মেপে দেখ তো একবার। দুটোই সমান ! শোয়ানো জিনিষের চেয়ে খাড়া জিনিষ যে লম্বা বেশী দেখায়।

সাদার মাঝে কালো চৌখোপী কালোর মাঝে সাদা চৌখোপীর চেয়ে ছোট দেখাচ্ছে। কিন্তু, দুটোই একই মাপের। উজ্জ্বল জিনিষ অনুজ্জ্বল জিনিষের চেয়ে যে বেশী বড় দেখায়।



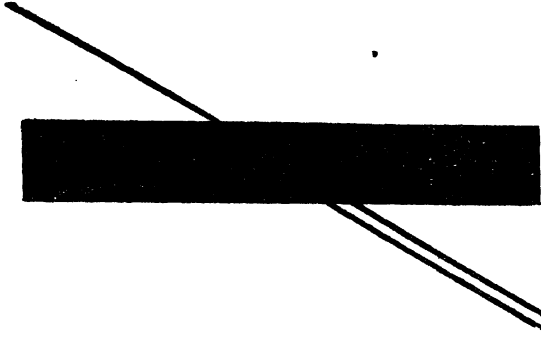
এই ছবিতে যে ছয়টি কোণাকুণি ভাবের লাইন রয়েছে সেগুলির দিকে একবার দেখ। বাঁকাচোরা ভাবে ছয়টি লাইন যেন টানা হয়েছে মনে হয়। কিন্তু, ভাল ক'রে মেপে দেখ তো। সব সমদূর ('সমান্তরাল' বা Parallel) লাইন।



আবার, এই ছবিটিতে দেখ, চারটি শোয়ানো লাইন কি রকম বাঁকা রয়েছে। আসলে কিন্তু এগুলিও সমদূর লাইন, মেপেই দেখ একবার। উপরের আর নীচের ট্যার্‌চা লাইনগুলির জন্য শোয়ানো লাইনগুলি বাঁকা দেখা যাচ্ছে।

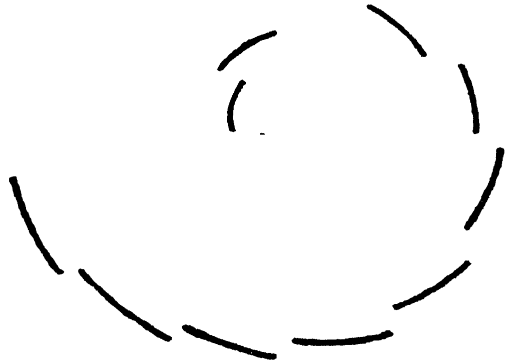
চোখের ধাঁধা

ক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

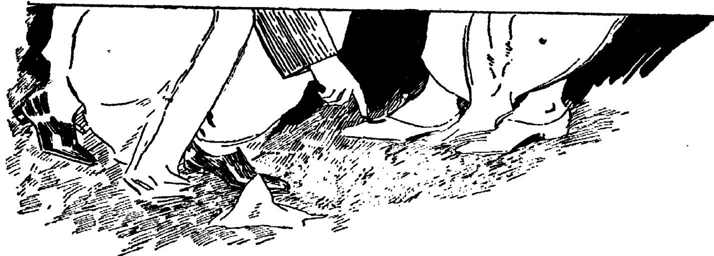


কালো মোটা লাইনের উপরে একটি বাঁকা-ভাবে লাইন আছে; নীচের দিকে দুটি লাইন আছে। নীচের কোন্ লাইনটি উপরের লাইনের বরাবর সোজা? আগে আন্দাজ কর, তা'র পর মেপে দেখ।

এই ছবিতে ছোট-বড় ১৩টি গোলাকার বৃত্তের (Circle) অংশ আঁকা আছে। মনে হয় যেন, আন্দাজে কয়েকটি বৃত্তের অংশ এঁকে দেওয়া হয়েছে—এদের এক একটির কেন্দ্র (মাঝখান বা Centre)এক এক জায়গায় হবে। কিন্তু, বৃত্তগুলি সম্পূর্ণ এঁকে ফেল্‌লে দেখা যাবে যে সবগুলিরই এক কেন্দ্র।



একটী গুরুগম্ভীর কাহিনী



অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্

শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে একখানা লোহার বেঞ্চিতে বসিয়া শ্রীযুক্ত গুরুগম্ভীর ওহ্‌দেদার ঠাণ্ডা বাতাসে নিজের মস্তিষ্কটি শীতল করিতেছিলেন। এ মস্তিষ্কটি নিতান্ত হেলাফেলার বস্তু নয়, ঠাণ্ডা থাকিলে গোটা বাংলা দেশের মহা সৌভাগ্য, আবার গরম হইয়া উঠিলে ঠিক তার বিপরীত। গুরুগম্ভীর বাবু দেশপ্রাণ ব্যক্তি, দেশের কল্যাণের জন্য তাই সময় পাইলেই নগদ কয়েক আনা পয়সা খরচ করিয়া বোটানিক্যাল গার্ডেনে মাথা ঠাণ্ডা করিতে আসেন।

কথাগুলি বড়ই হেঁয়ালীর মত শুনাইতেছে,—নাঃ? আচ্ছা আচ্ছা, দোহাই আপনাদের, বই বন্ধ করিবেন না, আমি ব্যাপারটা আরও বিশদ করিয়া দিতেছি। গুরুগম্ভীর ওহ্‌দেদার মশাই বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, ঝুড়ি ঝুড়ি ডিটেক্‌টিভ্ গল্প লেখেন! সাধারণ বাঙ্গালী-জীবনে আনন্দের তো বড় বেশী ঠাঁই নাই, তবু যা কিছু আনন্দ তারা অনুভব করে তার অনেকটাই গুরুগম্ভীর বাবুর 'বৈমানিক বিভীষিকা' 'কৃতান্তের দন্তবিকাশ' 'কলোম্বিয়ার কম্বল' প্রভৃতি বইগুলি পড়িয়া। গুরুগম্ভীর বাবুর ক্ষুরধারবুদ্ধি নায়ক কি ভাবে নিতান্ত তুচ্ছ একটা ভেড়ার লোম দেখিয়া কলোম্বিয়াবাসী ক্রোড়পতি ব্যবসাদার মিষ্টার পপারের (Mr. Pauper) তিন হাজার জোড়া কম্বল জুয়াচোরের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া দেন, পাঁউরুটিতে

একটি গুরুগম্ভীর কাহিনী

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল্

একটা কামড় লক্ষ্য করিয়াই পাকা বদ্‌মাইস্ কৃতান্ত কুমারের বাঁধান দাঁতের ফাঁকে একখানা বহুমূল্য হীরা আবিষ্কার করেন, ছুটীর দিনে সে সব কাহিনী পড়িতে পড়িতে বাঙ্গালী পাঠকেরা একেবারে আত্মহারা হইয়া যায়, বেলা দেড়টা বাজিয়া গেলেও স্নানাহারের হুঁস থাকে না। তারপর অবেলায় ভাত খাওয়ার দরুণ বিকালেও জলখাবারের তেমন তাড়া থাকে না—শুধু চায়ের পেয়ালায় গোটা কয়েক চুমুক দিয়াই নিশ্চিন্ত। এক কথায় বলিতে গেলে গুরুগম্ভীর বাবুর গ্রন্থাবলী পড়ার ফল, একাধারে আনন্দ-লাভ এবং পয়সা-সাশ্রয়। কাজেই বলিতেছিলাম, গুরুগম্ভীর বাবুর মগজ ঠাণ্ডা করার একটা জাতীয় মূল্য আছে। তিনি নিজেও এটা বেশ বোঝেন, তাই সুবিধা পাইলেই বোটানিক্যাল গার্ডেনে ছুটিয়া আসেন।

হ্যাঁ, যে কথা বলিতেছিলাম, গুরুগম্ভীর বাবু বোটানিক্যাল গার্ডেনে একখানা লোহার বেঞ্চিতে বসিয়াছিলেন, কিন্তু মন তাঁর তখন এ রাজ্যে ছিল না, সেটি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল হিমালয় পর্ব্বতের নীচেকার তরাই-এর জঙ্গলে একটা গণ্ডারের পেছন পেছন। যে ভীষণ হিংস্র জানোয়ারটির কথা মনে হইতেই আমাদের ভয়ে প্রাণ এতটুকু হইয়া যায়, গুরুগম্ভীর বাবুর কলমের গুণে সেই জীবটিই বাঙ্গালীদের যে কতখানি আনন্দ দিবে কে জানে ?

গুরুগম্ভীর বাবুর একটা চিরকালের অভ্যাস, মনে ভাব আসিলে তিনি আর কিছুতেই বসিয়া থাকিতে পারেন না, উঠিয়া পায়চারি করিতে সুরু করেন। এমনিতর ভাব শীঘ্রই আসিয়া গেল, ভদ্রলোক লোহার বেঞ্চি ছাড়িয়া বাগানের মধ্যে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। বাগানের মধ্যে খানিকটা জায়গা লতাপাতার বেড়ায় ঘেরা, ভিতরে বসিবারও বন্দোবস্ত আছে। অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে কখন যে তিনি সেখানে আসিয়া পড়িয়াছেন তা তাঁর খেয়ালেই আসে নাই। হঠাৎ তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁর ভাবের সূতা ছিঁড়িয়া গেল,

একটি গুরুগম্ভীর কাহিনী

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল্

তরাই জঙ্গলে গণ্ডারের পেছন-ধাওয়া মন এক নিমেষে শিবপুর বাগানের ছোট্ট লতা-পাতায় ঘেরা আসনখানির নিকটে উড়িয়া আসিল।

বেড়ার আড়ালে দুইজন লোক কথা কহিতেছিল, বেশ উত্তেজিত স্বরের কথাবার্ত্তা। গুরুগম্ভীর বাবু উঁকি মারিয়া দেখিলেন, একজন অপরের হাতের কব্জি চাপিয়া ধরিয়া বলিতেছে "বল, আমার কথায় তুমি রাজী! নইলে এই নির্জ্জন যায়গায় এক্ষুণি তোমায় শেষ করব — বাধা দিতে জন-প্রাণীও আসবে না।"



গুরুগম্ভীর বাবুর বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল, দম বন্ধ করিয়া তিনি শুনিলেন অপর লোকটি জবাবে বলিতেছে, "না, না, দোহাই তোমার, আমায় মেরো না। আমার মা ভাই-বোনদের কি তুমি পথে বসাতে চাও?"

প্রথম লোকটি বলিল, "ও সব ছেঁদো কথায় এ শর্ম্মারাম ভোলে না বাবা,

আমার কাছে স্রেফ্ দু'টি কথা। হয় রাজী হয়ে পড়, আর নয় তো……" লোকটা কথা শেষ করিল না, বিষম জোরে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে একটা ঝাঁকুনি দিল।

"উঃ হুঃ হুঃ, হাতটা ভেঙ্গে দিলেরে!" দ্বিতীয় ব্যক্তিটি প্রায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "আচ্ছা আমায় ভাব্বার জন্য কিছুদিন সময় দাও, আমি কথা দিচ্ছি এ সময়ের ভেতর কোন জন-প্রাণীর কাছে ঘুণাক্ষরেও কোন কথা প্রকাশ করব না।"

"ঠিক ?"

"ঠিক।"

"আচ্ছা তাই হবে তা হলে; কিন্তু বেইমানি করলে কি হবে জান তো ?" বলিয়া বাঘের থাবার মত দুইটি মুঠো সে একবার একত্র করিল।

গুরুগম্ভীর বাবুর সমস্ত শরীর তখন উত্তেজনায় কাঁপিতেছে। এত দিন পর্য্যন্ত তাঁর উপন্যাসের নায়কেরাই কেবল অদ্ভুত অদ্ভুত বুদ্ধির খেলা দেখাইয়া সারা বাংলাকে তাক্ লাগাইয়াছে, এইবার বুঝি তাক্ লাগাইবার পালা পড়িল তাঁর নিজেরই উপর। এই গুণ্ডাটার হাত হইতে নিরুপায় লোকটাকে উদ্ধার তিনি করিবেনই। এটুকু উপকারের আশাও কি সমাজ তাঁর কাছে রাখে না ? বৃথাই তবে তিনি এতখানি শক্তি নিয়া জন্মিয়াছেন। তিনি নিঃশব্দে তন্ময়ভাবে পাইচারি করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ তাঁর হুঁস্ হইল পায়চারিতে অমূল্য সময় নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাড়াতাড়ি আর একবার বেড়ার ফাঁকে চোখ লাগাইয়া তিনি দেখিলেন কিছুদূরে একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া, দুর্ব্বল লোকটি সেইদিকে আগাইতেছে। পিছন হইতে গুণ্ডা চেঁচাইয়া উঠিল, "তা হলে রামলোচনপুরে ফের দেখা হবে।"

"হ্যাঁ" বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গুরুগম্ভীর বাবু লোক-

টিকে ইঙ্গিতে থামিতে বলিবেন কিনা ভাবিবার আগেই সে গাড়ী দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল।

এইবার তিনি পড়িলেন বাস্তবিকই চিন্তার ভিতর। সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, কাছে দাঁড়াইয়াও মানুষের মুখ নজরে পড়ে না, তবে সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয় গুণ্ডার গায় অপরিমিত শক্তি। এই জনশূন্য জায়গায় হঠাৎ তার মুখোমুখী হইয়া কোন কিছু বলিতে তাঁর সাহসে কুলাইল না। মনে মনে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, তাঁর উপন্যাসের কোন নায়ক এখানে উপস্থিত থাকিলে সে কি করিত। নিশ্চয়ই কৌশলে লোকটার কাছ হইতে এমন একটা কিছু বাহির করিবার চেষ্টা করিত যাতে ভবিষ্যতে অনেকখানি কাজ দিতে পারে। কি করা যায় ?

হঠাৎ গুরুগম্ভীর বাবু লক্ষ্য করিলেন, লোকটা পকেট হইতে একটা টিনের কৌটা বাহির করিল ; সে কৌটাটির মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট খোপ, কোনটায় পান, কোনটায় চূণ, কোনটায় কুচিকুচি করিয়া কাটা সুপারি ইত্যাদি। চট্ করিয়া তাঁর মাথায় একটা ফন্দি খেলিয়া গেল ; নিজের পকেটেও পান ছিল, তিনি একটি খিলি খুলিয়া চূণটুকু ঝাড়িয়া ফেলিলেন। তারপর যেন আচম্কাই লোকটাকে প্রথম দেখিতেছেন এইরূপ ভাণ করিয়া তার সম্মুখে গিয়া কহিলেন, "মশাই যদি দয়া করে একটু চূণ দেন, পানের চূণগুলো ঝরে গেছে, অথচ এ তেপান্তরের মাঠে পানের দোকানই বা পাই কোথা ?"

লোকটা মুখে কোন কথা বলিল না, কেবল আঙ্গুলের ডগায় করিয়া কৌটা হইতে খানিকটা চূণ নিয়া গুরুগম্ভীর বাবুর পানের উপর লাগাইয়া দিল মাত্র। তিনি ধন্যবাদ দিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন, "বাছাধন, কি কাণ্ড করে বস্‌লে খেয়াল রাখ কি ? তোমার আঙ্গুলের ছাপ যে আমায় দিয়ে দিলে—ভবিষ্যতে তোমায় আঁচ্‌বার সুবিধা করে দিলে।"

কিন্তু শুধু আঙ্গুলের ছাপই তো যথেষ্ট নয়, লোকটি কোন্ অঞ্চলে থাকে তারও একটু ধারণা নেওয়া দরকার। যেন কথা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিতেছেন এমনি ভাবে গুরুগম্ভীর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "শেষ ফেরি তো চলে গেছে, এখন কল্‌কাতা ফিরি কি করে তাই ভাবছি···মশাই বোধ হয় এ অঞ্চলেই থাকেন ?"

"আজ্ঞে না, আমি থাকি লেক রোডে।"

গুরুগম্ভীর বাবু মনে মনে আবার হাসিলেন; হাতের ছাপ পাওয়া গেছে, বাসস্থানেরও হাদিস্ মিলিল, এবার আর একটু চিহ্ন। অন্ধকার তখন গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, লোকটার মুখ দেখিয়া চিনিয়া রাখার উপায় নাই; চারিপাশও জনমানবশূন্য। জুতা খুলিয়া রাখিয়া বেঞ্চির উপর পা তুলিয়া লোকটা বসিয়াছিল; গুরুগম্ভীর বাবু ধীরে ধীরে তার পাশে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। বসিয়াই তিনি টের পাইলেন বেঞ্চিখানায় সদ্য রং লাগানো হইয়াছে, অনেক জায়গা তখনও শুকাইতে বাকী। এইবার তাঁর মাথায় আর একটী বুদ্ধি গজাইয়া উঠিল, যা বোধ করি তার উপন্যাসের কোন নায়কের মাথায়ও কোন দিন গজায় নাই। আঙ্গুলের ডগায় প্রথমতঃ খানিকটা কাঁচা সবুজ রং তিনি তুলিয়া নিলেন; তারপর রুমালখানা যেন হঠাৎ মাটীতে পড়িয়া গেছে এমনি ভাব দেখাইয়া সেখানাকে তুলিবার ফাঁকে সেই রং মাখানো আঙ্গুল লোকটার এক পাটি জুতায় সজোরে ঘষিয়া দিয়া মনে মনে বলিলেন, "যদি তোমার বেরোবার একজোড়া বই জুতো না থাকে, আর রোজ যদি জুতো সাফ্ করার অভ্যাস তোমার না থেকে থাকে তবে এই সবুজ রংই তোমার কাল হবে।"

(২)

পরদিন বেলা আন্দাজ আটটার সময় গুরুগম্ভীর বাবু হাজরা রোডের মোড়ে দাঁড়াইয়া ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, উদ্দেশ্য লেক-পল্লীতে গিয়া

লোকটার একটু অনুসন্ধান করিবেন। ট্রাম আসিতে কিছু দেরী ছিল, অস্থির ভাবে তিনি ফুটপাথের উপর পাইচারি করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ওই যে মণিহারী দোকানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একটি লোক জিনিষ বাছিতেছে, ওর জুতায় ও কিসের দাগ? এতো কাল রাত্রের বোটানীক্যাল গার্ডেনের সেই মার্কা-মারা জুতা। তিনি জুতার মালিকের প্রতি ঘন ঘন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; হুঁ, যতদূর মনে হইতেছে এতো সেই ব্যক্তিই।

একখানা ট্রাম মোড় ফিরিল, গুরুগম্ভীর বাবু ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। একটা ল্যাম্প-পোষ্টের নীচে দাঁড়াইয়া খরদৃষ্টিতে তিনি দেখিতে লাগিলেন, কখন্ লোকটা দোকানের বাহির হয়।

জিনিষপত্র সওদা করিয়া লোকটা শীঘ্রই দোকান হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং দক্ষিণ মুখে হাঁটা দিল; গুরুগম্ভীর বাবুও খানিকটা ব্যবধান রাখিয়া তার পেছুপেছু চলিতে লাগিলেন। রাসবিহারী এভিনিউ হইয়া সে লেক্ রোডে পড়িল, গুরুগম্ভীর বাবু তখনও সমানে তাল রাখিয়া পিছন পিছন চলিয়াছেন। আরও খানিকক্ষণ হাঁটার পর ভদ্রলোকের মনস্কামনা পূর্ণ হইল, তিনি সাহ্লাদে লক্ষ্য করিলেন লোকটা বাড়ীতে ঢুকিতেছে।

বাড়ীর সন্ধান তো মিলিল কিন্তু এখন কর্ত্তব্য কি? গুরুগম্ভীর বাবু হঠাৎ কোন মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এটা ঠিক যে কোন স্থানে নিরিবিলিতে বসিয়া একটু চিন্তা করা প্রয়োজন। ধারে পাশে এমন একটা জায়গা কি নাই? আছে বই কি, সামনের ওই চায়ের দোকানটা? এক কাপ চায়ের সঙ্গে একটি মাম্‌লেটের ফরমাস্ করিলে মিনিট পনেরো কোন্ না কাটিবে? ছোট দোকান হইলে বোধকরি আরও বেশী, কেননা ডিম তাদের ঘরে মজুত থাকে না, কিনিয়া আনিতে হয়।

একটী গুরুগম্ভীর কাহিনী

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্

গুরুগম্ভীর বাবু ঠিকই আঁচিয়াছিলেন, একটি মাম্‌লেট সহ এক কাপ চা পরিবেশন করিতে দোকানী আধঘণ্টা সময় লাগাইল। ইতি মধ্যেই মৎলব আঁটা তাঁর সমাধা হইয়া গেছে—প্রথমে খবর নিতে হইবে ও বাড়ীটার মালিক কে; দ্বিতীয়তঃ চাকরের নাম কি; কেন না তার সঙ্গে একটু বন্ধুত্ব পাতানো দরকার। প্রথম খবরটা মিলিল দোকানীর নিকট হইতেই—ও বাড়ীর কেউ বিশেষ মালিক নেই; কারণ ওটা নাকি মেস্।

একটা চলতি কথা আছে সৎকাজে সুযোগের অভাব হয় না। কথাটা যে কতবড় সত্য তা একটু বাদেই গুরুগম্ভীর বাবু টের পাইলেন যখন ফুটপাথে নামিয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন সেই মেস্ বাড়ীটা হইতে একজন চাকর এক-তাড়া চিঠি হাতে বাহির হইতেছে। বড় বড় পা ফেলিয়া তিনি চাকরটার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইতেই তার হাতের সব চাইতে উপরের খামখানা আনন্দের বাণ হইয়া তাঁর বুকে আসিয়া বিঁধিল। তিনি দেখিলেন পরিষ্কার গোটা গোটা হরফে তাতে ঠিকানা লেখা আছে "পোঃ রামলোচনপুর।" এ নিশ্চয়ই তবে সেই লোকটার চিঠি।

এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই গুরুগম্ভীর বাবু তাঁর সব কয়খানা বইয়ের সব কয়টি নায়কের কথা স্মরণ করিলেন—এ অবস্থায় পড়িলে তারা কি করিত। হঠাৎ তাঁর মনে পড়িল কলম্বিয়ার কম্বলে অনেকটা এই ধরণের ব্যাপারই ঘটিয়াছিল বটে। হ্যাঁ, হইয়াছে, তাঁর সৃষ্ট নায়কের অনুকরণ আজ নিজেই তিনি করিবেন।

ফুটপাথের উপর একটা লোক অনেকগুলি কলা সাজাইয়া বিক্রীর উদ্দেশ্যে বসিয়াছিল। গুরুগম্ভীর বাবু লোকটার পায়ের কাছে একটা আনি ফেলিয়া দিয়া নিঃশব্দে একটি কলা তুলিয়া নিলেন, তারপর একটু এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া কেউ না দেখিতে পায় এম্‌নি ভাবে সেই কলার খোসাটি চাকরের পায়ের ঠিক

তলায় ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাজ্জব কাণ্ড ঘটিয়া গেল, হুড়মুড়ি খাইয়া ভৃত্য পড়িল ফুটপাথে আর তার হাতের চিঠিগুলি পড়িল চারিদিকে ছড়াইয়া। গুরুগম্ভীর বাবু তাড়াতাড়ি চাকরটাকে ধরিয়া তুলিবার অছিলায় নিজের শরীরটাকে তালমাফিক্ এমন জায়গায় আনিয়া ফেলিলেন যাতে সে কোন



মতেই চিঠিগুলির উপর নজর রাখিতে না পারে; আর সেই ফাঁকে তাঁর বাঁ হাতটি নির্দ্দিষ্ট চিঠিখানি তাঁর জামার বাঁ পকেটে পৌঁছাইয়া দিল। তারপর লোকটাকে দু'চারটি মিষ্টি কথায় আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিতে আর কতক্ষণ?

ট্রামে উঠিয়া ধীরে সুস্থে গুরুগম্ভীর বাবু খামখানা খুলিলেন। তাঁর হিসাবে এতটুকু ভুল হয় নাই; চিঠিতে তিনি যা দেখিতে পাইবেন আশা করিয়াছিলেন ঠিক তাই আছে। দলের কোন বন্ধুর নিকট চিঠিখানা লেখা হইয়াছে, ভাষাটা এই রকম—

"১২ই জুলাই ভোরে আমি রামলোচনপুর পৌঁছিব। পার তো ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিও। একখানা ভোজালির ব্যবস্থা রাখিবে। অন্যান্য কথা সাক্ষাৎ মতই হইবে।"

(৩)

ছোট একটা সুটকেসে আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্র গুছাইয়া ১১ই জুলাই সন্ধ্যার পর গুরুগম্ভীর বাবু শেয়ালদ' ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁকে বড়ই ব্যস্ত এবং উন্মনা দেখাইতেছে, ষ্টেশনের জন-সমুদ্রের মধ্যে তাঁর চোখ দু'টী কাকে যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। হঠাৎ তিনি কেমন যেন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং তারপরেই দেখা গেল বুকিং অফিসের সামনে আসিয়া তিনি একখানা রামলোচনপুরের টিকেট কাটিতেছেন।

প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল; গুরুগম্ভীর বাবু কিন্তু উঠিলেন না, এক কোণে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একটু পরেই তাঁর সাম্‌নে দিয়া হাঁটিয়া গেল—শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে দেখা সেই গুণ্ডা ধরণের লোকটা। গুরুগম্ভীর বাবুকে সে দেখিয়াও দেখিল না—চিনিতেই পারিল না। তিনি একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসিলেন—সকলেই তো আর তাঁর মত ঐশ্বরিক শক্তি নিয়া পৃথিবীতে আসে নাই, এতে আশ্চর্য্য হইলে চলিবে কেন?

লোকটা কোন্ কাম্‌রায় ওঠে বিশেষভাবে তিনি তা লক্ষ্য করিলেন, তারপর সেই কামরা হইতে অনেকটা তফাতে একখানা অপেক্ষাকৃত খালি গাড়ী দেখিতে পাইয়া তাতেই চাপিয়া বসিলেন। পাছে কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় ব্যাপারটা জানাজানি হইয়া যায় এই ভয়ে তিনি ইণ্টার ক্লাশে না উঠিয়া উঠিলেন থার্ড ক্লাসে।

পরদিন ভোর ছ'টায় রামলোচনপুর ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিতেই সুটকেস হাতে গুরুগম্ভীর বাবু নামিয়া পড়িলেন। দূর হইতে তিনি লক্ষ্য করিলেন, লেক

রোডের গুণ্ডাও নামিতেছে। একটি যুবক আসিয়া তার সঙ্গে মিলিল। তিনি দেখিলেন, উভয়ে ষ্টেশনের ফটক পার হইয়া বাহির হইতেছে।

এ কয়দিনের অভ্যাসে গুরুগম্ভীর বাবু লোকের পেছু অনুসরণ করিতে বিশেষ পটু হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিতেই হইবে, কেননা দেখা গেল, যুবক দুইটীর কথাবার্ত্তা বোঝা যায়—এইটুকু ব্যবধান রাখিয়া দিব্যি তিনি তাদের পেছন পেছন হাঁটিতে সুরু করিয়াছেন।

লেক্ রোডের গুণ্ডাই প্রথম আলাপ আরম্ভ করিল—কহিল, "এর আগে কিছুতেই আসা সম্ভব হল নারে, সাহেব ছুটীই দিতে চায় না। ঠিক পাংচুয়ালি সন্ধ্যার সময়ই প্লে আরম্ভ হবে তো? কাঠের ভোজালি জোগাড় করেছিস্? তা থিয়েটারে ওতেই চলে যাবে। আচ্ছা, রিহার্স্যাল্টা একবার পথে যেতে যেতেই দিয়ে নে দেখি···আমি সুরু করি 'বল, আমার কথায় তুমি রাজী! নইলে এই নির্জ্জন যায়গায়, এখুনি তোমায় শেষ কর্‌ব—বাধা দিতে জনপ্রাণীও আস্‌বে না।"

গুরুগম্ভীর বাবু 'থ' হইয়া গেলেন, শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে তবে এরা দু'জনে সেদিন থিয়েটারের রিহার্স্যাল দিতেছিল?

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শুনিতে পাইলেন, অপর যুবকটি বলিতেছে "না না, দোহাই তোমার আমায় মের না!···"

শুধু ব্যথা লাগিবার ভয়েই গুরুগম্ভীর বাবু ধপ্ করিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িলেন না, পেছনে চেয়ার থাকিলে নিশ্চয়ই বসিয়া পড়িতেন।

এতদিনকার এতখানি পরিশ্রম, সারা রাত ট্রেণে রাত্রি জাগা—সবই তবে এই হাস্যকর ব্যাপারের পেছনে? ধীরে ধীরে গুরুগম্ভীর বাবু একটা গাছের তলায় গিয়া সিগারেট্ ধরাইলেন।

যুবক দুইটী ইতিমধ্যে অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছিল, হঠাৎ দেখা গেল

লেকরোড্-বাসী কি কারণে এদিকে ফিরিতেছে। স্টেশনে কি একটা কাজ করিতে সে ভুলিয়া আসিয়াছে। গুরুগম্ভীর বাবুর পাশ কাটাইয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ সে একেবারে থমকিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই পরম বিনয়ে গলিয়া গিয়া বলিল, "একি! সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক গুরুগম্ভীর বাবু, আপনি এখানে?"



এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে গুরুগম্ভীর বাবু একেবারে ঘামিয়া উঠিলেন, "তুমি—তুমি, আপনি কি করে বুঝলেন আমিই গুরুগম্ভীর ওহ্‌দেদার?"

"কাল্‌কের খবরের কাগজে দেখেছিলাম, আপনি কিছুদিন কল্‌কাতা সহরে থাক্‌বেন না।"

"তাই থেকেই আমায় চিনে ফেল্লেন?"

"আজ্ঞে না। আপনার প্রত্যেকখানা বই-ই আমার ঠোঁটস্থ 'কৃতান্তের দন্তবিকাশের' ডিটেক্‌টিভ্ যে ভাবে সিগারেট্ ধরে, যে ভাবে ধোঁয়া ছাড়ে বলে আপনি

লিখেছেন, অবিকল সেই ভাবে আপনি নিজেও সিগারেট্‌টি ধরেছেন, ধোঁয়া ছাড়্‌ছেন।”

“য়্যা!”

তারপর আমি শুনেছি আপনি কল্‌কাতার বেলগেছেয় থাকেন। আপনার পায়ের জুতো জোড়ার দিকে তাকান দেখি একবার। বেলগেছের কানাই দাসের কারখানা ছাড়া এ জুতো কি আর কোথাও পাওয়া যায়?”

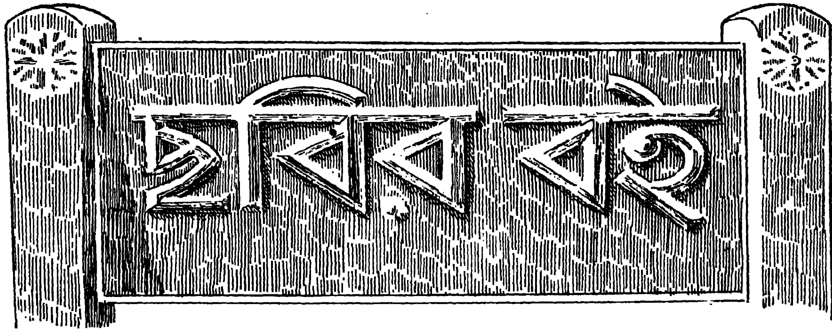
“শুধু এই থেকেই আপনি আমায় এঁচেছেন?” গুরুগম্ভীর বাবুর কথায় দারুণ বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।

লোকটা এবার একটু হাসিয়া বলিল “আজ্ঞে না, ছোট্ট আর একটু জিনিষ আপনাকে আঁচবার সাহায্য করেছে। আপনার ওই স্যুটকেস্‌টার ওপর আপনার নাম-ধাম সমস্তই লেখা আছে।”

* * * *

সেদিন সকাল আটটা ষোল মিনিটের গাড়ীতেই গুরুগম্ভীর বাবু কলিকাতার দিকে রওনা হইলেন, লেকরোড্‌বাসীর বহু অনুরোধেও তাদের থিয়েটার দেখিয়া যাইতে রাজী হইলেন না।





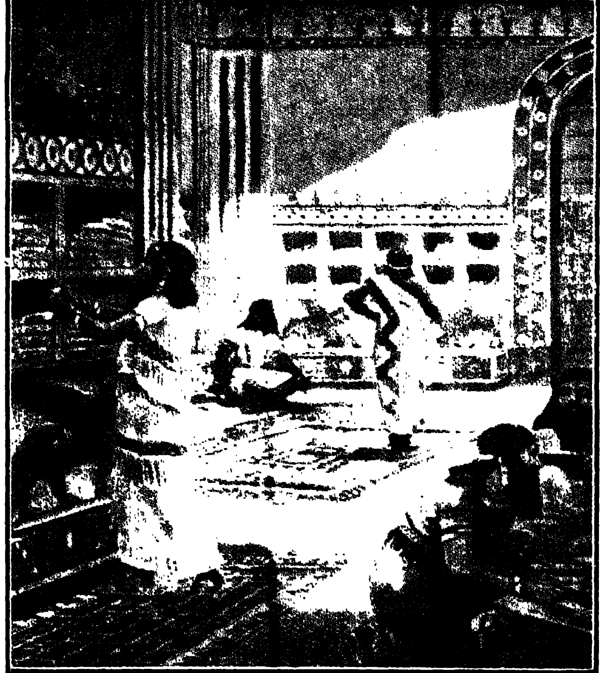
শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

মানুষ ছবির ভক্ত চিরকালই। তাই সে লিখ্‌তে শিখ্‌বার আগেই ছবি আঁক্‌তে শিখেছিল; অর্থাৎ অক্ষরের সৃষ্টি হবার বহুকাল আগেই মানুষ ছবি এঁকেছিল। আদিম 'গুহা-মানব', যা'রা গহ্বরে বাস করত, পাথরের হাতিয়ার বানিয়ে আত্মরক্ষার কাজ চালা'ত, কাঁচা মাংস খেত;—তা'রাও ছবি আঁক্‌তে চেষ্টা ক'রেছিল। আজও সেই আদি মানবের আঁকা ছবি গহ্বরের মধ্যে থেকে মানুষের ছবি-প্রিয়তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তা'দের ছবি খুব পাকা-হাতের না হ'লেও, তা'দের সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির তুলনায় বেশ ভালই ছিল। সেই ছবি থেকে আমরা 'ম্যামথ' নামে অতিকায় লুপ্ত হাতীর চেহারার নমুনা পাই; সেই ছবি থেকে আমরা প্রাচীন কালের গণ্ডার, হরিণ প্রভৃতি আরও দু' চারটি জন্তুর নমুনা পাই।

ছবি আঁক্‌তে আঁক্‌তে মানুষ ক্রমে অক্ষরের সৃষ্টি কর্‌ল। প্রথম অক্ষর সৃষ্টি হয়েছিল ছবি থেকেই। ইজিপ্টের অতি-প্রাচীন 'হাইরোগ্লিফিক' (Hieroglyphic) অক্ষর ছবিরই সমষ্টি। ক্রমে সেই ছবি-অক্ষর পরিবর্ত্তিত হ'য়ে সাধারণ অক্ষরের সৃষ্টি হয়েছে।

অক্ষর যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখনও মানুষ বইএর কথা ভাবে নি;—কারণ তখন কাগজ, কালি, কলম প্রভৃতির সৃষ্টি হয় নি। তা'রা পাহাড়ের গায়ে

খোদাই ক'রে লিখ্‌ত; ছবি আঁক্‌ত। ক্রমে, তা'দের মাথায় বুদ্ধি এল যে, ছোট ছোট পাথরের উপর খোদাই করলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সে লেখা নিয়ে যেতে সুবিধা হবে। এই ভাবে বহুকাল পাথরে খোদাই লেখা চ'লে এসেছিল। পাথরে খোদা শত শত টুক্‌রো নিয়ে হয়তো এক একটি বই হ'তো। তা'র মলাট থাক্‌ত না, বাঁধাই থাক্‌ত না। একটা বই চাইলে হয়তো তোমাকে ৫।৭ গাড়ী মাল (পাথর-পত্র) এনে হাজির করত! যাক্; তখনকার লোকে এই ভাবেই অনেক বিদ্যা শিখ্‌ত; পাথরের বই প'ড়েই তা'রা জ্ঞানী হয়েছিল। তখন এক একটা 'লাইব্রেরী' এক একটা বিরাট ব্যাপার হ'তো। দশ-বিশখানা বই রাখ্‌তে হ'লেই তো চক্ষুস্থির! সুখের বিষয়, তখন মানুষের জ্ঞান এতটা অগ্রসর হয় নি; কাজেই বইও বেশী ছিল না। আজও তিব্বতে পাথরে-খোদাই বইএর লাইব্রেরী আছে।



সেকালের লাইব্রেরী। তাকের উপরের এক একটি ইঁট বইএর একটি পৃষ্ঠা মাত্র



ছবির বই

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

বহু শতাব্দী ধ'রে পাথরে খোদাই ক'রে লেখার পর মানুষ চামড়া, গাছের ছাল, পাতা প্রভৃতির উপর লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। ইজিপ্টের প্যাপিরাস গাছের ছাল আর ভেড়ার চামড়া থেকে তৈরী পার্চমেণ্ট সর্ব্বপ্রথমে চল হয়েছিল। 'প্যাপিরাস' নাম থেকে পরে 'পেপার' (Paper) কথাটির সৃষ্টি হয়। প্যাপিরাস বেশ মজবুত আর মসৃণ ছিল; তাই তার উপর লিখ্‌বার সুবিধাও ছিল। লম্বা থানের মত প্যাপিরাস নিয়ে তা'র উপর টানা লিখে যাওয়া হ'তো। পার্চমেণ্ট খুব বড় হ'তে পার্‌ত না; কাজেই দু' চারখানা 'তা' পার্চমেণ্ট নিয়ে, ভাঁজ ক'রে এক একটি 'বই' বা পুঁথি হ'তো।

মোমের উপর লেখার চল তা'র কিছুকাল পরে হয়েছিল। এ লেখা বেশী দিন স্থায়ী হবার কোন সম্ভাবনা না থাকায় এর চল অল্পদিনেই উঠে যায়। মোমের উপর লেখা খুব সহজ;—আঁচড় দিয়ে লিখে গেলেই হ'লো।

পার্চমেণ্ট বহুকাল ধরে চলেছিল—আজও চলে। আইনের অনেক দলিল তখনকার দিনে পার্চমেণ্টে লেখা হ'তো। এখনও, খুব দরকারী অনেক দলিল পার্চমেণ্টে লেখা হয়;—কারণ, পার্চমেণ্টের মত মজবুত কাগজ হয় না।

আমাদের দেশে তালপাতা ভূর্জ্জপত্র প্রভৃতি পাতার উপর লেখার রীতি বহুকাল থেকে চ'লে আস্‌ছে। আজও অনেক পুঁথি পাতার উপর লেখা হয়। বর্ম্মায়ও পাতায় লেখা বই চলে।

কাগজ আবিষ্কারের পর থেকে আস্তে আস্তে হাতের লেখার উন্নতি হ'তে আরম্ভ করল। তখনও ছাপার আবিষ্কার হয় নি। তখনকার কাগজ খুব মজবুত হ'তো; কিন্তু এখনকার কাগজের মত মসৃণ হ'তো না।

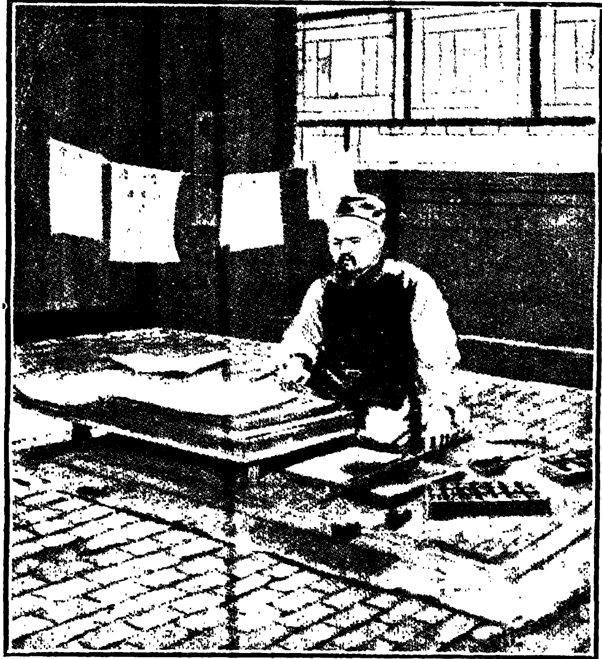
ক্রমে বই বাঁধা আরম্ভ হ'লো; বইএ মলাটও দেওয়া হ'তে লাগ্‌ল। চীনদেশে সে সময় কাঠে খোদাই ক'রে, সেই খোদাই কাঠে কালী লাগিয়ে

ছবির বই

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

কাগজে ছাপ উঠিয়ে বই ছাপা হ'তো। ইউরোপে ছাপা আবিষ্কার হবার বহু শতাব্দী আগেই চীনারা ছাপ্‌তে শিখেছিল।

প্রায় ৫৫০ বছর আগে ইউরোপে প্রথমে ছাপা আরম্ভ হয়। গুটেনবার্গ নামে একজন জার্ম্মাণ কাঠ খোদাই ক'রে ছাপা আরম্ভ করেন। ক্রমে তিনি কাঠের ছাপা-যন্ত্র বা প্রেস্‌ তৈরী করেন। তারপর তিনি আল্‌গা হরফ খোদাইও আরম্ভ করেন। তা'তে ভাল ফল না পেয়ে তিনি সীসার অক্ষর ঢালাই কর্‌তে আরম্ভ করেন।



১০০০ বছর আগের চীনদেশী ছাপাখানা

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছাপার উন্নতি আরম্ভ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছবির বইও ছাপা হ'তে লাগ্‌ল; কারণ মানুষ ছবি ভালবাসে বহুকাল থেকেই।

এর পর ক্রমে উন্নতিই হ'তে লাগ্‌ল। ভাল, মসৃণ কাগজ তৈরী হ'লো, সুন্দর হরফ ঢালাই হ'লো, ছাপার কলের আশ্চর্য্য উন্নতি হ'লো; ভাল কালি তৈরী হ'লো;—কাজেই, ছাপা বইও অনেক সুন্দর হ'তে লাগ্‌ল।

ছবির বই

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

ক্রমে ফটোগ্রাফিরও উন্নতি হ'তে লাগ্‌ল। তখন মানুষ ভাব্‌ল, হাতে আঁকা ছবি যদি ফটোগ্রাফির সাহায্যে ধাতুর উপর খোদাই করা যায়, তা' হ'লে কেমন হয়? ফটোগ্রাফ তুলে, তা' থেকে খোদাই করা কত শক্ত তা' অনেকবার পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল। খুব ওস্তাদ কারিকর না হ'লে ফটোর সঙ্গে খোদাইএর মিল রাখ্‌তে পার্‌ত না। তাই মানুষ চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল যা'তে ফটোর সাহায্যে ছবি খোদাই করা চলে। এ বিষয়ে নানা রকমের পরীক্ষা হ'য়ে শেষটায় 'লাইন' (Line) ও 'হাফটোন' (Halftone) ব্লক, 'ফটোগ্রেভিওর' (Photogravure), ফটো লিথো (Photo Litho) প্রভৃতি ছবি-তৈরীর প্রণালী আবিষ্কৃত হয়েছে।

একদিনে বা পাঁচ সাত বছরেও এ আবিষ্কার কাজে লাগে নি। পরীক্ষা থেকে কার্য্যকরী অবস্থায় আস্‌তে কোন কোন সময়ে পঞ্চাশ ষাট বছরও লেগে গিয়েছিল। কিন্তু, যখন কাজে লাগ্‌ল তখন ছবির বইএ যুগান্তর উপস্থিত হলো। খবরের কাগজে, বইএ, বিজ্ঞাপনে—সর্ব্বত্রই আজ ছবি, ছবি, ছবি।

তোমরা যে সব বই সচরাচর দেখ বা পড়, তা'তে যে ছবি থাকে সেগুলি প্রায় সবই 'হাফটোন' বা 'লাইন' ছবি; মাঝে মাঝে কাঠ খোদাইও থাকে। 'হাফটোন' ছবি কা'কে বলে জান কি? আচ্ছা; আগে 'লাইন' ছবি কা'কে বলে তা' জান, তা' হ'লেই হাফটোন ছবি সম্বন্ধে সহজে বুঝ্‌তে পারবে।

লাইন বা রেখা দিয়ে যে সব ছবি আঁকা হয়—অর্থাৎ, যা'র মধ্যে সাদা আর কালো ছাড়া আর কিছু নাই—তা'কে 'লাইন' ছবি বলে। এই প্রবন্ধের নামের ছবিটি দেখ্‌লেই বুঝবে।

'হাফটোন' ছবিতে সাদা আর কালো ছাড়া, সাদা-কালোর মাঝামাঝি রংও থাকে—যেমন ফটোতে আমরা দেখি। কুচ্‌কুচে কালো থেকে ধব্‌ধবে

ছবির বই

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী



হাফটোন (মোটা দানার)

সাদার মাঝামাঝি সব রকমের ছেয়ে, ঘোর ছেয়ে প্রভৃতি রং হাফটোনে দেখা যায়—'লাইন' ছবিতে তা' হয় না। এই ছবিটি দেখ্‌লেই বুঝ্‌বে।

আচ্ছা, এবার সংক্ষেপে 'লাইন' ছবির ব্লক ('ব্লক' মানে, যে খোদাই থেকে ছবি ছাপা হয়) তৈরীর কথা বলি। প্রথমে ক্যামেরার সাহায্যে মূল ছবিটির (অর্থাৎ, যে ছবি থেকে ব্লক বানাতে হবে) একটা নেগেটিভ (Negative) তোলা হয়;—যেমন আমরা সাধারণ ফটোগ্রাফির ব্যাপারে ক'রে থাকি। কিন্তু এই নেগেটিভে ছবিটি, সাধারণ ফটোগ্রাফের মত উল্টা না উঠে সোজাই ওঠে। ক্যামেরার লেন্সের সাম্নে আয়না-লাগান একটি ত্রিকোণ-কাঁচ থাকে তারই সাহায্যে সোজা ছবি ওঠান যায়।



হাফটোন (সূক্ষ্ম দানার)

ছবির বই

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

নেগেটিভে মূল ছবির সাদা জায়গা কালো ওঠে, কালো জায়গা সাদা ওঠে। তারপর, তামা বা দস্তার পাতলা ফলকের উপর সিরিশ, এমোনিয়াম বাইক্রোমেট, ডিমের সাদা অংশ প্রভৃতি মিশিয়ে তৈরী করা একরকম আঠাল জিনিষ লাগিয়ে, শুকিয়ে নিয়ে, অন্ধকার ঘরে একটি কাঁচ-লাগান ফ্রেমের মধ্যে নেগেটিভের পিছনে তামা বা দস্তার ফলকটিকে লাগিয়ে কিছুক্ষণ ফ্রেমটিকে রোদে রাখা হয়। নেগেটিভে যে যে জায়গা সাদা আছে, ফলকের সেই-সেই জায়গায় রোদ লাগে।

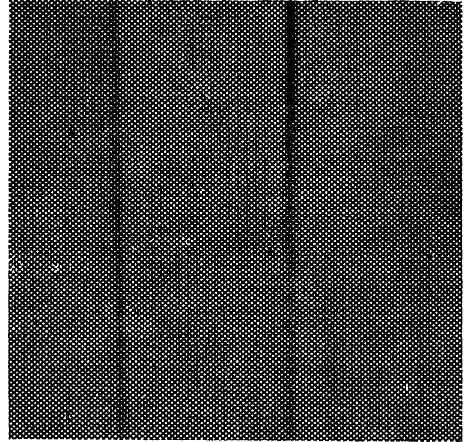


হাফটোনের নেগেটিভের চেহারা

এর পর, ফ্রেম থেকে ফলক খুলে নিয়ে গরম জলে ভিজালে, যে সব জায়গায় রোদ লাগে নি তার উপর থেকে সেই আঠাল জিনিষটি ধুয়ে উঠে যায়। এবার ঐ ফলককে আরকের সাহায্যে 'খোদাই' করা হয়—অর্থাৎ, যেখানে রোদ লেগেছে, সে সব জায়গা বাদে অন্য জায়গা আরকে ক্ষয় পেয়ে নীচু হয়ে যায়; ছবির লাইনগুলি উঁচুই থেকে যায়। তারপর আর কি? খোদাই শেষ হ'লে ফলকটিকে ছেঁটে ঠিক ক'রে, কাঠের তক্তার উপর লাগিয়ে, ছাপার হরপের সমান উঁচু করা হয়। কাজের সুবিধার জন্য এবং খরচ কমাবার জন্য তামার বা দস্তার পাতলা চাদরের উপর খোদাই করা হয়; শেষে, কাঠের উপর মেরে নিয়ে কাজের উপযোগী করা হয়।

'হাফটোন' ব্লক তৈরীর প্রণালীটা অনেকটা এই রকমই বটে; তবে,

গোড়ার ব্যাপারটায় কিছু তফাৎ আছে। 'হাফটোন' ব্লকের 'নেগেটিভ' করার সময় ক্যামেরার মধ্যে, যেখানে প্লেট ভরা হবে ঠিক তার সাম্নে, আড়াআড়ি ভাবে রুল-টানা একখানি কাঁচ লাগান হয় ;—তাকে বলে Screen। এই রুল বা লাইন অতি সূক্ষ্ম —ইঞ্চিতে ৪০ থেকে ২০০ পর্য্যন্ত লাইন সচরাচর ব্যবহার করা হয়। পাশের ছবি দেখ্‌লে বুঝ্‌বে কি রকমের রুল থাকে। এটি হচ্ছে—ইঞ্চিতে ৫০ লাইনের নমুনা।



হাফটোনের জালিদার Screen

রুল-করা কাঁচের মধ্যে দিয়ে ছবি তোলায় যে 'নেগেটিভ' হয় তা'র আগাগোড়াই লাইন আর ছোট ফুট্‌কি। এই নেগেটিভ থেকে তামা বা দস্তার ফল্‌কে তুলে, খোদাই ক'রে 'হাফটোন' ব্লক তৈরী হয়। একই ছবির নেগেটিভের এবং ব্লকের ছাপার চেহারা কেমন হয় তা' দেখালাম, মোটা লাইনের এবং সূক্ষ্ম লাইনের ব্লক কেমন হয় তাও দেখালাম। সূক্ষ্ম লাইনের ব্লকের ফুট্‌কিগুলি হঠাৎ দেখ্‌লে চোখেই পড়ে না। মোটা লাইনের ব্লকের ফুট্‌কিগুলি স্পষ্ট বোঝা যায়।

খবরের কাগজ—সস্তা কাগজে, পাতলা কালীতে ছাপা হয় ব'লে তার জন্য মোটা লাইনের ব্লক করতে হয় ;—না হ'লে ছাপার সময় সব জুব্‌ড়িয়ে গিয়ে ছবির কিছুই চেনা যাবে না। সূক্ষ্ম লাইনের ব্লকের জন্য ভাল মসৃণ কাগজ, ভাল কালী আর ভাল ছাপাই-কলের দরকার হয়।

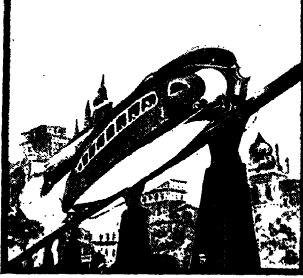
ছবির বই

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

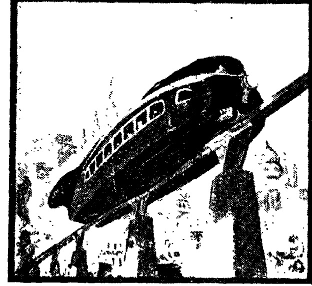
ভাল হাফটোন ছাপার জন্য যে চক্‌চকে সাদা কাগজ ব্যবহার করা হয় তাকে আমরা 'আর্ট পেপার (Art 'paper) বলি। সাধারণ কাগজের উপরে চিনামাটি, সিরিষ প্রভৃতি মিশিয়ে তৈরী করা একরকম মণ্ডের মত জিনিষ মাখিয়ে, শুকিয়ে নিয়ে, রোলারের সাহায্যে চাপ দিয়ে এবং ঘ'ষে পালিশ ক'রে এই কাগজ তৈরী হয়। এই কাগজের উপর হাফটোন ছবি খুব ভাল ছাপা হয়। সাধারণ মাসিক পত্রিকা আর বই যে কাগজে ছাপা হয় সে কাগজও চক্‌চকে—তবে, অত বেশী নয়। সেগুলোও রোলারে ঘষে চক্‌চকে করা হয়; তবে, তার উপর সেই মণ্ড লাগান থাকে না। এ কাগজকে ইংরাজীতে চলিত ভাষায় "আইভরি ফিনিশ" (অর্থাৎ হাতীর দাঁতের মত মসৃণ) বলা হয়। এই বইএর রঙ্গিন ছবিগুলি এবং অন্য কয়েকটি ছবি "আর্ট পেপার"এ ছাপা হয়েছে; বাকিটুকু "আইভরি ফিনিশ" এ ছাপা হয়েছে।

এই বইএ যে রঙ্গিন ছবিগুলি দেওয়া হয়েছে, তার জন্য আলাধা ব্লক তৈরী করতে হয়েছে। তোমরা বোধহয় জান, আমরা যে সব রং দেখি, তার সবই লাল, নীল আর হল্‌দে রং মিশিয়ে তৈরী করা যেতে পারে। হল্‌দে আর নীলে সবুজ হয়, লালে আর নীলে বেগুনি হয়, হল্‌দে আর লালে কমলা-রং হয়, হল্‌দে, লাল, নীল মিশিয়ে কালো, মেটে প্রভৃতি মাঝামাঝি রং হয়—এই ভাবে সব রং লাল, নীল, হল্‌দে এই তিনটি রংএর সাহায্যে হ'তে পারে। রঙ্গিন ছবিতে যতগুলি রং থাকুক না কেন, হল্‌দে, লাল, নীল মিশিয়ে সেগুলি হুবহু নকল করা যায়। একখানা রঙ্গিন ছবি নিয়ে, তার যে যে জায়গায় যতটা হল্‌দে রং আছে, সেই জায়গাগুলির সেই রকম ফটো যদি তুল্‌তে পারি; তারপর লাল এবং নীল রং যে যে জায়গায় যতটা আছে তার দুটি ফটো যদি ঐ ভাবে তুল্‌তে পারি; —তারপর এই তিনটি ফটো থেকে যদি তিনটি ব্লক বানাতে পারি, তা' হলেই রঙ্গিন ছবির ব্লক তৈয়ারী হয়ে গেল। এবার হল্‌দে রংএর জায়গাগুলির যে

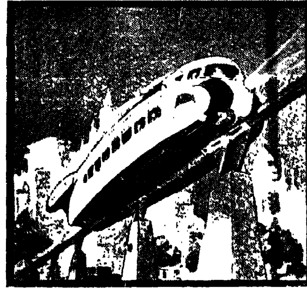
ব্লকটা তৈয়ারী হয়েছে সেটাকে হল্‌দে রংএর কালী দিয়ে ছাপ্‌তে হবে। সেটা শুকিয়ে গেলে, ঠিক ঐ ছাপার সঙ্গে লাইনে লাইন মিলিয়ে লাল রংএর জায়গা-



হল্‌দে ছাপার ব্লক



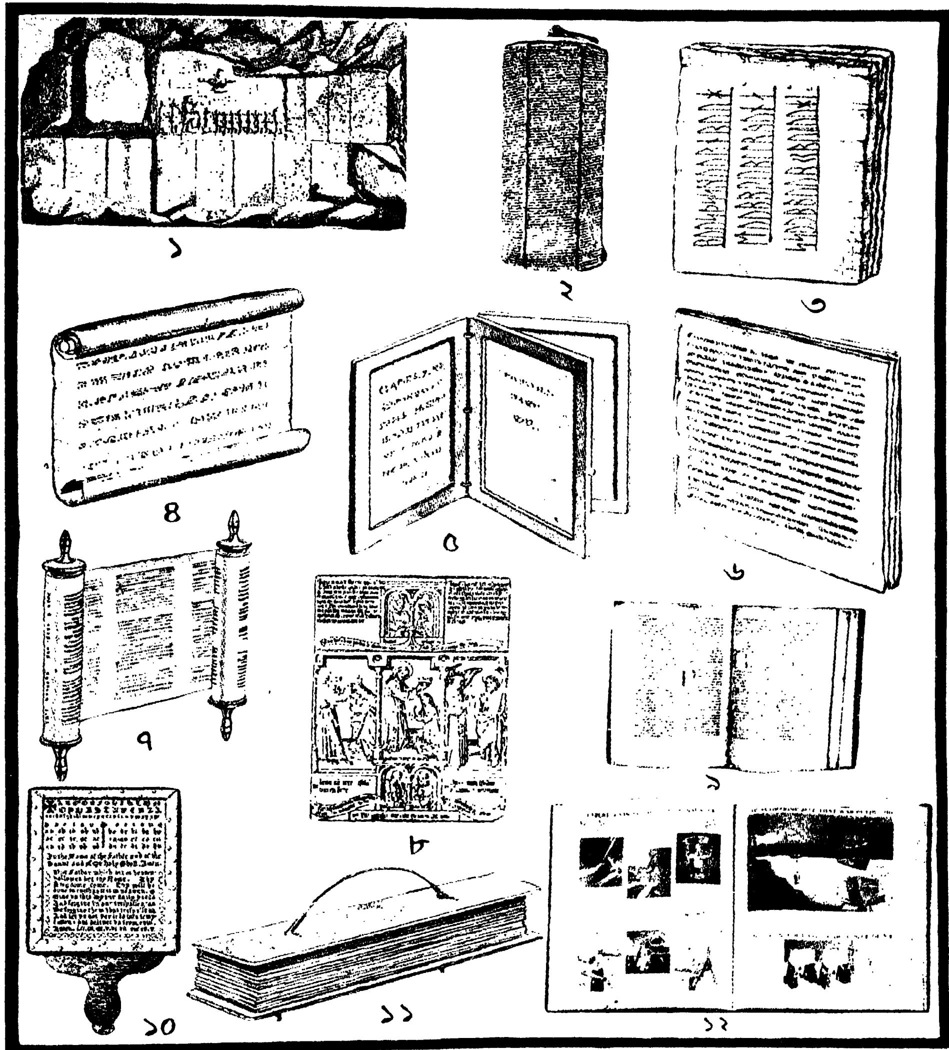
লাল ছাপার ব্লক



নীল ছাপার ব্লক

গুলির ব্লকটাকে লাল কালী দিয়ে ছাপ্‌তে হবে। সেটা শুকিয়ে গেলে, তার উপর লাইনে লাইন মিলিয়ে নীল রংএর জায়গাগুলির ব্লকটা ছাপ্‌লেই মূল ছবির যেখানে যে রং ছিল, ছাপায় সেখানে সেই রং দেখ্‌তে পাওয়া যাবে।

এই বইএর 'ভবিষ্যতের রেল' নামের রঙ্গিন ছবির তিনখানা ব্লকের ছোট



সেকালে আর একালে লেখা, এবং

১। পাহাড়ের গায়ে খোদাই, ২। পাথরের গায়ে খোদাই, ৩। কাদার উপর লেখা, ৪। প্যাপিরাস গাছের ছালের উপর লেখা, ৫। মোমের চাক্তির উপর লেখা, ৬। পার্চমেণ্ট চামড়ার উপর লেখা, পার্চমেণ্ট চামড়ার লম্বা থানের উপর লেখা, ৮। প্রাচীন ছবির বইএর পাতা (হাতে আঁকা ও লেখা), । গুটেনবার্গের প্রথম ছাপা, ১০। শিঙের উপর লেখা, ১১। পাতায় লেখা বই, ১২। একালের ছবির বই।

আকারে নমুনা দিলাম। তিনটি ব্লকই কালো কালীতে ছেপে দেখান হ'য়েছে এর থেকে তোমরা বেশ বুঝ্‌বে, হল্‌দে, লাল, নীল রংএ ছাপার তিনটি ব্লকে কি রকম প্রভেদ থাকে। আকাশ যেখানে, সেখানে লাল আর হল্‌দে রংএর ব্লকে কতটা হাল্কা রং আছে দেখ। যেখানে লাল রং সেখানে নীলের ব্লকে কতটা হাল্কা আছে দেখ। এই তিনটি ছোট ব্লক যথাক্রমে হল্‌দে, লাল আর নীল কালী দিয়ে, একটার উপর একটাকে হুবহু মিলিয়ে ছাপ্‌তে পার্‌লেই বড় রঙ্গিন ছবিটির মত রংএ ছাপা হবে।

আমাদের দেশে সচরাচর যে উপায়ে ছবির ব্লক তৈরী হয় এবং ছবি ছাপা হয়, তা'র কথাই বল্‌লাম। এ ছাড়া অন্য উপায়েও ছবি তৈরী এবং ছাপা হয়; কিন্তু, তা'র চল এ দেশে এখনও হয় নি। বিলাত থেকে যে সব রঙ্গিন ছবির বই আসে তা'র অনেকগুলিই 'লিথো' নামে অন্য এক প্রণালীতে ছাপা হয়। এর জন্য খোদাই করার দরকার হয় না। এ ছাড়া, "ফটোগ্রেভিওর" নামে অন্য একটি প্রণালী আছে তা'র সাহায্যে ঠিক ফটোর মত সুন্দর ছবি ছাপা হয়। সাধারণ 'লাইন' ও 'হাফটোন' ছাপার ব্লক বা প্লেট খোদাই করা থাকে, এবং খোদাইএর উঁচু জায়গাগুলির ছাপা ওঠে, গভীর যায়গা সাদা ওঠে। লিথো ছাপার প্লেটে উঁচু-নীচু কিছুই থাকে না—সবটা সমান। প্লেটখানাকে জল দিয়ে ভিজিয়ে দিলে, কোন কোন জায়গা শুক্‌না থেকে যায়, বাকি জায়গায় জল লেগে যায়। তারপর, তেলা কালী তার উপর দিলে, যে যে জায়গা ভিজা সেখানে কালী লাগে না (কারণ, 'তেলে জলে মিশ খায় না'), যে যে জায়গা শুক্‌না তার উপর কালী লাগে। এবার প্লেটের উপর একখানা কাগজ দিয়ে ছাপা তুল্‌লেই হ'লো। প্রথম যখন এই প্রণালীতে ছাপার আবিষ্কার হয় তখন পাথরের উপর এঁকে প্লেট তৈরী করা হ'তো, তাই 'লিথো' ('লিথো' অর্থাৎ পাথর) নামের জন্ম। আজকাল পাথরের চল প্রায় উঠে গেছে; এখন দস্তার চাদর

ব্যবহার করা হয়। "ফটো-গ্রেভিওর" প্রণালীটা সাধারণ খোদাইএর ছাপার ঠিক উল্টো। 'ফটোগ্রেভিওর"এর প্লেটের যেখানে গভীর বা নীচু থাকে সেই জায়গারই ছাপা ওঠে। প্রথমে পাতলা কালী দিয়ে সমস্ত প্লেটটিকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। তা'র-পর, উপরের কালী চেঁচে নেওয়া হয় আর খোদাইএর জায়গার কালী থেকে যায়। এবার কাগজের উপর ছাপা তুল্‌লেই হ'লো।



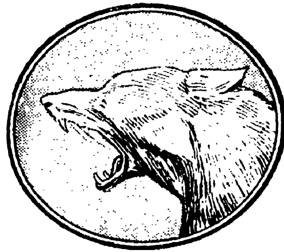
বনমানুষের ছবিতে মনোযোগ

সাধারণ ছাপার জন্য যে রকম অক্ষর বা 'হরফ' তৈরী হয়, 'লিথো' বা ফটো-গ্রেভিওর ছাপার সে রকম 'হরফ' নাই; সাধারণ উঁচু হরফ থেকে ছাপ তুলে সেই ছাপ প্লেটে ফটোগ্রাফির সাহায্যে বা জলছবি-তোলার মত উপায়ে উঠিয়ে 'লিথো' এবং 'ফটোগ্রেভিওর' ছাপার প্লেট তৈরী কর্‌তে হয়।

ছবির বই

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

ছবি মানুষের কত কাজে লাগে একবার ভেবে দেখ। যে লেখাপড়া জানে না, সেও ছবির মর্ম্ম বোঝে। তাই পৃথিবীতে ছবির এত আদর। শুধু কি মানুষেই ছবির মর্ম্ম বোঝে? ওরাং-ওটান, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি বুদ্ধিমান বন-মানুষেরা ছবির মর্ম্ম বেশ বুঝ্তে পারে! আগের পৃষ্ঠার ছবিখানি দেখ্লে আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাক্‌বে না। একটা কাগজে প'ড়েছিলাম, একবার একটা বাঘকে ফাঁদে ফেলে ধরা হয়েছিল। বাঘটা বিখ্যাত মানুষখেঁকো; এক শিকারী বহুকাল তা'র পিছনে ঘুরে, বার বার নিরাশ হয়ে, ফাঁদ পেতে অবশেষে বাঘটিকে ধরেন। খাঁচায় বন্ধ বাঘকে সেই শিকারীর বন্দুক-হাতে বড় তৈল-চিত্র (অয়েল পেণ্টিং) একখানা দেখাতেই নাকি বাঘ ভয়ে দৌড় দিল! ঘটনাটি সত্যি কিনা জানি না; যিনি প্রবন্ধ লিখেছেন, তিনি সেটাকে সত্যি ব'লেই লিখেছেন।



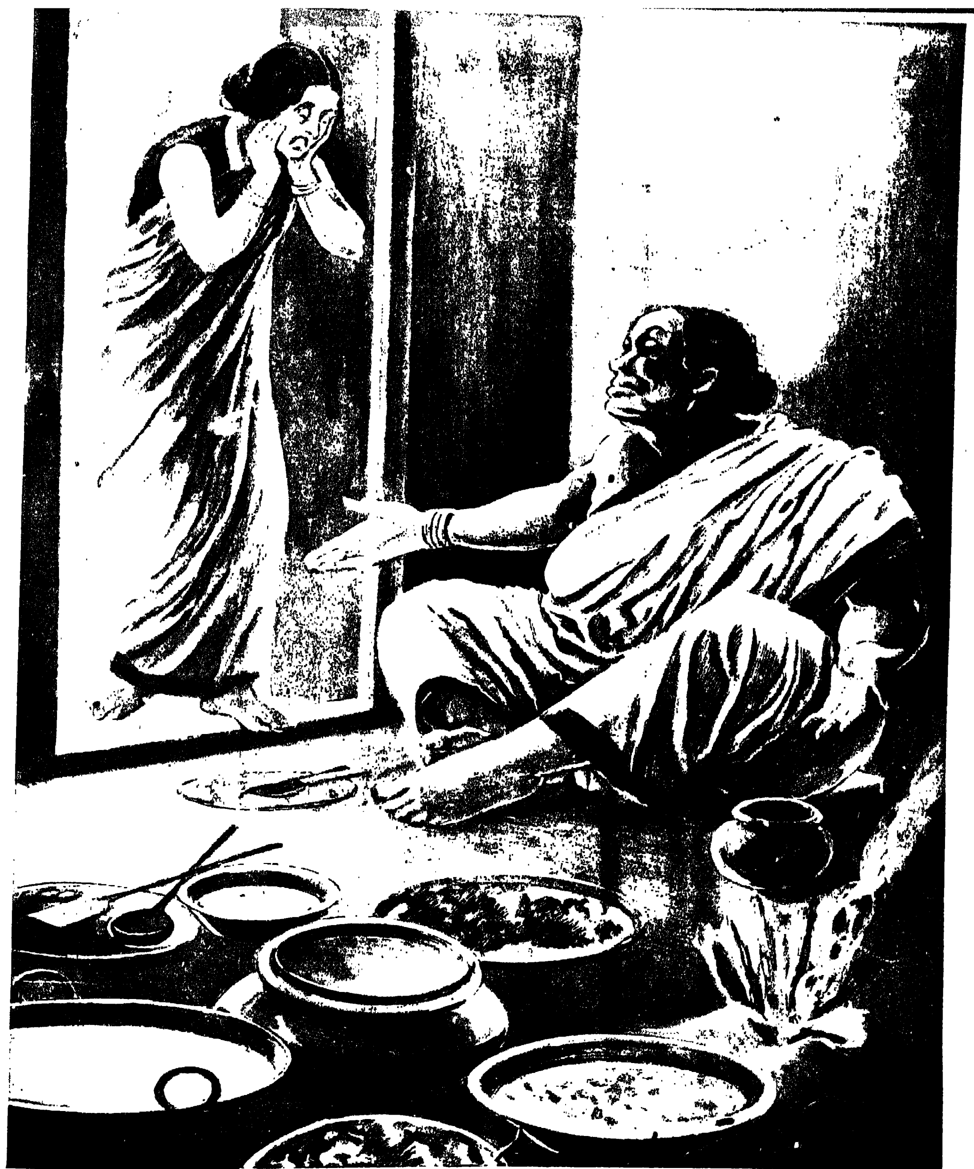


৺শান্তিলতা চৌধুরী

ওগো রাঁধুনী শোন গো শোন, রান্না ব'লে দি শো:—
(শোর) অতিথি এসেছে দশ বা'রো জন,
কেহবা আপন মেশো খুড়ো হন,
জানত তোমার কত ভোলা মন—ঘুলিয়ে যেওনা যেন।
ওগো রাঁধুনী মন দিয়ে আগে রান্না ক'খানি শোন।

মাছঝালে বাটা সরিষা ঢালিবে,
চাল দিয়ে মুড়ীঘণ্ট রাঁধিবে'
ঢেড়স্ ক'খানি ভাতেতে ছাড়িবে, দুগ্ধ করিবে ঘন—
বেগুন পোড়ায়ে তৈল মাখাবে, ডাল হবে তাও জেনো।

"বেলা যে বাড়িছে"—গিন্নি শুধায়,
"মোদের অতিথি জ্বলিছে ক্ষুধায়,
ভাত বেড়ে দাও, লইবে বিদায়—বিলম্ব কিসের হেন ?"
রাঁধুনী কহিছে "সবি ত তৈরী, খবর নেওনি কেন ?—



"বার বার করে চাটিয়া দেখেছি— মন্দ হয়নি জেনো।

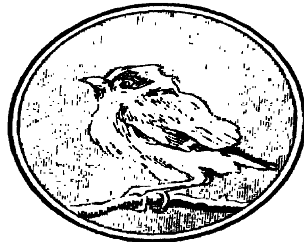
পাকা রাঁধুনী

৺শান্তিলতা চৌধুরী

বেগুনে চালেতে ঘণ্ট রেঁধেছি,
মাছঝালে কাঁচা তৈল ঢেলেছি,
আস্ত মুড়োটি ভাতেতে ছেড়েছি, ডালটি করেছি ঘন,
সরিষা বাটিয়া দুগ্ধে ফেলেছি, ঢেঁড়স্ পুড়েছে জেনো।”

গিন্নী কহিল, “কি করি হায় রে,
অতিথি এখন কি দিয়ে খায় রে ;
তোরে ল’য়ে দেখি বিষম দায় রে—যমেও ধরে না তোকে ?
এমন আনাড়ি মুখ্যু রাঁধুনী জন্মে দেখিনি চোখে !”

দাঁত বা’র ক’রে ব্রাহ্মণী হেসে
গালের ভিতর পান দিয়ে ঠেসে,
ঢোক্ গিলি তার কহে তবে শেষে, “মিথ্যে ঘ্যানোর ঘ্যানো,
বার বার ক’রে চাটিয়া দেখেছি—মন্দ হয়নি জেনো।”



কলির-কান্ড



শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

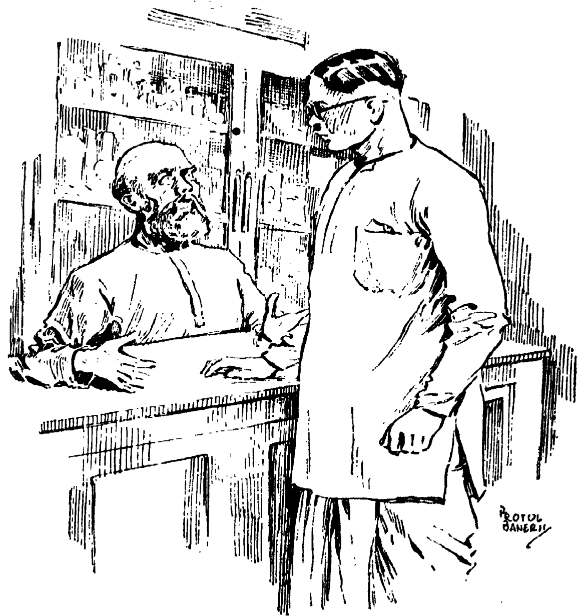
কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে সব ব্যাপার! রাস্তা দিয়ে চলেছি, হঠাৎ দেখি সাম্‌নে কিসের ভিড়। একটু এগিয়ে দেখি কতগুলি লোক একটি লোকের পিছন পিছন চলেছে আর বল্‌ছে, "ছিঃ! কি লজ্জার কথা!" সাম্‌নের লোকটিকে দেখ্‌লে ধোপা ব'লে মনে হয়;—পিঠে ধোপার পুঁটুলির মতন ছোট্ট একটি বোঝা।

আমার বড় কৌতূহল হ'লো। ধোপা এমন কি কাজ করতে পারে যা'তে এতগুলি লোক তার পিছন পিছন যাবে আর বল্‌বে, "ছিঃ! কি লজ্জার কথা?" একটু তাড়াতাড়ি চ'লে, সেই ভিড়ের একটি লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, "ধোপা এমন কি লজ্জার কাজ ক'রেছে যে আপনারা সকলে মিলে তা'র পিছনে লেগেছেন আর তা'কে ঠাট্টা করছেন?" লোকটি বল্‌ল, "ওর কোন লজ্জা থাক্‌লে তো! আজ ৪॥ টার সময় কয়েকটা কাপড় ধুয়ে দেবার কথা ছিল; ৫॥ টা বেজে গেছে, এখনও কাপড় দিতে পারে নি;—ছিঃ! এমন কাণ্ড শুনেছেন কি কখনও?" আমি অবাক্ হয়ে বল্‌লাম, "এতে আর কি হয়? ধোপারা তো রাতদিনই ও রকম ক'রে থাকে।" লোকটি অবাক্ হয়ে, বড় বড় চোখ ক'রে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌ল, "ও সব কথা এ যুগে আর শোভা পায়

না।” আমি আর কিছু বল্‌তে সাহস পেলাম না, কারণ তা'রা দলে ভারী ছিল।

হঠাৎ আমার মনে পড়্‌ল, একটা তালা কিন্‌তে হবে; বাক্সের তালাটা নষ্ট হয়ে গেছে। সাম্‌নের একটা মনোহারী দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, “ছোট তালা আছে কি?” দোকানদার অবাক্ হ'য়ে বল্‌ল, “তালা!—সে আবার কি? ও রকম কোন জিনিষ আমাদের দোকানে নাই।”

যে দোকানে যাই, তালা কোথাও পাই না। শেষটায় এক বুড়ো দোকানদারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, “মশাই! এখানে তালা কোথাও পাওয়া যায় না কি?” দোকানদার কিছুক্ষণ ভেবে বল্‌ল “তাইতো! ‘তালা’ ব'লে কোন জিনিষ তো কখনও দেখিনি :—ওরকম কথাও তো শুনিনি। দাঁড়ান! অভিধানটা এক-বার দেখে নিই। ‘তালা’ কথাটার মানে জানা গেলেই বল্‌তে পার্‌ব সে



জিনিষ পাওয়া যাবে কিনা”—ব'লেই সে “অচলিকা” নামে একটা অভিধান খু

দেখ্‌তে আরম্ভ করল। একটু বাদেই বল্‌ল, "এ যে দেখ্‌ছি কলিযুগের ব্যাপার। 'তালা' মানে—'বাক্স, পেঁটারা প্রভৃতি বন্ধ করিবার কল; সাধারণতঃ 'চাবি' নামক ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে খোলা এবং বন্ধ করা হইত; কলিযুগে এই কল ব্যবহৃত হইত।' এ জিনিষ দিয়ে আপনি কর্‌বেন কি? 'তালা' যাদুঘরে দেখেছি বটে। আর কাউকে যেন 'তালা'র মানে বল্‌বেন না; আপনাকে রীতিমত অপদস্থ হ'তে হবে তা' হ'লে।" আমি বল্‌লাম, "সে কি! তালা না হ'লে বাক্স বন্ধ রাখ্‌ব কেমন ক'রে? কেউ যদি জিনিষপত্র চুরি করে?" দোকানদার চম্‌কে উঠে, জিভ্‌ কেটে বল্‌ল, "ছি ছি! অমন খারাপ কথা বল্‌তে নেই! 'চুরি'! একি কলিকাল পেয়েছেন?" ইতি মধ্যে দোকানের সামনে কয়েকটি লোক জড় হ'য়ে গেল আর সকলে এক সঙ্গে জিভ কেটে বল্‌ল, "চুরি'! ছিঃ!" তাদের রকম-সকম দেখে আমি মানে মানে স'রে পড়্‌লাম।

পকেটে হাত দিয়ে দেখি মাণিব্যাগটা নাই। জামার পাশের পকেটটা একটু ছেঁড়া ছিল। ধোপার ব্যাপারটা দেখার আগে পর্য্যন্ত ব্যাগ আমার হাতেই ছিল; কখন যে অন্যমনস্ক হ'য়ে পকেটে রেখেছি মনেই নাই। কোথাও ব্যাগটা খুঁজে পেলাম না। সর্ব্বনাশ! ব্যাগে যে ৫০০৲ টাকার নোট ছিল!

কি করি?—হঠাৎ একটি অমায়িক ভদ্রলোককে দেখ্‌তে পেলাম। তাঁ'র চেহারা বেশ পণ্ডিত-গোছের। তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "দেখুন মশাই! কাছে কোথায় থানা আছে বল্‌তে পারেন কি?" ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে, মুচ্‌কি হেসে বল্‌লেন, "থানা? থানা তো বোম্বাই-এ।" আমি বল্‌লাম, "সে থানা নয়! পুলিশের থানা"—আমার কথা শেষ না হ'তেই ভদ্রলোক বল্‌লেন, "পুলিশ তো কলিকালের লোকের নিত্য-সঙ্গী ছিল ব'লে শুনেছি। যাদুঘরে গেলে এখনও পুলিশের মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবেন। তাদের নাকি তখন পথে-ঘাটে দেখা যেত। যেমন ছিল কলিকালের লোক, তেমন ব্যবস্থা তো চাই তা'দের



—[illegible] পৃষ্ঠা

দেখ্‌তে আরম্ভ করল। একটু বাদেই বল্‌ল, "এ যে দেখ্‌ছি কলিযুগের ব্যাপার। 'তালা' মানে—'বাক্স, পেঁটারা প্রভৃতি বন্ধ করিবার কল; সাধারণতঃ 'চাবি' নামক ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে খোলা এবং বন্ধ করা হইত; কলিযুগে এই কল ব্যবহৃত হইত।' এ জিনিষ দিয়ে আপনি করবেন কি? 'তালা' যাদুঘরে দেখেছি বটে। আর কাউকে যেন 'তালা'র মানে বল্‌বেন না; আপনাকে রীতিমত অপদস্থ হ'তে হবে তা' হ'লে।" আমি বল্‌লাম, "সে কি! তালা না হ'লে বাক্স বন্ধ রাখ্‌ব কেমন ক'রে? কেউ যদি জিনিষপত্র চুরি করে?" দোকানদার চম্‌কে উঠে, জিভ্‌ কেটে বল্‌ল, "ছি ছি! অমন খারাপ কথা বল্‌তে নেই! 'চুরি'! একি কলিকাল পেয়েছেন?" ইতি মধ্যে দোকানের সামনে কয়েকটি লোক জড় হ'য়ে গেল আর সকলে এক সঙ্গে জিভ কেটে বল্‌ল, "চুরি'! ছিঃ!" তাদের রকম-সকম দেখে আমি মানে মানে স'রে পড়্‌লাম।

পকেটে হাত দিয়ে দেখি মাণিব্যাগটা নাই। জামার পাশের পকেটটা একটু ছেঁড়া ছিল। ধোপার ব্যাপারটা দেখার আগে পর্য্যন্ত ব্যাগ আমার হাতেই ছিল; কখন যে অন্যমনস্ক হ'য়ে পকেটে রেখেছি মনেই নাই। কোথাও ব্যাগটা খুঁজে পেলাম না। সর্ব্বনাশ! ব্যাগে যে ৫০০৲ টাকার নোট ছিল!

কি করি?—হঠাৎ একটি অমায়িক ভদ্রলোককে দেখ্‌তে পেলাম। তাঁ'র চেহারা বেশ পণ্ডিত-গোছের। তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "দেখুন মশাই! কাছে কোথায় থানা আছে বল্‌তে পারেন কি?" ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে, মুচ্‌কি হেসে বল্‌লেন, "থানা? থানা তো বোম্বাই-এ।" আমি বল্‌লাম, "সে থানা নয়! পুলিশের থানা"—আমার কথা শেষ না হ'তেই ভদ্রলোক বল্‌লেন, "পুলিশ তো কলিকালের লোকের নিত্য-সঙ্গী ছিল ব'লে শুনেছি। যাদুঘরে গেলে এখনও পুলিশের মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবেন। তাদের নাকি তখন পথে-ঘাটে দেখা যেত। যেমন ছিল কলিকালের লোক, তেমন ব্যবস্থা তো চাই তা'দের


BANERJI

জন্য ? যাক্ সে কথা—থানার কথা আমি 'অচলিকা'য় আর ইতিহাসে প'ড়েছি। প'ড়ে হাসিও পায়, ঘেন্নাও ধরে।" . আমি বিরক্ত হয়ে বল্লাম, "রাখুন মশাই আপনার বাজে কথা। আমার মণিব্যাগটা হারিয়েছে ;—তা'তে ৫০০৲ টাকার নোটও ছিল—খুঁজে পাচ্ছি না। কি করা যায় চট্ ক'রে বল্‌তে পারেন তো বলুন ; নইলে এখনই আমাকে বিদায় দিন্।" ভদ্রলোক বল্‌লেন, "ও, এই কথা! এতক্ষণ তবে 'পুলিশ', 'থানা', এ সব অবান্তর কথা বল্‌ছিলেন কেন ? রাস্তার বাঁ ধারে কিছুদূর অন্তর একটা ক'রে লাল বাক্স আছে দেখ্‌বেন ; তার গায় লেখা আছে 'হারান জিনিষ'। তা'রই মধ্যে আপনার ব্যাগ পাবেন ; নইলে যেখানে প'ড়েছিল সেখানেই রয়েছে দেখ্‌বেন।"

খানিকটা এগিয়ে গিয়েই রাস্তার ধারে 'হারান জিনিষ' লেখা একটা লাল বাক্স দেখ্‌তে পেলাম। তা'র ঢাক্‌না খুলেই দেখি আমার মণিব্যাগ ;—তা'র মধ্যে ৫০০৲ টাকার নোট ঠিকই আছে। ব্যাপারটা আমাকে এত অবাক্ কর্‌ল যে, মুখে আর কথাই সর্‌ল না ; ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিতেই ভুলে গেলাম। তিনি কিন্তু নিজেই এগিয়ে এসে বল্‌লেন, "যাক্, আপনার জিনিষ ফিরে পেয়েছেন তো ? না পেলে কি লজ্জার কথাটাই হ'তো !—সহরবাসীদের একটা কলঙ্কের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াত এটা।" কথাগুলো আমার কাছে নিতান্তই হেঁয়ালির মত ঠেক্‌ল। কোথায় আমি তাঁকে ধন্যবাদ দেবো, না, তিনি উল্টে আমাকে ধন্যবাদ দিলেন ;—ব্যাপার বুঝ্‌বার জো নাই।

তাড়াতাড়ি বাড়ী-পানে রওয়ানা হ'লাম ; যেতে যেতে দেখি, ছোট আদালতের প্রকাণ্ড বাড়ীটার গায়ে বড় অক্ষরে লেখা, "অদ্য 'কাব্য বিচার' ; বিচারপতি—মাননীয় চিন্তাবিকাশ তর্কপঞ্চানন।" কৌতূহল হওয়ায় চট্ ক'রে ভিতরে ঢুকে পড়্‌লাম। সাম্‌নে জজের চেয়ারে বিচারপতি ব'সে আছেন ; একজন ভদ্রলোক উকিলের মত পোষাক প'রে একটা কবিতার বই পড়্‌ছেন,

কলির কাণ্ড

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

আর অন্য একজন ভদ্রলোক (তিনিও উকিলের পোষাক পরেছেন) মাঝে মাঝে টিপ্পনি কাট্‌ছেন ; প্রথম ভদ্রলোক তা'র জবাবও দিচ্ছেন। বিচারপতি শুন্‌ছেন, 'অচলিকা' অভিধান মাঝে মাঝে দেখ্‌ছেন, আর কি সব 'নোট' লিখ্‌ছেন। খানিক বাদে তিনি বল্‌লেন,—" 'উকিল-মক্কেল-সংবাদ' কাব্য—কলিকালের কানুন, কাণ্ড ও কীর্ত্তির কথা—বড়ই কৌতুককর আর রহস্যময় ;—এই কাব্য প্রথম শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে।"

পাশের একটি লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, "আদালতের কাজকর্ম্ম ফেলে এখন কাব্য-আলোচনা চলেছে কেন ?" লোকটি অবাক্ হ'য়ে বল্‌ল, "আপনি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছেন নাকি মশাই ! কাব্যে আদালতের কথা এই মাত্র শুনে বুঝি মনে কর্‌ছেন্, 'উকিল' 'মক্কেল' 'আদালত' এ সবের যুগ আবার ফিরে এসেছে ? এই মাত্র শুন্‌লাম, কলিযুগের 'জজ্' 'উকিল' 'মক্কেল' এঁরা সব 'মোকদ্দমা' নিয়ে থাক্‌তেন ;—এ কালেও সে সব কেলেঙ্কারী কাণ্ড বাধাতে চান্ নাকি ? বরাবরই তো এখানে কাব্য-আলোচনা হয় ; কলির 'উকিল'দের বংশধরেরাই তো এ সবের পাণ্ডা। বিচারপতিরা নাকি কলির 'জজ'দের বংশধর। আপনি কি কুম্ভকর্ণের ঘুম থেকে উঠে আস্‌ছেন নাকি ?" আমি বল্‌লাম, "আজ্ঞে না ! কিন্তু, আপনার কথার রহস্য এখনও ভেদ করতে পার্‌লাম না। 'মোকদ্দমা' তবে আজকাল একেবারেই উঠে গেছে বল্‌তে চান্ ?" লোকটি আরও অবাক্ হ'য়ে বল্‌ল, আপনি নিশ্চয়ই পাগল ! ঐ ব্যঙ্গ-কাব্যের 'মোকদ্দমা' কথাটি বুঝি বড় ভাল লেগেছে আপনার ? কলির লোকে নানা অপরাধ কর্‌ত ; তা'র কয়েকটির নাম তো শুনেছেন—'জাল', 'জুয়াচুরি', 'চুরি', 'ডাকাতী', 'গাঁটকাটা' ইত্যাদি। তা'রই জন্য তো 'মোকদ্দমা' নামে জিনিষটির সৃষ্টি হয়েছিল ;—'ফরিয়াদী', 'বাদী' 'আসামী' আরো কত জিনিষের সৃষ্টি হয়েছিল। এ যুগে তা'র দরকারটাই কি, বলুন না একবার।" আমি বল্‌লাম, "বড় যে কলিযুগ

নিয়ে ঠাট্টা কর্‌ছেন আপনি কি তা' হ'লে কলির”—এ কথা বল্‌তে বল্‌তেই



লোকটি “কি! সত্যযুগকে ঠাট্টা!” ব'লে তড়াক্ ক'রে এমন একটা লাফ দিল যে আমি চম্‌কে উঠে, এক্কেবারে চিৎপটাং।

—তা'র পরে দেখি, ঘুমাতে ঘুমাতে খাট থেকে প'ড়েও চিৎপটাং।







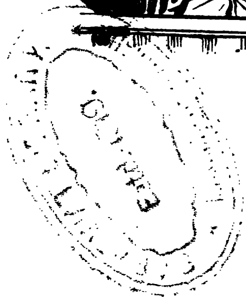








দলটি ছেড়ে একলা ব'সে দেখ্‌তে গিয়ে খেলা,
চেঁচিয়েছ "গোল" ব'লে কি বুঝেছ তা'র ঠেলা।





—নাটিকা—

শ্রীমতী পুষ্পলতা রায়চৌধুরী

—পরিচয়—

স্বাস্থ্যপুরের রাজা	সুখময়
ঐ রাণী	আনন্দময়ী
একটি ছোট ছেলে	সুশীল

বিচারক, প্রহরীদ্বয়, সভাসদ, পাত্রমিত্র, সাক্ষিগণ

[ঘড়িবাবু, বাল্‌তিরাম, জানালা মশাই, দাঁতনকাঠি, কিরণ-কণা, আটারাম, ছানা-রাণী, গাজর সিং ও মুলা সিং, মুগ, মুশুরী ও মটররাম, পালংকুমারী, মিষ্টার টমাটো, কড়াই, মটরশুঁটি, পেঁয়াজ মশাইরা, দুধ-কুমারী, কমলারাণী, কিস্‌মিস, বাদাম, ব্যায়ামকারীরা।]

আজব বিচার

শ্রীমতী পুষ্পলতা রায়চৌধুরী

স্বাস্থ্যপুরের রাজপুরীতে দুটি সিংহাসনে রাজা ও রাণীর আসন। রাজা ও রাণীর আসার সময় হয়েছে; পাত্রমিত্র, সভাসদরা অপেক্ষা ক'রে আছেন; এমন সময় বাজনা বেজে উঠ্‌ল; দূরে দেখা গেল রাজা-রাণী আস্‌ছেন। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা কর্‌ল; রাজা-রাণী সিংহাসনে বস্‌লেন; অন্য সকলেও যে-যা'র স্থানে ব'সে পড়্‌ল।

রাণী—আজ কি সুন্দর দিন! সকলের মুখেই আজ আনন্দের হাসি।

রাজা—সত্যিই তো! আশা করি এমন সুন্দর দিনে কা'রও কোন দুঃখের কথা বা নালিশ নাই।

বিচারক—আজ্ঞে হাঁ মহারাজ! প্রহরী কাল রাত্রে একজন আসামীকে ধরে এনেছে। ছোট ছেলে হ'য়ে সে কিনা রাত ১০টায় রাজপথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে নাকি স্বাস্থ্যপুরের আরও অনেক নিয়ম ভেঙ্গেছে। ছেলেটির নাম সুশীল।

রাজা—তাই নাকি! তবে তো তা'র বিচার কর্‌তে হয়।

বিচারক—প্রহরি! আসামীকে হাজির কর।

[দুইজন প্রহরী সুশীলকে ধ'রে এনে বিচারকের সম্মুখে দাঁড় করা'ল]

প্রথম প্রহরী (নীচু গলায়)—আমারও কিন্তু রাত্রে ১০টার পর রাস্তায় বেড়াতে ইচ্ছা করে। এই ছেলেটি এমনই কি দোষ ক'রেছে?

দ্বিতীয় প্রহরী (নীচু গলায়)—বল কি! স্বাস্থ্যপুরের প্রধান নিয়ম 'রাত্রে ঘুম' ছোট ছেলে ভেঙ্গেছে, তবু বল্‌ছ 'এমনই কি দোষ ক'রেছে'? ছিঃ!

রাজা—কি হে সুশীল! তোমার কিছু বল্‌বার আছে?

সুশীল—দোহাই মহারাজ! এত নিয়ম পালন করি; তবু সামান্য অপরাধে আমায় এরা ধরে এনেছে। মহারাজের কাছে সুবিচার চাই!

আজব বিচার

শ্রীমতী পুষ্পলতা রায়চৌধুরী

রাণী—মহারাজ! এ নিতান্তই ছোট ছেলে;—বেচারাকে কি খালাস দেওয়া যায় না? এর পক্ষেও হয়তো ভাল সাক্ষী থাক্‌তে পারে।

রাজা (বিচারকের প্রতি)—মোকদ্দমা আরম্ভ হোক্! সাক্ষী-সাবুদ ডেকে আনুন।



ঘড়িবাবু (১নং সাক্ষী)—মহারাজ! রাত্রে সাড়ে নয়টার সময় আমি যখন শোবার ঘণ্টা বাজাই, তখন অন্য সব ছেলে-মেয়ে শুতে যায়—কেবল এই ছেলেটি যায় না।

"ছোট ছেলে রাত জাগে, ক'রে যদি সাধ,
স্বাস্থ্যপুর মানে তাহা গুরু অপরাধ।"

বিচারক—এবার বাল্‌তিরামকে ডাক।



বাল্‌তিরাম (২নং সাক্ষী)—মহারাজ! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাক্‌বার জন্যে আমি জীবন ভ'রে জল সরবরাহ করি। এই ছেলেটি কিন্তু জল পেয়েও খাবার আগে নোংরা হাত ধোয় না; রোজ স্নানও করে না। স্নান যদি করেও, গা না ঘ'ষে শুধু জল ঢেলে চ'লে আস্‌তে চায়।

"শরীরের মলা যায় জলের কৃপায়,
তা'র সাথে আড়ি ক'রে রেহাই না পায়।"

বিচারক—মহারাজ! এবার জানালা মশাইকে ডাকা যাক্।

জানালা মশাই (৩নং সাক্ষী)—এ ছেলেটি প্রায়ই ঘরের জানালা বন্ধ ক'রে ঘুমায়। কি শীত, কি গ্রীষ্মে এর জানালা বন্ধই থাকে।

"বায়ু চলাচল করে খোলা জানালায়,
তা'রে যদি রুদ্ধ কর, গুরু দোষ তায়।"

আজব বিচার

শ্রীমতী পুষ্পলতা রায়চৌধুরী

বিচারক—দাঁতনকাঠিকে ডাক এবার।

দাঁতনকাঠি (৪নং সাক্ষী)—এই ছেলেটি দাঁত-মাজা ফাঁকি দিতে পারলে যেন বেঁচে যায়। যদি মাজেও,—কোন রকমে দায়-সারা-ভাবে।

"দাঁত যদি ভাল ক'রে নাহি কর সাফ,
ব্যথা, নড়া, পড়া হ'তে পাবে না গো মাপ।"

বিচারক—মহারাজ! এই চারজন সাক্ষীই সুশীলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। আসামীর অপরাধ গুরুতর!

রাজা—ঠিক! আসামীর কিছু বল্‌বার আছে?

সুশীল—দোহাই মহারাজ! মাত্র চারটি নিয়ম ভেঙ্গেছি। এবার দয়া ক'রে ক্ষমা করুন! (কান্না)

রাণী—মহারাজ ওর পক্ষেও হয়তো সাক্ষী আছে। তাদের কথা শুনে, তবে ঠিক হ'তে পারে একে স্বাস্থ্যপুর থেকে নির্ব্বাসন দেওয়া হবে কিনা।

রাজা—সত্যিই তো! এর পক্ষে কোন সাক্ষী আছে কি?

[দূর্ থেকে "আছে মহারাজ" বল্‌তে বল্‌তে 'কিরণ-কণা'—একটী ছোট্ট মেয়ে নেচে নেচে এগিয়ে এল]

কিরণ-কণা (সূর্য্যকিরণ)—মহারাজ! এই ছেলেটি রোজ সকালে-বিকালে আমাদের সঙ্গে খেলা করে।

"কিরণ সাথে নিত্য খেলা খেলে গো যে জন,
স্বাস্থ্য তাহার সঙ্গী হয়ে থাকে অনুক্ষণ।"

আটারাম—মহারাজ! এই ছেলে ভাত ফেলে আটার রুটি খায়। আটা ওর খুবই পছন্দ।

ছানা-রাণী—ছানা খেতেও এ খুব ভালবাসে;—প্রায়ই কাঁচা ছানা খায়।

আজব বিচার

শ্রীমতী পুষ্পলতা রায়চৌধুরী

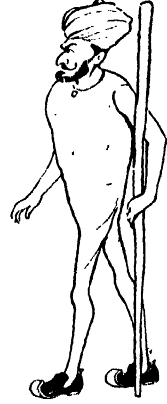
গাজর সিং, মূলা সিং—আপনার এই আসামী আমাদের খাবার জন্য অনেক যত্ন ক'রে বাগানে আমাদের বীজ পুঁতেছে



পালংকুমারী

মুশুর, মুগ, মটররাম—মহারাজ! আমরা রোজই এর খাওয়ার সাহায্য করি।

পালংকুমারী—মহারাজ! এই ছেলেটি শীতকালে নিয়মমত আমাদের খেয়ে থাকে।



মুলা সিং

মিস্টার টমাটো—মহারাজ! আমাদের পরিবারের সঙ্গে এই ছেলেটির খুবই ভাব। রোজই আমরা তার পেটে যাই।



মিষ্টার টমাটো

কড়াই, মটরশুঁটি, পেঁয়াজ মশাইরা—মহারাজ! আমরা সকলেই এর শরীর রক্ষা করার সাহায্য করছি। খুসী হয়েই সে আমাদের খায়।



কমলারাণী

কমলারাণী—আমার রসটাই তো আসল জিনিষ! এমন সার কোথায় আর পাবে? এই ছেলেটি রোজই আমার রস খায়।

কিস্‌মিস্, বাদাম মশাইরা—এই ছেলেটি আমাদেরও খেতে ভালবাসে—টপাটপ্ মুখে পুরে দেয়!

ছোলা সিং—মহারাজ! আমিও সাক্ষ্য দিতে পারি—আমি আর আমার বন্ধু আদারাম রোজ সকালে এই ছেলেটির পেটে যাই।

"খেয়ে ফল, তরকারী, অঙ্কুরিত ছোলা,
স্বাস্থ্যপুর-দ্বার পাবে সমুখেতে খোলা।"

দুধকুমারী—আমি দুধকুমারী! এই ছেলেটির দেহখানা দেখেই মহারাজ বুঝ্‌তে পারছেন এ আমাকে কি রকম ভালবাসে। আমার তিনটি ভাই – দই, ঘোল, মাখন—তাদেরও এ খুব ভালবাসে। দুধের গানটা একবার কর না ভাই!

(সমস্বরে) "দুধের মহিমাগান প্রাণ খুলে গাই,
স্বাস্থ্যপুর খুঁজি তার জোড়া নাহি পাই।
পুষ্টিকর, বলকর, আহা কি মধুর,
প্রশংসায় চারিদিক তাই ভরপূর।
ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুধের কৃপায়,
স্বাস্থ্যহীন ক্ষীণদেহে নব বল পায়।
বাটি বাটি দুধ খেয়ে রোগা রোগা ছেলে,
পালোয়ানে অনায়াসে দেয় ঠেলে ফেলে।"

ব্যায়ামকারীরা (কসরৎ ক'রে)—মহারাজ! এই ছেলেটি রোজ ভোরে আমাদের সঙ্গে কসরৎ করে।

"রীতিমত প্রতিদিন করিলে ব্যায়াম,
রক্ত হ'বে তাজা আর ঘুচিবে ব্যারাম।"

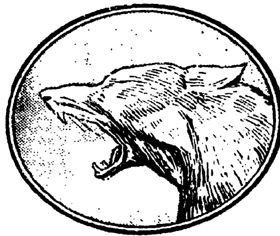
রাজা (সুশীলের প্রতি)—তোমার পক্ষে অনেক ভাল ভাল সাক্ষী আছে দেখ্‌ছি।

আচ্ছা, এবার তোমায় ছেড়ে দিলাম। আশা করি আর কখনও স্বাস্থ্যপুরের নিয়ম ভঙ্গ ক'রে নির্ব্বাসন-দণ্ড পাবে না।

সুশীল।—যো হুকুম মহারাজ। প্রণাম হই।

(নমস্কার করিয়া সুশীলের প্রস্থান)

—যবনিকা পতন—





বেগম শামসুন নাহার বি-এ

আরবের ধূ ধূ মরুভূমি। তাহার উপর দিয়া একদা গভীর নিশীথে এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা গেল। নীরব নিস্তব্ধ রাত্রি। মাথার উপর আকাশে চাঁদ জাগে, তারা জাগে, আর পায়ের তলায় জাগে—মরুভূমিতো নয়, সে যেন অনন্ত অসীম বালির সমুদ্র।

ছুট্—ছুট্—ছুট্। দুইটি তেজস্বী অশ্ব ছুটিয়া চলিয়াছে যেন দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই, আরোহী দুজন প্রাণপণ বেগে একে অপরের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। যে ব্যক্তি পেছনে পড়িয়াছে তাহারই যেন দায় বেশী—ঘোড়া চালাইবার কায়দাও যেন তারই বেশী জানা। জীবন মরণ পণ করিয়া সে ছুটিয়াছে—যেমন করিয়া হোক প্রথম অশ্বারোহীকে ধরিতেই হইবে ; তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব ধন নিয়া বুঝি সে পলায়ন করিল !

*

এক দরিদ্র আরব। নাম তার মালেক। এককালে তারা বড়লোকই

ছিল। কিন্তু ঋণের দায়ে তাহার পিতা ক্রমে ক্রমে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলেন, ফলে মালেক যখন বড় হইল তখন থাকার মধ্যে থাকিল সামান্য কয়েকটা দরকারী জিনিষ—যাহা না হইলে নেহাৎ মানুষের চলেই না। কিন্তু পিতার আমলের একটা জিনিষ সে পাইল—সে জিনিষের মূল্য মালেকের কাছে সাত রাজার ধনের চেয়েও বেশী। তাহার পিতার একটি সুন্দর ঘোড়া ছিল—নাম মুল্‌কী। মুল্‌কীর মত বলবান শিক্ষিত ঘোড়া সে অঞ্চলে আর কাহারও ছিল না। ঘোড়দৌড়ের খেলার সময় সে অবহেলায় সমস্ত ঘোড়াকে পেছনে ফেলিয়া ছুটিতে পারিত। সে যখন ঘাড় বাঁকাইয়া, কেশর দোলাইয়া চলিত লোকে তাহার শুভ্র-চিক্কণ দেহের পানে প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত।

ছেলে বেলা হইতেই মালেক অশ্বচালনায় নিপুণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাই পিতা যখন সমস্ত ধন সম্পত্তি নষ্ট করিয়াও প্রিয় অশ্বটীকে রাখিলেন তাহার জন্য, তখন সে অদৃষ্টকে ধন্যবাদ না দিয়া পারিল না। দেশ-বিখ্যাত অশ্বশ্রেষ্ঠ মুল্‌কীর অধিকারী সে! কি সৌভাগ্য তাহার! মুল্‌কীর পিঠে সওয়ার হইয়া যখন সে চলিত তখন নিজের ভাগ্য বিড়ম্বনার কথা মনে থাকিত না—সে ভুলিয়া যাইত যে সে দরিদ্র, সহায় সম্বলহীন।

মালেকের আরও একটি ঘোড়া ছিল, সে মুল্‌কীর সহোদর দুল্‌কী। মুল্‌কীর সমকক্ষ না হইলেও দুল্‌কীর গুণও নেহাৎ কম ছিল না. সে অঞ্চলে দুল্‌কীর মত ঘোড়াও কমই দেখা যাইত।

*

বড়লোকের ছেলে কায়েস; বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাব। তাহার সখ হইল সে মুল্‌কীকে কিনিয়া লইবে। কপর্দ্দকহীন দরিদ্র মালেক মুল্‌কীর মত ঘোড়ার মালিক এ যেন নেহাৎ খাপছাড়া ঠেকে। কায়েসের মত ধনী-সন্তানের ঘোড়া হইবে মুল্‌কী, তবে তো মানাইবে ভালো!

জয়-পরাজয়

বেগম শামসুন নাহার বি-এ

কায়েস বলিল—"মালেক, আমি মুল্‌কীকে কিন্‌ব, কত মূল্য চাও তুমি বল।" দরিদ্র হইলে কি হয় তেজস্বী আরব একটুও না ভাবিয়া উত্তর করিল—"তোমার সমস্ত সম্পত্তি দিলেও মুল্‌কীর মূল্য হবে না, কায়েস। তুমি ফিরে যাও।" মুল্‌কীকে বিক্রয় করিয়া মালেক হয়ত আবার বড়লোক হইতে পারিত—মুল্‌কী থাকিলে ভিখারী হইয়াও সে যেন রাজাধিরাজ!

কায়েসের ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব চূর্ণ হইল। কিন্তু সে দমিবার পাত্র নয়। মনে মনে ফন্দি আঁটিয়া কিছুদিন পরে আবার সে মালেকের কাছে আসিল। বলিল, "মালেক, তোমার মুল্‌কীর মূল্য দিতে পারি, এমন ক্ষমতা আমার নাই। বুঝেছি তুমি রাশি রাশি অর্থ পেলেও মুল্‌কীকে ছাড়বে না। কিন্তু তুমি তো ভাই, কোমল-হৃদয়, পরদুঃখকাতর, একথা সবাই জানে। তবে শোন আমার দুঃখের কথা। আমার একমাত্র পুত্র মুল্‌কীকে পাবার আশায় মরতে বসেছে, কিছুতেই সে প্রবোধ মানবে না। এই অশ্বশ্রেষ্ঠকে না পেলে বুঝি তাকে বাঁচানো যায় না। এবার আর বিক্রয় নয় মালেক, তুমি দান কর, মুল্‌কীকে তুমি আমায় ভিক্ষা দাও।"

মালেক কিন্তু অচল, অটল। ধূর্ত্ত কায়েসের ছলনায় না ভুলিয়া সে বলিল—তুমি স্বার্থপর, ছলনাপ্রিয়—জাননা মুল্‌কী আমার জীবন। তোমার ছেলে অসুস্থ বলে তুমি আমার মুল্‌কীকে চাও কি বলে! আমি যদি আজ তোমার দুয়ারে প্রার্থী হয়ে যাই—পারবে তুমি তোমার ছেলেকে আমায় দান করতে?"

কায়েস এবারেও হতাশ হইল। কিন্তু তাহার মাথায় খুন চাপিয়াছে। নিঃস্ব ভিখারী মালেকের কি আস্পর্দ্ধা! বারে বারে তাহাকে এমন করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। কায়েস দাঁতে দাঁত চাপিল, তাহার শিরায় রক্ত ফুটিতে লাগিল। ক্রোধে সে প্রতিজ্ঞা করিল যেমন করিয়া হোক্ মুল্‌কীকে তাহার চাই-ই।

জয়-পরাজয়

বেগম শামসুন নাহার বি-এ

* * * * *

নিস্তব্ধ রাত্রি। মালেক নিজ শিবিরে গভীর নিদ্রায় অচেতন। এই তো উপযুক্ত অবসর। কায়েস পা টিপিয়া টিপিয়া চোরের মত মালেকের শিবিরে প্রবেশ করিল। মালেক কিন্তু সাবধানের একশেষ। মুল্‌কীকে হারাইবার আশঙ্কায় ঘুমাইয়াও তাহার শান্তি নাই। মুল্‌কীর লাগামের অপর প্রান্ত তাহার হাতের কব্জির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে। কেহ তাহাকে চুরি করিতে গেলেই হাতের বাঁধনে টান পড়িয়া সে জাগিয়া উঠিবে। আবার পাশে সুসজ্জিত দুল্‌কী। যদি তস্করের পশ্চাদ্ধাবন করিবার দরকার হয় তাহা হইলে সে যেন মুহূর্ত্তের মধ্যেই দুল্‌কীর পিঠে চাপিয়া ছুটিতে পারে।

কায়েস মুহূর্ত্তের মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। কাপড়ের ভিতর হইতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া মালেকের হাতের বাঁধন কাটিয়া ফেলিল—মুল্‌কী মুক্ত হইল। এবারে কায়েসকে আর পায় কে! এত সাধনার পরে মুল্‌কী বুঝি সত্যসত্যই তাহার হাতের মুঠার মধ্যে আসিল। মুল্‌কীর পিঠে চড়িয়া সে তীর বেগে ছুটিল।

ততক্ষণে মালেক জাগিয়া উঠিয়াছে। ব্যাপার বুঝিতে দেরী হইল না। কর্ত্তব্য আগেই ঠিক করা আছে। চক্ষের পলকে দুল্‌কীর পিঠে চড়িয়া সে বিদ্যুতের বেগে শিবির হইতে বাহির হইয়া গেল। তারপরে শুরু হইল—মরুভূমির বালুকাময় প্রান্তরে ঘোড়দৌড়ের সেই অভিনব দৃশ্য, যাহার কথা আমরা আগেই বলিয়াছি।

মুল্‌কী ছুটিয়াছে, দুল্‌কী ছুটিয়াছে। কিন্তু মুল্‌কীকে চালাইবার কায়দা মালেক ছাড়া আর কে জানে? তাহার পিঠে এক অপরিচিত তস্কর—প্রাণপ্রিয় প্রভুর কাছ হইতে তাহাকে হরণ করিয়া নিতেছে, মুল্‌কীর চরণ যেন চলে না। এদিকে দুল্‌কীর চালক স্বয়ং মালেক। দুল্‌কী প্রভুর মনোভাব বুঝিতে

পারিয়াছে। তাহার আজিকার জয়-পরাজয়ের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে—প্রভুর জন্য নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিতেও সে আজ কুণ্ঠিত নয়। দেখিতে দেখিতে দুল্‌কী একেবারে মুল্‌কীর কাছে আসিয়া পড়িল। একটু, আর একটু, আর এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই মালেক পলায়নপর দস্যুর টুঁটি চাপিয়া ধরিতে পারিবে।



কিন্তু জয়-পরাজয়ের সেই সন্ধিক্ষণে মালেকের মনোভাব অন্যপ্রকার। জীবনে কোন ঘোড়া মুল্‌কীকে দৌড় প্রতিযোগিতায় হারাইতে পারে নাই। কিন্তু আজ তাহারই সহোদর দুল্‌কী তাহাকে পরাস্ত করিতে উদ্যত! মালেকের প্রাণে তাহা সহ্য হইল না। মালেকের যদি আজ জয় হয় তবে তাহার প্রাণপ্রিয় অশ্ব আবার তাহারই কাছে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু......কিন্তু...... চকিতে মালেকের মনে যেন বিদ্যুত খেলিয়া গেল। কায়েসের সঙ্গে মালেকের জয়ের অন্য অর্থ যে দুল্‌কীর কাছে মুল্‌কীর পরাজয়!! মুল্‌কীর পরাজয়?

জয়-পরাজয়

বেগম শামসুন নাহার বি-এ

মুল্‌কীর পরাজয়ের পরিবর্ত্তে যে মালেক দুনিয়ায় নিজের জন্য কিছুই কামনা করিতে পারে না। এত স্বার্থপর সে নয়! নিজের হাতে সে কেমন করিয়া মুল্‌কীর—তাহার প্রিয় মুল্‌কীর ললাটে এই কলঙ্ক আঁকিয়া দিবে? না, না, কিছুতেই না। মালেকের চোখের সামনে তাহারই মুল্‌কী পরাস্ত হইতে পারিবে না। মালেক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"ওরে মূর্খ কায়েস্, তুই জানিসনে কেমন করে মুল্‌কীকে চালাতে হয়। ওর ডান কাণ স্পর্শ কর, আর বাঁদিকে পায়ের আঘাত কর, শীঘ্র কর্, শীঘ্র।" বলিতে না বলিতে চক্ষের নিমিষে মুল্‌কীর গতি বাড়িয়া গেল। কায়েস মুল্‌কীকে চালাইবার কৌশল শিখিয়া লইয়াছে। মুল্‌কী সেই চিরপুরাতন সঙ্কেত দেখিয়াই উল্কার গতিতে ছুটিয়া চলিল। দুল্‌কীর আর সাধ্য রহিল না তাহার নিকটস্থ হয়।

আর মালেক? মালেক রশ্মি সংযত করিয়া দুল্‌কীকে থামাইল। মুল্‌কী ততক্ষণে দূর মরুপথে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আর ছুটিয়া কি লাভ? ভগ্ন হৃদয় লইয়া সে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিল। অশ্বচালনায় সে আজ কায়েসের নিকট শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হইয়াছে। তাহার উপর মুল্‌কীকে সে জন্মের মত হারাইয়াছে। কিন্তু সকল দুঃখ ছাপাইয়া তাহার মনে শুধু এক অসীম তৃপ্তি জাগিতে লাগিল। তাহার মুল্‌কী আজ পরাজয়ের কলঙ্ক হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তাহার বড় আদরের, বড় গর্ব্বের, বড় গৌরবের মুল্‌কী আজও অপরাজেয়!!



ট্যাঁপা-টেঁপীর গান

শ্রীযুক্ত জীবন্ময় রায়, বি-এ, বি-টি

সুর—ঘাঁঘা সুর (ষট্-পদী) তাল—খ্যাংরা কাঠি

(১)

ট্যাঁপা—চাল্‌তা গাছে পল্‌তা ফলে নাল্‌তে গাছে ঝিঙে,
টাকু ডুমাডুম বাদ্যি বাজে ফুঁক্‌বি কবে শিঙে।
টেঁপী ফুঁক্‌বি কবে শিঙে ?

টেঁপী—ও—তোর মাথায় যবে শিং গজাবে
পায় গজাবে খুর
আর—ভুঁড়ো-শেয়ালের মতন গলায়
বাজ্‌বে খেঁকী সুর,
ল্যাজ্‌ বেরুবে গরুর মত নাচ্‌বে তাতে ফিঙে
সেদিন সুখে তুল্‌ব পটল ফুঁক্‌ব কসে শিঙে
ট্যাঁপা ফুঁক্‌ব সেদিন শিঙে।



(২)

ট্যাঁপা—ওরে টেঁপী ন্যাংলা ক্ষেপী হ্যাংলা হিচিং ফুট্‌
ব্যাঙের ঠ্যাঙে ল্যাং মেরেছে এই বেলা দে ছুট্‌—
রে টেঁপী এই বেলা দে ছুট্‌।

ট্যাপা-টেঁপীর গান
শ্রীযুক্ত জীবন্ময় রায়, বি-এ, বি-টি

টেঁপী—গব্‌গবিয়ে গোবর খাবি—রইব কাঁধে চেপে,
জুল্‌পি ধরে মার্‌ব ঝাঁকি, উঠ্‌বি যখন ক্ষেপে,
ভাঁটার মত চোখ টেরিয়ে মার্‌বি তেড়ে লাফ,
তখন তোফা ড্যাংডেঙিয়ে পড়্‌ব সরে সাফ্‌
তখন ছুট দেব রে সাফ্‌।



(৩)

ট্যাপা—শ্যাল শকুনে গান ধরেছে—বাছি
বাজায় টিয়ে,
কট্‌কটে ব্যাং বর সেজেছে—আজকে টেঁপীর বিয়ে
ওরে আজকে টেঁপীর বিয়ে।



টেঁপী—আঁস্তাকুড়ের মেনী বেড়াল—বাদ্‌সা কুঁড়ের ঝি,
ছ্যাৎলা কাণের পচ্‌লানি তা'র ছিঁচ্‌কে নাকের ঘি;
ভাঙা কুলো সাজিয়ে নিয়ে এসেছে ঐ কনে,
হাঁড়ির কানার মালা দেবে—ধরেছে তার মনে—
ট্যাপায় ধরেছে তার মনে।

(৪)

ট্যাপা—ব্যাঙার গলায় বান ডেকেছে ছাপিয়ে গেছে কূল,
ওলের গাছে বোল ধরেছে, ফুট্‌ছে ঘেঁটুর ফুল,
ঝিম্‌ ধরেছে সাঁঝের কোলে, চুপ করেছে গেঁকী,
ঝগ্‌ড়া ঝাঁটি ক'রে তবু মর্‌ছে কেন নেকী?
মিছে মর্‌ছে কেন নেকী?

ট্যাঁপা-টেঁপীর গান

শ্রীযুক্ত জীবন্ময় রায়, বি-এ, বি-টি

টেঁপী—বায়না ক'রে খায় না ছোঁচা চায় না পাতের পানে,
পায় না তবু খ্যাঁক্‌খেঁকিয়ে ঘুর্‌ছে কিসের টানে,
আয় না দেখি দিচ্ছি গলায় শিক্‌লি ছড়া তুলে,
ল্যাজ্‌ গুটিয়ে পালিয়ে গেলে ধর্‌ব চেপে চুলে,
ও তোর ধর্‌ব চেপে চুলে।

(৫)

ট্যাঁপা—ধর্‌না দিখি—বর পাবি কি এমন সোনার চাঁদ,
সকাল সাঁজে ঘর নিকবি—উব্‌দো খোঁপা বাঁধ।
রেঁধে বেড়ে যত্ন ক'রে দিবি আমায় খেতে,
পাত কুড়ুনি খেয়ে আমায় ঘুম পাড়াবি রেতে,
ও তুই ঘুম পাড়াবি রেতে

টেঁপী—খ্যাংরা মেরে খেদিয়ে দেব নিত্যি সকাল বেলা,
ভাঙ্‌ব দাঁড়া চেলার কাঠে বুঝ্‌বি তখন ঠেলা।
ভিক্ষে ক'রে আন্‌লে দুটো পান্তা দিব ঢেলে,
মাদুর কাঁথা দেবো পেতে গয়না সাড়ী পেলে,
ওরে গয়না সাড়ী পেলে।



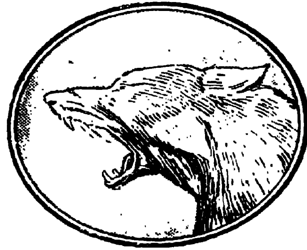
ট্যাঁপা-টেঁপীর গান

শ্রীযুক্ত জীবন্ময় রায়, বি-এ, বি-টি

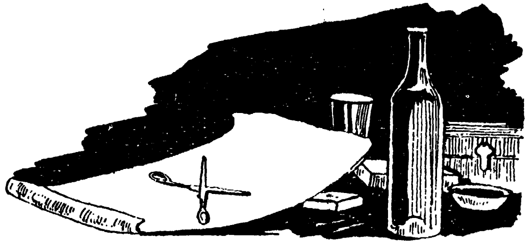
(৬)

ট্যাঁপা ও টেঁপী—(কোমর ধরিয়া নৃত্য ও সমস্বরে গীত)—

ভূতের বাপের কোল পোঁছা আর বন্‌-বেড়ালের ছা,
এমন জুড়ি মিল্‌বে না রে তাইরে নারে না !
জুল্‌পি ধরে কুল্‌পি খাব লাগ্‌ব পিছে ফেউ,
রাত দুপুরে মরে যাব জান্‌বে না তা' কেউ।
তখন আমার কর্‌বি কি রে কর্‌বি তখন কলা,
ডোবার পাড়ে কাঁদ্‌বি তেড়ে ছেড়ে হেঁড়ে গলা।
তাক্ ধিনাধিন্ ড্যাডাং ড্যাড্যাং টাক্‌ডুমাডুম্ ডুম্,
চাঁদ ডুবেছে শ্মশান ঘাটে এইবারে যা ঘুম—
ওরে এইবারে যা ঘুম।



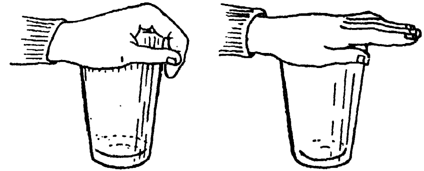
খেলা



শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

সামান্য দু'চারটি সরঞ্জাম দিয়ে কয়েকটি মজার খেলার কথা তোমাদের বল্‌ব। এতে তোমাদের আমোদ হবে, শিক্ষাও হবে। সরঞ্জামগুলি প্রায় সকলের বাড়ীতেই আছে—অথবা, সহজে জোগাড় ক'রে নেওয়া যায়। খেলাগুলিও শক্ত নয়।

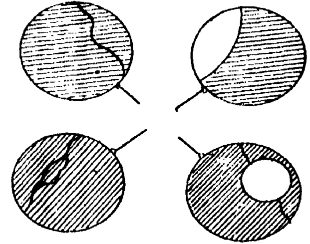
(১) একটা কাঁচের (বা অন্য কিছুর) গ্লাসে জল ভর্ত্তি ক'রে, গ্লাসটিকে হাতের আঙ্গুল দিয়ে না ধ'রে (আঙ্গুলগুলি সোজা রেখে) গ্লাসটিকে মাটি থেকে বা টেবিল থেকে তুলে ফেল্‌তে পার কি? কায়দা জানা থাক্‌লে এ কাজটি সহজেই কর্‌তে পারা যায়। প্রথমে, গ্লাসে জল ভর্ত্তি ক'রে গ্লাসটিকে সাম্নে রাখ। তা'রপর তোমার হাতখানি তা'র উপর রেখে তেলো সঙ্কুচিত ক'রে



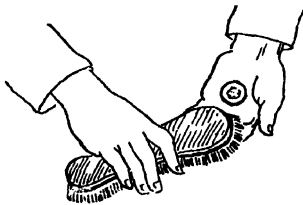
আঙ্গুলগুলি বাঁ দিকের ছবির মত ঝুলিয়ে দাও। এবার হাতখানি সোজা ক'রে দিলেই (ছবি দেখ) গ্লাসের কানার সঙ্গে হাতের তেলোর চামড়া বেশ সুন্দর ভাবে লেগে যাবে। হাতখানিকে কিন্তু বরাবর একটু চেপে রাখ্‌তে হবে। গ্লাস থেকে একটু জল প্রথমেই বেরিয়ে গিয়ে হাতের নীচেটায় একটু 'ফাঁকা' (বা vacuum) হয়ে গেছে। এবার হাতখানা একটু তুল্‌লে সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসটাও উঠ্‌বে। সাবধান! বেশী উঁচুতে যেন তুল্‌তে যেও না,

এই গ্যাস অন্য গ্লাসে 'ঢালা' হয়ে যাবে ; সঙ্গে সঙ্গে বুদ্বুদও অন্য গ্লাসের দিকে রওয়ানা হবে। বাতাসের চলাচল সে সময় না থাক্‌লে হয়তো বুদ্বুদ অন্য গ্লাসে ঢুকেই পড়্‌বে।

(১০) এবার আরেকটি মজার খেলা বুদ্বুদ নিয়ে খেল। একটা পাতলা তার নিয়ে, বাঁকিয়ে ছোট গোল আংটার মতন কর আর তা'র একটি ছোট হাতল রেখে দাও। একটি সরু সূতো নিয়ে, আংটার ডানপাশে ঢিলা ক'রে বেঁধে দাও। এবার আংটাটি সাবান-গোলা বুদ্বুদের জলে ডুবা'লে আংটার উপর সাবানের স্বচ্ছ ফেনার একটি পর্দ্দা লেগে থাকবে ; তার মধ্যে সূতাটা বেঁকে চুরে লেগে থাক্‌বে (উপরের, বাঁ দিকের ছবি দেখ)।



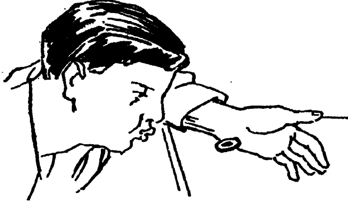
এবার সূতার ডানদিকে একটা ছুঁচ ফুটিয়ে দিলে সেদিকে পর্দ্দাটুকু ফেটে গিয়ে সূতাটা টান হয়ে উপরের বাঁ দিকের ছবির মত হবে। এবার সূতাটি খুলে, তার মাঝখানে একটি গোল্ ফাঁদ রেখে আবার সূতা লাগিয়ে দাও। সাবানের ফেনার মধ্যে আংটাটি ডুবা'লে এবার বাঁ দিকের নীচের ছবিটির মত হবে। এবার গোল ফাঁদের মাঝখানে ছুঁচ ফুটিয়ে দিলে, ফাঁদের মাঝের পর্দ্দা ফেটে গিয়ে ফাঁদটি ঠিক গোলাকার হ'য়ে যাবে।



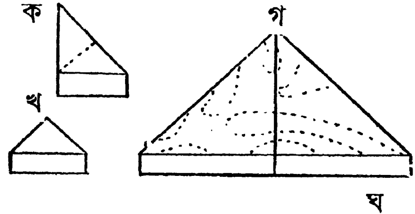
(১১) একটা পয়সা নিয়ে হাতের তেলোর উপর রাখ। এবার একটা নরম বুরুষ নিয়ে হাতের তেলোর দিক থেকে আঙ্গুলের দিকে ঘষে পয়সাটাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা কর। মনে হয় কাজটি খুব সোজা ; বুরুষ দিয়ে ঝাড়্‌লেই পয়সা প'ড়ে যাবে ; —কিন্তু, আসলে তা' নয়। যতই ঝাড় না কেন, পয়সা আর নড়তেই চাইবে না।

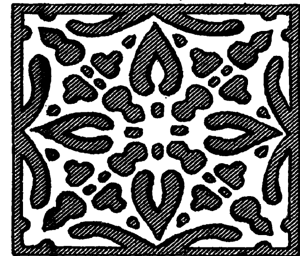
শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

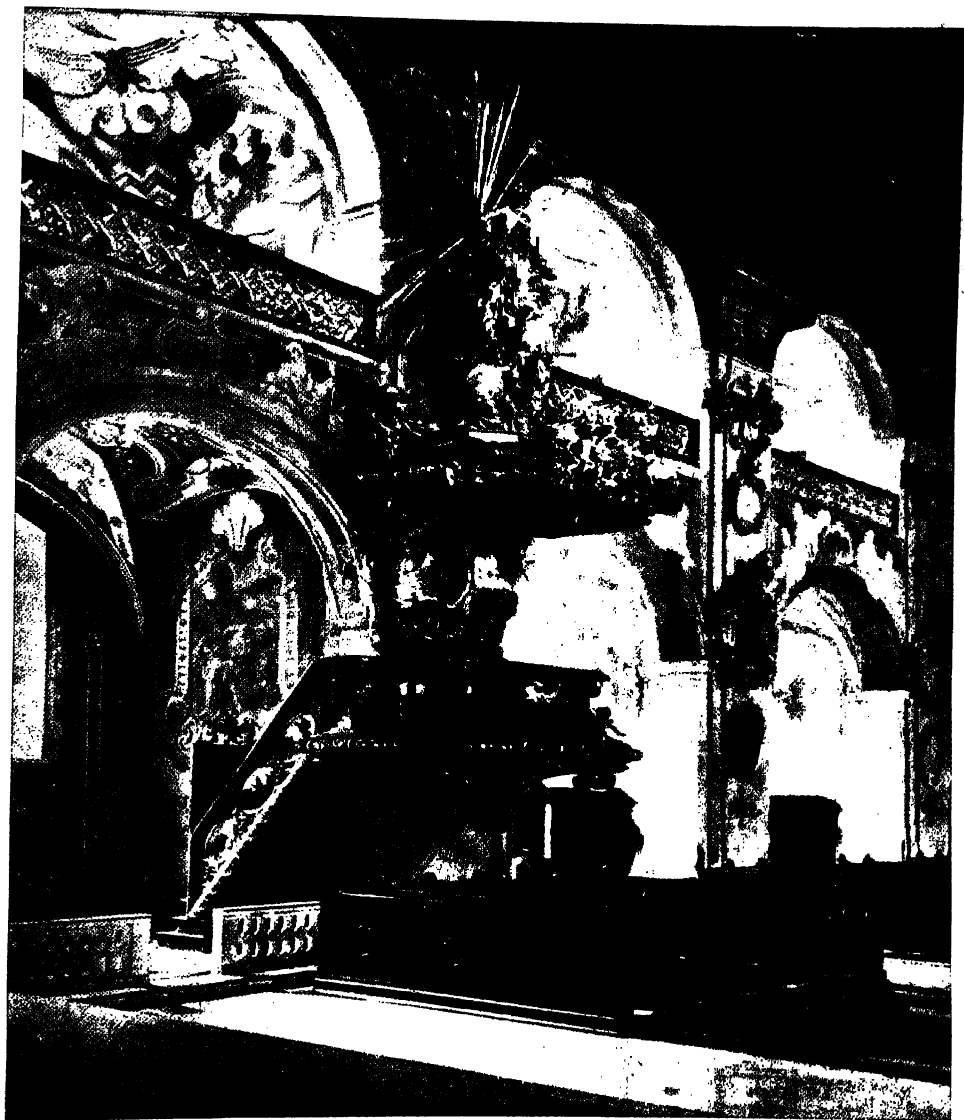
(১২) এবার পয়সাটি একটা টেবিলের এক কোণায় রেখে, পয়সাটার পিছনে হাত রেখে দেয়ালের মত পিছনটা আড়াল কর। মুখটা টেবিলের সমান নীচু ক'রে এবার পয়সায় জোর ক'রে ফুঁ দিয়ে দেখ কি হয়। পয়সাটা পট্ করে লাফিয়ে হাতের উপর পড়্‌বে গিয়ে। এটা একটা মজার খেলা হয়। আগে থেকে যদি বল, "পয়সাটা না ছুঁয়ে হাতের উপর তুলে নেবো"—তা হ'লে এই খেলাটা বেশ হয়।



(১৩) একটা খবরের কাগজ নিয়ে মাঝখানে ভাঁজ কর। আবার একটা ভাঁজ কর, যাতে কাগজখানা চারটি সমান ভাগে ভাঁজ হয়ে যায়। দেখো যেন কাগজের খোলা মুখ ডান হাতে নীচের দিকে থাকে। এবার ডানদিকের উপরের কোণাটা ভাঁজ ক'রে ফেল ('ক' ছবির মত) তারপর, বাঁ দিকের উপরের কোণাটা ভাঁজ ক'রে ডানদিকের কোণার উপর ফেল ('খ' ছবির মত)। 'খ' ছবিটি 'গ' এ বড় ক'রে দেখান হয়েছে। এবার 'গ' এর নীচের 'ঘ' অংশটুকু ছিঁড়ে ফেল। তারপর, ফুট্‌কিওয়ালা লাইনগুলির মত ক'রে কাগজটির কয়েকটি অংশ ছিঁড়ে ফেলে, কাগজটা খুলে ফেল্‌লে দেখ্‌বে পাশের ছবির মত কাগজখানায় একটা সুন্দর জালী তৈয়ার হয়ে গেছে। নানা ভাবে কাগজ ছিঁড়ে নানা রকমের জালী বানান যেতে পারে





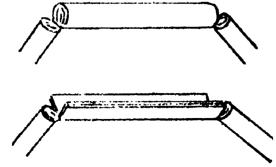


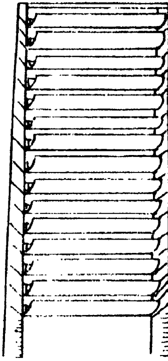
টেলিগ্রাফ-করা ছবি

একটি গির্জ্জার ভিতরের এই দৃশ্যটি জার্ম্মেনীর এক সহর থেকে অন্য সহরে

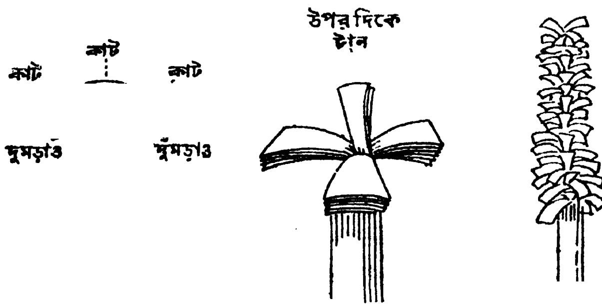
শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

(১৪) এক টুক্‌রো সরু (আন্দাজ ১ ফুট) লম্বা কাগজ নিয়ে বেশ টান ক'রে কাগজখানাকে পাকিয়ে ফেল—যেন একটা চোঙার মত জিনিষ হয়ে যায়। এই চোঙার দুই জায়গায় (দু'মাথায় আন্দাজ ৩ ইঞ্চি হিসাবে ছেড়ে) কাঁচি দিয়ে খানিকটা কেটে (উপরের ছবি), কাটা অংশের মাঝটা ছিঁড়ে বা কেটে ফেল (মাঝের ছবি)। এবার আস্তে আস্তে চেরা অংশটির উপরের কাগজখানা ধরে টান্‌তে টান্‌তে নীচের ছবির মইএর মতন ক'রে ফেল। কাগজটা একটু মজবুত হ'লে ভাল; না হ'লে টান্‌বার সময় মইটা ছিঁড়ে যেতে পারে।





(১৫) আগের খেলাটির জন্য যে কাগজের চোঙা বানিয়েছিলে, সেই রকমের একটি চোঙা এই খেলার জন্যও দরকার। চোঙার একটা মুখ কাঁচি দিয়ে, বাঁ দিকের ছবির মতন চার জায়গায় কেটে ফেল; তা'র পর কাটা মুখগুলিকে মুড়ে মাঝের ছবিটির মতন কর। এবার আস্তে আস্তে কাটা টুকরাগুলিকে ধ'রে টেনে ডান দিকের ছবির মত একটি সুন্দর ঝাড় বানাতে পার্‌বে।



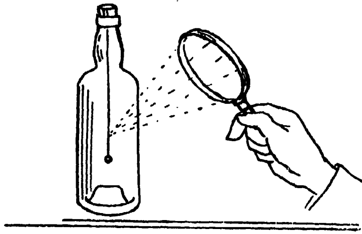
শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

(১৬) একটা বড় স্পিরিটের বোতল টেবিলের উপর রেখে, তা'র পিছনে একটা মোমবাতি রাখ।



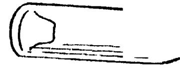
টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে বোতলের উপর ফুঁ দিলে কি হবে বল তো? বোতলের আড়ালে মোমবাতি কি তোমার ফুঁএর তোড়ে কখনও নিভ্‌তে পারে? একবার ফুঁ দিয়েই দেখ না কেন। ওমা ফুঁ দিতেই যে মোমবাতি ফট্ ক'রে নিভে গেল। কেন বল তো? বোতলের গায়ে ফুঁ দিলে মুখের বাতাস দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল বটে; কিন্তু, বোতলের পিছন দিকে গিয়ে সেই বাতাস আবার একত্র হ'য়ে বাতির আলোতে লেগে সেই আলো নিভিয়ে দিল।

(১৭) বোতলের ছিপিটা খুলে, একটা সূতোর সঙ্গে একটা ছোট গুলি বা লোহার কোন ছোট্ট জিনিষ বেঁধে, সূতোটা ছিপির মধ্যে আট্‌কে বোতলের মধ্যে ঝুলিয়ে দাও;—যা'তে সূতোর আগার জিনিষটি বোতলের মধ্যে শূন্যে ঝুল্‌তে থাকে আর বোতলের মুখে ছিপি আঁটা থাকে। আচ্ছা, এখন বোতলের ছিপি না খুলে' বোতলটিকে একটু না নাড়িয়ে, না ভেঙ্গে, সূতোটাকে কাট্‌তে পার কি, যা'তে ভিতরের ছোট জিনিষটি কেটে বোতলের তলায় পড়ে যায়? ব্যাপারটা খুব সহজ হয় যদি সে সময় রোদ থাকে। একটা 'রিডিং গ্লাস' (ছবিতে দেখ—পেট-মোটা লেন্স) নিয়ে সূর্য্যের আলো সূতোর উপর জমিয়ে ফেল্‌তে পার্‌লে সূতোটা অল্পক্ষণের মধ্যেই পুড়ে যাবে, আর দু'টুকরো হয়ে কেটে যাবে।



শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়চৌধুরী

(১৮) বোতলের ছিপিটা খুলে, একটু সরু দেখে আরেকটা ছিপি জোগাড় কর, যে ছিপিটা বোতলের মুখের ভিতর দিয়ে কোন মতে ঢুকে যায়—অর্থাৎ প্রায় বোতলের মুখের সমান বড়। এবার বোতলটিকে শুইয়ে, মুখের মাঝখানে ছিপিটা অর্দ্ধেক ঢুকিয়ে রেখে দাও। এখন ফুঁ দিয়ে ছিপিটাকে বোতলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পার কি? একবার চেষ্টা ক'রে দেখই না। যাঁহাতক ফুঁ দেবে অম্নি ছিপিটা ফট্ ক'রে বেরিয়ে আস্‌বে ;—ভিতরে ঢোকা তো দূরের কথা। কায়দা জানা থাক্‌লে কিন্তু বিভ্রাট ঘট্‌বার ভয় থাক্‌বে না। কাগজের একটা সরু নল পাকিয়ে, সেই নল দিয়ে ছিপির মাথায় ফুঁ দিলে ছিপিটা আস্তে আস্তে বোতলের মধ্যে ঢুকে যাবে। শুধু মুখে ফুঁ দিলে ছিপিটা হঠাৎ বোতলে ঢুক্‌তে চাইবে। ছিপির আশেপাশেও ফুঁএর বাতাস লাগার দরুণ বোতলের ভিতরের বাতাস বের হ'তে পার্‌বে না। কাজেই, বোতলের ভিতরের বাতাস ছিপিটাকে বাইরে ঠেলে বের ক'রে দেবে।









মিছে ভয় ?

ছেলেটি আর মেয়েটি কেন এত ভয় পেয়েছে বল্‌তে পার কি ? ছবিতে দু'জায়গায় যে ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি, আর এক জায়গায় ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি লেখা আছে, গোড়া থেকে (অর্থাৎ ১ অথবা ক থেকে) আরম্ভ ক'রে পর পর (২, ৩, ৪ এবং খ, গ, ঘ ইত্যাদি) সেগুলিকে লাইন টেনে যোগ ক'রে গেলে বুঝ্‌বে ভয়ের তিনটি কারণ কি কি ।

যখন বড় হব

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

[গান]

আমি তাই ভাবি ব'সে ছেলেবেলা ক'দিন র'বে,
শেষে যখন বড় হ'ব তখন কিবা করব সবে।
তখন মোরা সবাই হব অতিশয় সুস্থির,
আর ভারি বিদ্বান্ আর বড় গম্ভীর।
থাক্‌ব নাক দিনরাত শুধুই খেলা নিয়ে,
ক'ব কাজের কথা, দেখিস্ তখন ভাই
সবাই শুন্‌বে মন দিয়ে।

বড়লোক হই যদি কাজ করব ভারি,
না হলেও করব কাজ যতটুকু পারি।
সব কাজ কাজ ভাই ছোট বড় হোক্ যাই,
ভাল পথে খেটে খাই তা'তে লাজ নাই ভাই।

দোকান করিলে দিব জিনিষটি খাঁটি,
হক্ দর টিক্ মাপ কাজ পরিপাটি।
ডাক্তার হই যদি ক'রো নাকো ভয়,
মিষ্টি ওষুধ দেবো খেতে তেতো ঝাঁঝি নয়।

লিখি যদি বই তা'র দাম হবে অল্প,
রাঙা ছবি পাতে পাতে আর শুধু গল্প।
মোরা যদি রাঁধি, খেয়ে হবে খুসী,
নূন দিব ঠিক ঠিক, ঝাল নাই বেশী।

যখন বড় হব

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

স স স ঋ গ গ গ ঋ
আ মি তা ই ভা বি ব' সে

গ গ ঋ গ গ প ম গ
ছে লে বে লা ক' দিন্ র বে

ঋ গ ম গ ঋ ঋ স স
শে ষে য খন্ ব ড় হ ব

ধ ধ স ঋ স গ ঋগ স
ত খন্ কি বা কর্ ব স০ বে

গ গ গ গ গ ম ঋ ঋ
ত খন্ মো রা স বাই হ ব

II II
গ গ স স ঋ ঋ
অ তি শ য় সু স্থির

II II II
স স ঋ গ গ
আর ভা রি বি দ্বান্

II II
প স ঋ ম ঋ
আর ব ড় গ ম্ভীর

. .II
ধ ধ ম প ধ স স
থাক্ ব না ক দি ন্ রাত্

. . I .
ধ ণ স ঋ ণস ধ প
শু ধুই খে লা নি০ ০ য়ে

II
ম প ধ প ম গম ঋ
ক' ব কা জের্ ক ০০ থা

স স গ ঋ ম মগ ঋ গ
দে খিস্ ত খন্ ভা ০ই স বাই

II II
স স গ ঋ ম গ
শুন্ বে ম ন্ দি য়ে।

স স স স স স
ব ড় লোক হই য দি

II II
ধ স স ঋ গ গ
কা জ্ কর্ ব ভা রি

আজব ব

যখন বড় হব

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

II
প প ঋ ঋ গ গ স
না হ লে ও কর্ ব কাজ্

II
ধ. ধ. স ঋ গ গঋ স
য ত টু কু পা oo রি

II II II II
প গ গ গ
সব্ কাজ্ কাজ্ ভাই

গ ম ঋ ঋ ঋ ঋ ঋ গ
ছো ট ব ড় হো ক্ যা' ই

প. প প ধ ন ন ধ
ভা ল প থে খে টে খাই

II II
প ধ প গ প প
তা হে লা জ্ নাই ভাই

II
গ প প প প গ প
দো কান্ ক রি লে দি ব

II II II
ধ ন ন ধ প
জি নিস্ টি খাঁ টি

II II II II
গ প গ ঋ
হক্ দর্ ঠিক মাপ

II II II
স ঋ গ ঋ স
কাজ্ প রি পা টি।

△
স ম ম ম প ধ ধ ধ ধ ধ 'স ণ ধ
ডা ক্তার হই য দি ক রো না ক ভ o o য়

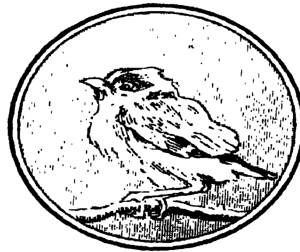
△ II II
ম প ধ ন ধ প ম ম ঋ ঋ ম ম প ম
মি ষ্টি ও ষুধ্ দি ব খে তে তে তো বাঁ ঝি ন য়্।

যখন বড় হব

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

			॥	॥				॥	॥			
স্ম	ম	ম	ম	ম	ম	ধ	প	প	ম	ঋ		
লি	খি	য	দি	বই	তার্	দাম্	হ	বে	অ	ল্প		
									॥	॥		॥
স	স	গ	ঋ	ঋ	ঋ	স	ঋ	ম	ম	ম	ধ	প
রা	ঙা	ছ	বি	পা	তে	পা	তে	আর্	শু	ধু	গ	ল্প।

						॥						।	
প	প	প	প	প	ণ	ধ	প	ধ	প	ম	গ	মগ	
মো	রা	য	দি	রাঁ	০	ধি	খে	য়ে	হ	বে	খু	০০	শী
				॥	॥	॥			॥	॥			
ধ	ন	ধ	ন	স	ণ	ধ	ম	ধ	প	ম			
নূ	ন্	দি	ব	ঠিক্	ঠিক্	ঝাল্	ন	য়্	বে	শী			





ভিসুভিয়াস ও পম্পেয়াই

শ্রীযুক্ত মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

মাটির তলায় চাপা পড়েছিল যে বিখ্যাত নগর সতের শ' বছর বাদে তাকে খুঁড়ে বার করা হয়েছে, বইয়ে তার গল্প পড়েছিলুম ; যখন স্বচক্ষে তাকে দেখবার সুযোগ মিলে গেল তখন সত্যি ভারি মজা লেগেছিল। ইটালির পশ্চিম উপকূলে নেপ্‌ল্‌স্। নেপ্‌ল্‌সে সমুদ্রের তীরে যেখানে জাহাজ লাগে সেখান থেকে প্রায় কুড়ি মাইল চক্কর দিয়ে ভিসুভিয়াস্ ও পম্পেয়াই যেতে হয়। ইতিহাস তোমাদের অনেকেরই জানা আছে, ভিসুভিয়াস্ পর্ব্বতের তলায় খৃষ্টের জন্মেরও আগে অত্যন্ত সমৃদ্ধ নগর ছিল পম্পেয়াই। ভিসুভিয়াস্‌কে আগ্নেয়গিরি বলে সবাই জানত, এবং চিরকালই ওর মুখ দিয়ে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু এমনটা ঘটবে এ কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। হঠাৎ একদিনের ভূমিকম্পে ও অগ্ন্যুৎপাতে ভিসুভিয়াস্ পর্ব্বতের চূড়ো গেল টুকরো টুকরো হয়ে, আর গলিত লাভা, গন্ধক, ছাই আর মাটির তলায় পম্পেয়াই সহরের হল কবর। এই হল পম্পেয়াইএর ধ্বংসের ইতিহাস। অগ্ন্যুৎপাত কেন হয় তা তোমরা জান কি ? প্রত্যেক আগ্নেয়গিরির মুখে একটা করে গহ্বর থাকে ইংরিজিতে যাকে বলে crater, এই গহ্বর পৃথিবীর পেটের মধ্যিখানে যেখানে ভীষণ উত্তাপ এবং সেই

শ্রীযুক্ত মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তাপে নানা গলিত ধাতু এবং নানা পদার্থ সারাক্ষণ টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে, ততদূর পর্য্যন্ত নেমে গিয়েছে। নিতান্ত মরা না হলে সাধারণতঃ আগ্নেয়গিরির মুখে মাঝে মাঝে ধোঁয়া দেখা যায়, এ হচ্ছে পৃথিবীর পেটের মধ্যের ধোঁয়া। ধোঁয়া বার হলেও আগ্নেয়গিরিরা রণমূর্ত্তি ধারণ করে খুবই কম। যে কটা বড় বড় অগ্ন্যুৎপাতের কথা শোনা গেছে তার খোঁজ করতে গিয়ে জানা গেছে বড় বড় ভয়ঙ্কর আগ্নেয়-গিরিগুলি সবই সমুদ্রের উপকূলে। অগ্ন্যুৎপাতের একটা প্রধান কারণই হচ্ছে সমুদ্র। ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রের তলার মাটি কখনো কখনো ফেটে যেতে পারে। সেই ফাটলের মধ্যে দিয়ে সমুদ্রের জল হু হু করে পৃথিবীর পেটের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে বাষ্প তৈরী হয়ে ভীষণ চাপের সৃষ্টি করে। এই চাপের ফলে আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে গলিত ধাতু, গন্ধক, ধোঁয়া প্রভৃতি ছিটকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে থাকে। এরই নাম অগ্ন্যুৎপাত।



ভিসুভিয়াসে ওঠবার পথ

ভিসুভিয়াস্ পাহাড়ের গা বেয়ে অনেক উঁচু পর্য্যন্ত মোটারের রাস্তা। সেই রাস্তার সীমানায় পৌঁছে তারপর পায়ে-চলার সুঁড়ি রাস্তা দিয়ে আমরা

ভিসুভিয়াস্ ও পম্পেয়াই

শ্রীযুক্ত মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ভিসুভিয়াসের প্রায় চূড়ো পর্য্যন্ত উঠেছিলুম। পাহাড়ে-রাস্তা সাধারণতঃ যেমন সুন্দর হয় এ ঠিক তার উল্টো। গাছ, আগাছা, ঘাস, একটুখানি সবুজের চিহ্ন কোথাও নেই। চারিদিকে Lavaর স্তূপ যেন কুমীরের পিঠের মত; দেখতে দেখতে গা শির শির করে ওঠে। এই শুষ্ক ধূসর রাস্তার মোড়ে মোড়ে কখনো হয়তো 'গীটার' অথবা বেহালা হাতে ইটালিয়ান ভিক্ষু দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর। সেখানকার রুক্ষ বিশুষ্ক মাটি আর বাতাস তার মধ্যে এদের গান পাহাড়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আশ্চর্য্যময় করে তোলে।

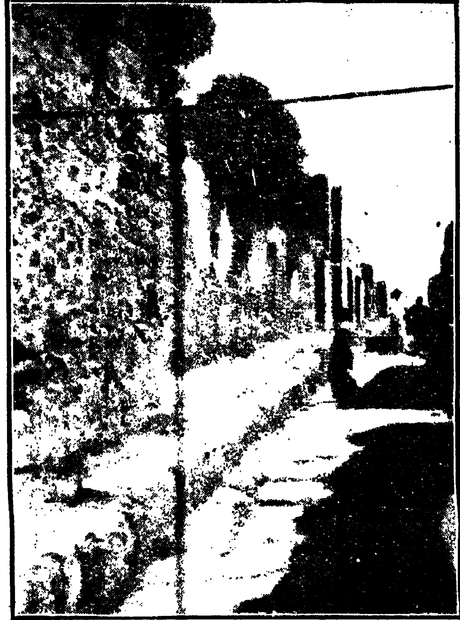
যতদূর পর্য্যন্ত যাওয়া যায় আমরা চেষ্টা করে গিয়েছিলুম। craterএর মুখ দিয়ে অনবরত ধোঁয়া বার হচ্ছে। মধ্যে মধ্যে ফোঁস্ ফোঁস্ করে গর্জ্জন আর তার সঙ্গে ছাই উড়ে এসে আমাদের গায়ে পড়তে লাগল। আমরা যতদূর



ভিসুভিয়াসের তলায় আমরা

পর্য্যন্ত উঠেছিলুম তার প্রায় ৫০ ফিট উপরে পাহাড়ের চূড়ো। কিন্তু সেইখানেই এত বেশী গরম যে আমরা বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলুম না। একজনের প্রায় অজ্ঞান

হয়ে পড়বার মত অবস্থা—তিনি টাল সামলাতে গিয়ে তীক্ষ্ণ-ধার Lavaর উপর পড়ে হাত কেটে রক্তারক্তি করে ফেল্লেন। আমরা নানা রকমের এবং নানা রংএর Lava এবং গন্ধকের টুকরো কুড়িয়ে নিলুম। চার দিন আগে crater থেকে কিছু গলিত Lava বার হয়েছিল, আমাদের গাইড একটা আঁকশি দিয়ে টেনে দেখালে এখনো তা গন্‌গনে আগুনের মত লাল হয়ে রয়েছে। গাইডকে পয়সা দিলে সেই গরম লাভা দিয়ে পয়সার ছাঁচ তৈরী করে দেয়। ভিসুভিয়াসের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে অনেকেই এই ভাবে লাভার ছাঁচ নিয়ে যায়—পয়সাটা অবশ্য পায় গাইড।

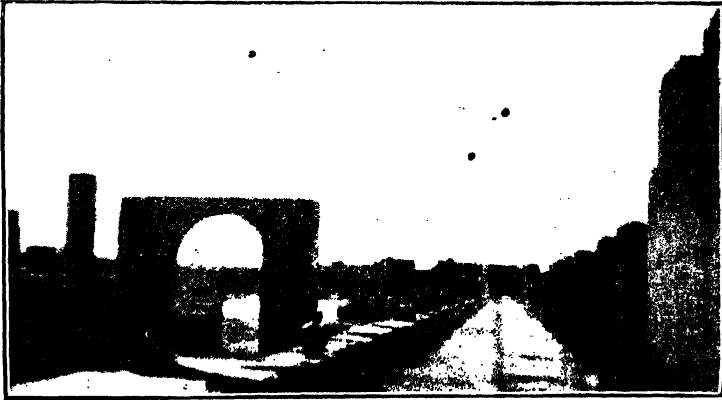


পম্পেয়াই এর রাজপথ

পাহাড় থেকে নামবার পথে সমুদ্রের দৃশ্য আর আঙ্গুরের ক্ষেত—হাতে ক্যামেরা থাকলে ছবি তুলে নেবার মত জিনিস! আমরা আমাদের ট্যাক্সি করে পম্পেয়াই-এ উপস্থিত হলুম।

একদিকে নতুন পম্পেয়াই গড়া হয়ে গেছে। নতুন বাড়ী, নতুন রাস্তা, যে কোন আধুনিক সহরের মত—অপর দিকে দু' হাজার বছরের পুরানো মাটি-চাপা-পড়া নগর। পম্পেয়াইএর চেয়ে অনেক বড় ধ্বংস স্তূপ পৃথিবীর ইতিহাসে

আছে, কিন্তু এতবড় ধ্বংসের স্তূপের মধ্যে থেকে ইট, কাঠ, দেয়ালের গায়ে ছবি, বাজার, কুয়ো রান্নাঘরের বাসন, এমন কি মানুষের দেহগুলো পর্য্যন্ত এমন নিখুঁৎ ভাবে কোথাও উদ্ধার করতে পারা যায়নি। পুরোণো সহর যেমন ভাবে সাজানো ছিল, ঠিক সেই ভাবেই তাকে যেন ফিরে পাওয়া গেছে। পথের বাঁধানো রাস্তা, তার দুপাশে বাড়ী, দোকান, বাজার, এমন কি বাগান পর্য্যন্ত এমন ভাবে সাজানো যে মনে হয় সেই দু হাজার বছরের পুরণো গৃহবাসীদের



পম্পেয়াই চক (Forum)

এনে এখানে ছেড়ে দিলে, তাদের বাড়ী, বাগান আর দোকান ঘর চিনে নিতে এক মিনিটও দেরী হবে না। তাদের ঘরের মেঝেতে এখনো সেই mosaicএর কায, চৌকাঠের উপর এখনো ছবির দাগ মেলায়নি, বড়লোক যারা তাদের গৃহসজ্জার সৌখিন আসবাবগুলিতে পর্য্যন্ত একটি আঁচড় লাগেনি। রান্নাঘরের মধ্যে মনে হয় এখনও বুঝি রান্না চলেছে, জলের কল দিয়ে মনে হয় এখনও বুঝি জল পড়ে।

ভিসুভিয়াস্ ও পম্পেয়াই

শ্রীযুক্ত মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

পম্পেয়াই যে খুব সৌখিন জায়গা ছিল তাতে ভুল নেই। বড় বড় বিখ্যাত দেয়াল-চিত্র, দামী দামী প্রমোদ উদ্যান—সবই যেন রাজা বাদশার ব্যাপার। এক সময়ে রোম থেকে এখানে লোকেরা আসত আনন্দ আর স্ফূর্ত্তি করবার জন্যে। ধনী বিলাসী লোকেরা, রাজারা, শিল্পীরা এখানে বাড়ী তৈরী করতেন। তাঁদের বাড়ীর জাঁকজমক দেখে লোকের চমক লাগত। কিন্তু পম্পেয়াইএর খ্যাতি এর জন্যে নয়। বহু বর্ষের বহু বিলাসিতা এবং শিল্পসৃষ্টির ইতিহাস পম্পেয়াইএর আছে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক গভীর ভাবে সারা পম্পেয়াইএর বুকের উপর ছাপ দিয়ে গেছে একটি মুহূর্ত্তের ইতিহাস। সে হচ্ছে পম্পেয়াইএর ধ্বংসের ইতিহাস। পম্পেয়াই যখন মাটী চাপা পড়ে সেই মুহূর্ত্তে সহরবাসীদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মধ্যে হঠাৎ যে চাঞ্চল্য, যে ভয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তার সমস্তটা, প্রতি খুঁটি-নাটিটি পর্য্যন্ত, মাটির মধ্যে অবিকৃত ভাবে দু'হাজার বছর ধরে সুরক্ষিত রয়ে গেছে। মাটি খুঁড়ে পম্পেয়াইকে যখন পাওয়া গেল, দেখা গেল সতেরশ' বছর আগে যে সমৃদ্ধ নগরের জীবনস্রোত স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে আসছিল, হঠাৎ যেন কিসের ধাক্কায় সেই স্রোত স্তব্ধ হয়ে গেছে। ওখানে গিয়ে দেখা যায় উনুনের উপর এখনও হাঁড়িটি বসানো আছে যাতে জল ফুটছিল, আধখানা কাটা রুটি টেবিলের উপর সাজানো, ডেকচির মধ্যে খাবার তৈরী, দোয়াতের মধ্যে কালি, দরজার কুলুপে চাবি লাগানো। মাটির তলার ঘরের মধ্যে ষোলজন লোক লুকিয়ে ছিল তাদের প্রত্যেককে পাওয়া গেছে, গৃহস্বামীকে পাওয়া গেছে তাঁর হাতে চাবি, তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ক্রীতদাস হাতে টাকাকড়ি এবং অলঙ্কার নিয়ে। গন্ধকের ধোঁয়ায় যখন দম বন্ধ হ'য়ে আসছে সে অবস্থায় কাপড় দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছে এমন মানুষ পাওয়া গেছে। সেই প্রলয়ের দিনে যারা মরেছে তাদের মুখের উপর মৃত্যুযন্ত্রণার ছাপ পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে আঁকা।

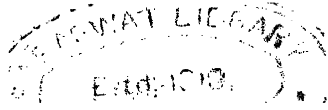
ভিসুভিয়াস্ ও পম্পেয়াই

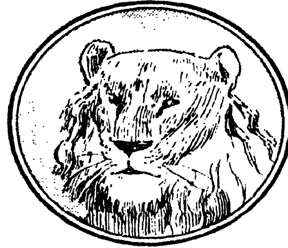
শ্রীযুক্ত মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

পম্পেয়াই যারা একবার দেখেছে তারা আর ভুলবে না। মানুষের হাতে গড়া জিনিস মাটির ছাঁচে ঢালাই হয়ে এমন আশ্চর্য্য সুন্দর ভাবে পৃথিবীর আর কোথাও বেরিয়ে আসেনি।

নেপল্‌স্,

২৮শে জুন, ১৯৩৫







শ্রীমতী সুখলতা রাও

[খেলার গান]

(গোলাপ, চম্পা, অপরাজিতা, শেফালি)

সকলে—ফুটিল মুকুল পাতার কোলেরে,
আকাশে চাহিয়া আঁখিসে খোলেরে
আলোক আসি তারে আদরে নিল বরি,
বাতাস চুপে চুপে সুবাস হরিল
রঙ্গীন আবেশে কি কথা ভাবে সে ?
শোন ও কি কথা কহিল।

শিউলী—শিউলী পড়ি ঝরি, নীরবে পড়ি ঝরি ;
রজনী না যেতে ফুরাল খেলা রে।
(রজনী না যেতে, রজনী না যেতে,
রজনী না যেতে ফুরাল খেলারে।)
ক্ষতি বা তাহে কি, দুঃখ তাহে কি ?
হ'ল যে যাবার বেলারে।



ফলের ভাষা

শ্রীমতী সুখলতা রাও

। পা স্র্সা । ণধা পমা । গা া- । সা মগা । মা পা ।
১। কি রণ বর ণ ০ ০ এ সেছি চ ম্পা
২। তাঁ রে০ করি স্মর ণ ০ তাঁ হারে আ জি

। র্সণা পমা । গা -া]॥
১। সুধা ক্ষর ণ ০
২। কর স্মর ণ ০

॥ পা না । পপা ননা । র্সর্সা র্সনা । র্সা না । র্গর্গা র্গর্গা ।
১। জা লি শাখে শাখে দীপ আ০ ন ন্দে বন তল্
২। আঁ ধার দূরে যায় সেই আলো লা গি মন প্রাণ্

র্গর্গা র্মা । র্গর্গা র্রর্রা । র্সা না । পা র্সর্সা । পধা ণা । ধপা মমা । গা-া ।
১। ঝল মল্ ভরি ল সু গ ন্ধে এ সেছি এসে ছি মন হর ণ ০
২। ছুটে যায় সেই আলো মা গি কর গো কর গো তাঁরে স্মর ণ ০

(পুঃ প্র—'এসেছি চম্পা' পর্য্যন্ত)

(ভজন)

॥ মা-া মা । মা-া গা । রা-া গা । রা সা-া । রা-া রা । রগা মপা মা । মা-া-া ।
১। ফু ০ টে ছি ০ গো লা০ প আ মি০ ল ০ য়ে প ০ ০ ০ রি ম ০ ০
২। কাঁ০ টা মো ০ রে ঘি০ রে আ ছে০ ত ০ বু হা ০ ০ ০ সি মু ০ ০

। -া-া-া ।[মা পা পা । পা-া ধা । মা-া পা । মা গা-া]। সা-া সা ।
১। ০ ০ ল সৌ ০ র ভে০ আ কু ০ ল হ য়ে০ জু ০ টে
২। ০ ০ খ কাঁ ০ টা গা ০ ছে আ০ লো ক রি০ সে ০ ই

ফুলের ভাষা

শ্রীমতী সুখলতা রাও

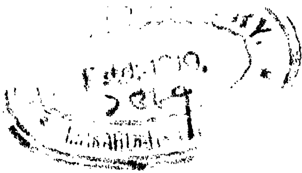
I রা-া রা I গা-া রা I সা -া -া II
১। অ ০ লি দ০ ০ ০ ০ ল্
২। মো০ র সু০ ০ ০ ০ খ

II[মা-া মা I মা-া পা I পা-া ধা I মা পা-া I মা-া ধা I ধণা ধা পা-া ধা I
১। 'গুল্'সে আ০ মি গু০ ণ ব তী০ প্রি০ য় স০ বা কা০ ০
২। ফুল্ টি যে০ মন্ ফো০টে তে মন্ ফো০টে যে০ ই জ০ ০

I মা পা-া] I মা-া মা I মা ধা ধা I পা-া ধা I মা গা-া I সা-া সা I
১। ০ ০র্ আ০ শা র ০ বা ঊ০ তা ল য়ে০ আ০ সি
২। ০ ০ন্ কাঁ০ টা তা ০ র ধ০ ন্য হ য়০ ধ০ ন্য

I রা -া রা I রগা মপা গা I মা -া -া II
১। বা ০ রে বা০ ০০ ০ ০ ০ র্
২। হ য় জী ব০ ০০ ০ ০ ০ ন্

(পু প্র—'ফুটেছি গো')





-শেষ-